উৎসর্গ

কৃষ্ণ ও সন্ধ্যাকে

লেখকের অন্য বই :—

মেঘনামতি

মতিবাঈ (যন্ত্রস্থ)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কোনদিন মেহেরুন্নিসার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে এবং তার জন্যে আবার ভূমিকা লিখতে বসতে হবে একথা ভাবতে পারিনি। কিন্তু সুনীল মণ্ডলের অনুরোধে ভূমিকা লিখতে বসতে হল।

ভাবছি কি লিখবো। যাঁদের জন্যে এ লেখা কী লিখলে তাঁরা খুশী হবেন। তাঁদের খুশী করা যে আয়াসসাধ্য তা অজানা নয়। তাই প্রথম প্রকাশের পর থেকে বেশ কিছুদিন আমাকে নানা চিন্তায় অস্থির থাকতে হয়েছে, তা পাঠক মনের গ্রহণ বর্জনের কথা ভেবেই। তাঁরা মেহেরুন্নিসাকে সানন্দে গ্রহণ করেছেন জেনে একদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলুম।

আজ তাঁদের উদ্দেশে জানাই আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা।

বৈদ্যবাটী
১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ দ্বৈপায়ন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বন্ধুবর শ্রীসুনীল মণ্ডল ও শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে 'মেহেরউন্নিসা' লিখেছিলাম। এবার ভূমিকা লেখার পালা। এখানেই কঠিন পরীক্ষা। ভূমিকা লেখা যে কি কঠিন বিশেষ করে ঐতিহাসিক উপন্যাসের, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। কিন্তু প্রকাশকের ধারণা উপযুক্ত একটি ভূমিকা না থাকলে পাঠকের মনের সন্দেহের মেঘ কাটা সম্ভব নয়। তাছাড়া ভূমিকার সঙ্গে চাই প্রমাণ পঞ্জি, যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্যে কাহিনী রচনা করা হয়েছে। ফলে পাঠক কল্প কাহিনী বলে মনে নাও করতে পারেন। তবু এর মধ্যে একটি কিন্তু থেকে যায়। তা হচ্ছে মোগল হারেমের যে সমস্ত গুপ্ত কথা গ্রন্থে বর্ণনা করা হয় তা কি সত্য? আমার

মনে হয় এর মধ্যে একটু সন্দেহ আছে। কারণ যে মোগল হারেমে সূর্যের আলো আর পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল সেখানের সব কথা লেখা সম্ভব কি করে।

ইতিহাস তো সরকারী প্রমাণ পঞ্জি। সেখানে হারেমের কন্যাদের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা আশা আকাঙ্খার কথা লেখার স্থান কোথায় ?

জেব-উন্নিসা ও মিহর-উন্নিসা, বাদশাহ আওরঙজেবের দুই কন্যা। ইতিহাস একজনকে দিয়েছে স্বীকৃতি একজনকে উপেক্ষা। কবি জেব-উন্নিসা স্থান করে নিয়েছে ইতিহাসের বুকে কিন্তু মিহর-উন্নিসা ? জীবনভর বহেছে শুধু দুঃখ জ্বালা আর নৈরাশ্যের হাহাকার।

এ গ্রন্থের নায়িকা মিহর-উন্নিসা। ঐতিহাসিকগণ মিহর-উন্নিসা সম্বন্ধে নীরব প্রায়। ইতিহাসে তার কথা খুব কমই লেখা হয়েছে। তবু নানা গ্রন্থ থেকে উপকরণের সাহায্যে যে যে কাহিনী সম্ভব করেছি সেখানে History of Romans গ্রন্থের দানই সব থেকে বেশি এবং কাহিনীর প্রয়োজনে কিছু কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনার সৃষ্টি করেছি ইতিহাসের ধারাকে ক্ষুণ্ণ না করে।

মুল ঐতিহাসিক উপকরণের সাহায্যে ঐতিহাসিক ঘটনার সন তারিখ নির্ণয় করে জীবনকাহিনী রচনা করা সম্ভব কিন্তু কল্পনার মিশ্রণ না ঘটলে উপন্যাস লেখা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা।

জানিনা আমার মত সমর্থন যোগ্য কি না। বিচারের ভার পাঠক পাঠিকাদের। এ কাহিনী যদি তাঁদের ভাল লাগে শ্রম সার্থক মনে করব।

এ কাহিনী রচনায় অনেকের নানা সাহায্য সহানুভূতি ও উপদেশ আমি নানাভাবে পেয়েছি তাঁদের সকলকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

—দ্বৈপায়ন

॥ এক ॥

রক্ত রাগে রাঙা সারা আকাশ। আগুন রাঙা সূর্যটা পশ্চিম দিগন্তে। গোধূলির ইসারা প্রকৃতির বুকে। সন্ধ্যার ধূপছায়া আঁধার উঁকি দিতে সুরু করেছে ধীরে ধীরে। আকাশ মাটির মাঝে যোগসূত্র রচনা করেছে মৃদু মধুর ছায়া ছায়া হালকা অন্ধকারটা। দুরন্ত পাহাড়ী নদীটিও বুঝি সেই দৃশ্য দেখে ক্ষণেক আনমনা হয়ে আবার এগিয়ে চলেছে নিজের পথে।

নীরা!

ভাদ্রের নীরা!...

যৌবন ছল ছল ভরা দেহে কল কল হাসির মূর্ছনা তুলে মনের আনন্দে নৃত্য করতে করতে বয়ে চলেছে নীরা। দূর হতে বহু দূরে। মহাসমুদ্রের স্বপ্ন বুকে নিয়ে।

নীরা!

বড় সুন্দর, বড় মিষ্টি মধুর নামটি।

নীরার পাশে পাশে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে গেছে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা। কোথাও এগিয়ে এসেছে কাছে—আরো কাছে। কোথাও বা সরে গেছে দূরে বহুদূরে। একটু উন্মুক্ত প্রান্তর-ছায়া সুনিবিড় বনবীথি। একটু ছবির মতো সুন্দর গ্রাম শ্রী ও ছন্দভরা মাওলী পল্লী।

নীরা এগিয়ে গেছে। নিজের ঘুর্ণির ছন্দে।

তখন গোধূলি বেলা। শেষ সূর্যের বিদায়ী রক্তিমাটুকু তখনও লেগে আছে দূর প্রান্তর শেষের দিকচক্রবালে। প্রদোষের ম্লান ছায়াটুকু ধীরে ধীরে নেমে আসতে আরম্ভ করেছে নিবিড় অরণ্য মাঝে। উত্তুঙ্গ পর্বত কন্দরে। বেগবতী চঞ্চলা নীরার বুকে। আকাশ পথে নীড়াভিমুখি পাখীদের ব্যস্ততা। কাকলি কূজনে বনভূমি মুখরিত।

ও হো-হো।……

ঝন্-ঝন্-ঝনাৎ।

বন্ধ হয় দুর্গদ্বার।

অস্ত্রের ঝন ঝনায় মুহূর্ত তরে মুখর হয়ে ওঠে দুর্গ।

রাত্রির প্রহরী পরিবর্তন হ'ল।

প্রহরীদের ধীর পদক্ষেপে মুখর হয়ে ওঠে দুর্গ প্রাচীর।

দুর্গ শীর্ষে প্রাচীরের কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলিষ্ঠ মূর্তিটি। মুখমণ্ডল গম্ভীর, চিন্তাপূর্ণ।

তাকিয়ে ছিলেন খরস্রোতা নীরার দিকে।

আকাশে বাতাসে সন্ধ্যার নূপুর ধ্বনি। আলো আঁধারি ভরা প্রকৃতি। রাত্রির স্বপ্ন জাগরণে সাড়া দিতে তারাদের ব্যাকুলতা।

মূর্তি নীরব, নিশ্চল, পাষাণপ্রায়। আয়ত আঁখি দুটি স্থির অচঞ্চল। ললাট রেখায় গভীর চিন্তার ইসারা।

দুর্গ প্রাসাদ শীর্ষের ওই অচঞ্চল ছায়ামূর্তি কি ভাবছেন?

পদশব্দে হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠেন ছায়ামূর্তি। ঘুরে দাঁড়ান। নত নেত্রে কাছে এসে দাঁড়ায় আগন্তুক।

কি সংবাদ? গম্ভীর স্বর শোনা যায় ছায়ামূর্তির কণ্ঠে।

কোন সংবাদ নেই।

তবে?

আমিও চিন্তিত প্রভু।

ওঃ।

চুপ করে যান ছায়ামূর্তি। ধীরে ধীরে আরো গম্ভীর ও চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল। দূর আকাশের দিকে তাকান ছায়ামূর্তি। আকাশে দুই একটি করে সন্ধ্যা তারা ফুটে উঠছে। মৃদু মন্দ বাতাসে পাহাড়ী ফুলের সুবাস। গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠছে সন্ধ্যার ছায়া ছায়া আবছা অন্ধকারটা।

মালশ্রী। নীরবতা ভঙ্গ করেন ছায়ামূর্তি।

প্রভু।
তোমার কি মনে হয়?
আমার?
হ্যাঁ। একটু চুপ করেন ছায়ামূর্তি। বলেন, আচ্ছা...
কি প্রভু?
এমনও তো হতে পারে যে সংবাদ পাওয়া গেছে তা সত্য নয়?
কিন্তু......
কি?
তা হতে পারে না প্রভু।
কেন?
কারণ গতকালের সমস্ত সংবাদ শুনে মনে হয়েছে এ সংবাদ মিথ্যা হতে পারে না। তাছাড়া নিতাইজী সঙ্গেই আছেন।
হ্যাঁ, সেই জন্যেই বিশ্বাস করেছি। একটু চুপ করে থাকেন। এক সময় মৃদু কণ্ঠে বলেন, তবুও মাঝে মাঝে কি মনে হচ্ছে জান?
কি প্রভু?
মনে হচ্ছে এ সংবাদ যেন অবিশ্বাস্য। কারণ কিছু মাত্র প্রহরী সঙ্গে নিয়ে আমি এখানে মূর্তিমান কালস্বরূপ আছি জেনেও তিনি আসছেন?
তাঁর এই সাহসিকতার পুরস্কার তিনি পাবেন প্রভু। তখন অকারণ বিলাপ করা ছাড়া কোন গতি থাকবে না তাঁর।
সত্য। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে বিপদসঙ্কুল পথে একাকিনী যাত্রা করার দুঃসাহস তিনি পেলেন কি করে?
হয়তো কোন জরুরী কারণ তাঁকে এই বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করাতে বাধ্য করিয়েছে।
তাই হবে। যুদ্ধক্ষেত্র মৃত্যুর লীলাভূমি জেনেও বীর নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে যায়। হয় কর্তব্য কারণে না হয় দেশের জন্যে তিনিও হয়তো...। আবার একটু চুপ করেন ছায়ামূর্তি। বলেন, যদি কার্যোদ্ধারে সফল হই তাহলে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হবে

তাঁর যাতে কোন অমর্যাদা বা অসুবিধা না হয় তা দেখা। বিধর্মী হলেও নারী জাতি আমার কাছে সমান।

জানি প্রভু!

আবার চুপ করে যান ছায়ামূর্তি। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন স্থির হয়ে।

সন্ধ্যার অন্ধকারটা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

মালশ্রী। ডাকেন ছায়ামূর্তি।

প্রভু।

দেখতো কে যেন এই দিকেই এগিয়ে আসছে।

দেখে মালশ্রী। সত্যই সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার বন্ধুর পথে একটি মানুষের ছায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে দুর্গের দিকে।

সত্যই কেউ এগিয়ে আসছে।

তবে কি……

কি প্রভু?

বাজী ফসলকর নয়তো?

সম্ভব।

তুমি সংবাদ নিয়ে এসো। বাজী যদি আসে তাহলে তাকে আমার কাছেই নিয়ে আসবে।

আপনি এখানেই থাকবেন?

হ্যাঁ।

চলে যায় তন্বজী মালশ্রী।

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন ছায়ামূর্তি।

রাত্রির আকাশ ক্রমে ক্রমে ভরে যাচ্ছে তারার মালায়। কুলু কুলু ধ্বনিতে প্রগাঢ় আঁধারের মাঝেও বেগবতী নীরার কলহাসি ভেসে আসছে। পাগলা নদী নীরা পাহাড়ী মেয়ের মতই চঞ্চলা।

এ-এ এই—হুঁসিয়ার।

গম্ভীর কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে প্রহরী।

দাঁড়িয়ে পড়ে আগন্তুক। ক্ষণিক। আবার এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে।

মশাল জ্বলে। মশালের আলোয় স্পষ্ট হয় আগন্তুক। আগন্তুক সন্ন্যাসী।

সংবাদ পেয়ে কেল্লাদার উপস্থিত হন।

কে আপনি? সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেন কেল্লাদার।

সন্ন্যাসী! মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেন সন্ন্যাসী।

উদ্দেশ্য?

শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

কারণ?

সাক্ষাতে বক্তব্য।

কিন্তু রাত্রে দুর্গ প্রবেশ নিষিদ্ধ।

জানি।

তবু এসেছেন কেন?

প্রয়োজন জরুরী।

কি প্রয়োজন?

সাক্ষাতে বলব।

কিন্তু আজ প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু আজ রাত্রেই আমাকে সাক্ষাৎ করতেই হবে।

উভয় সঙ্কটে পড়েন কেল্লাদার মাধব রাও। সহসা কি করবেন কিছুই স্থির করে উঠতে পারেন না। আগন্তুক নিশ্চয় জরুরী কোন প্রয়োজনে শিবাজীর সাক্ষাৎ প্রার্থী। কিন্তু প্রভুর আদেশ সূর্যাস্তের পর কোন অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে দুর্গ প্রবেশ নিষিদ্ধ! কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারেন না বৃদ্ধ কেল্লাদার মাধব রাও।

তন্নজী মালশ্রী একটু দূরে দাঁড়িয়ে, কেল্লাদার আর আগন্তুক সন্ন্যাসীর কথা শুনছিল। মাধব রাওয়ের বিমূঢ় অবস্থা দেখে এগিয়ে আসে।

রাওজী। ডাকে মালশ্রী।

তন্নজী।

আমার মনে হয় আগন্তুকের বিশেষ প্রয়োজন প্রভুকে।

আমারও তাই বোধ হয়।

তাহলে...

বলুন ?

কি করবেন ?

পরিচয় না পেলে দুর্গ প্রবেশের অনুমতি দিই কেমন করে বলুন ?

এমনও তো হতে পারে সন্ন্যাসী প্রভুরই কোন ছদ্মবেশী অনুচর ?

তা যদি হবে তা'হলে আত্মপরিচয় দিতে অসম্মত কেন ?

হয়তো প্রয়োজন আছে। একটি জরুরী সংবাদ নিয়ে বাজী বা যশজীর আসবার কথা আছে কিন্তু তাঁদের দুজনের কেউই আসেন নি। এজন্য প্রভু ভীষণ চিন্তিত। তাছাড়া প্রভু যে এ দুর্গে আছেন এ সংবাদ অনেকেই জানেন না।

সত্য।

তাহলে ?

আপনি বলছেন সন্ন্যাসী যশজী বা বাজী দু'জনের কেউ হবেন ?

না তা আমি বলছি না। তবে আমার মনে হয় সন্ন্যাসী কোন গোপনীয় কারণে প্রভুর সাক্ষাৎ প্রার্থী।

দুর্গে প্রবেশ করতে দেব তা'হলে ?

তা আপনার বিবেচনাধীন ; আমার পক্ষে মত প্রকাশ করা সম্ভব নয় কারণ এ দুর্গের সম্পূর্ণ ভাল মন্দের দায়িত্বভার আপনার ওপরে। প্রভুরও সেই মত।

মালশ্রীর কথায় বৃদ্ধ মাধব রাওয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিবাজী যে দায়িত্বভার যার ওপর দেন সেখানে তাঁর মতামত ভিন্ন নিজে কিছু করেন না।

মাধব রাও বলেন, তাহ'লে সন্ন্যাসীকে দুর্গে প্রবেশ করতে দিই ?

তাই করুন।

মাধব রাওয়ের আদেশে নীচে দড়ির মই নামিয়ে দেওয়া হয় তাই বেয়ে সন্ন্যাসী ওপরে উঠে আসেন।

সন্ন্যাসী। মৃদু কণ্ঠে ডাকে মালশ্রী।

বলুন। মালশ্রীর মুখের দিকে তাকান সন্ন্যাসী।

যদি অপরাধ না নেন তাহলে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করবো আপনাকে ?

হাসেন সন্ন্যাসী। বলেন, কোন দ্বিধা না করে আপনার যা ইচ্ছা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন তন্নজী মালশ্রী।

অপরিচিত সন্ন্যাসীর মুখে নিজের নাম শুনে বিস্মিত হয় মালশ্রী। আশ্চর্য হয়ে ভাবে জীবনে কোনদিন কি সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোন ক্ষণে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। মনে করতে পারে না মালশ্রী।

তন্নজী মালশ্রী। মৃদু কণ্ঠে ডাকেন সন্ন্যাসী।

হুঁ। চমক ভাঙে মালশ্রীর।

কি ভাবছেন ?

ভাবছি আমার নাম আপনি জানলেন কি ভাবে। যতদূর মনে হচ্ছে জীবনে আপনার সঙ্গে কোন দিন দেখা হয় নি। তবে ?

উত্তর দেন না সন্ন্যাসী। মৃদু একটু হাসেন মাত্র।

সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় মালশ্রী। চিনতে চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়।

তন্নজী। মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকেন সন্ন্যাসী।

হুঁ।

আপনার কি জিজ্ঞাসা করবার আছে জিজ্ঞাসা করেন নি।

সন্ন্যাসীর কথায় মালশ্রী তাকায় সন্ন্যাসীর মুখের দিকে। বলে, আপনি কে ?

সে কথা বলেছি আগে।

আপনি কি প্রভুর অনুচর ?

আপনার অন্য প্রশ্ন করুন।

আপনি কি করে জানলেন শিবাজী এ দুর্গে আছেন ?

আমি জেনেছি।

কি ভাবে ?

আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে।

অসম্ভব। প্রতিবাদ করে মালশ্রী।

কেন ?

আমরা মাত্র কয়জন ছাড়া শিবাজী এখানে আছেন একথা আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

যদি বলি যোগবলে জেনেছি। হাসেন সন্ন্যাসী।

ওঃ। কথা বলে না মালশ্রী কিন্তু বুঝতে পারে মিথ্যা বলছেন সন্ন্যাসী।

তন্নজী।

বলুন।

আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। হাসেন সন্ন্যাসী। বলেন, দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করতে দিয়েছেন এখন শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা করে দিন।

কোন বিশ্বাসে আপনাকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে নিয়ে যাব ?

আমি সন্ন্যাসী মানুষ। এছাড়া পরীক্ষা করে দেখুন আমি নিরস্ত্র।

পরীক্ষা করে মালশ্রী। সত্যই সন্ন্যাসী নিরস্ত্র।

সন্ন্যাসীকে নিয়ে মালশ্রী আর মাধব রাও এগিয়ে চলেন।

দুর্গ শীর্ষে ওঠবার সোপান শ্রেণীর কাছে এক সময় দাঁড়িয়ে পড়েন সন্ন্যাসী।

কি হ'ল ? প্রশ্ন করে মালশ্রী।

আপনাদের প্রভু কোথায় আছেন ?

যেখানে আছেন সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।

কিন্তু···

মনে হচ্ছে এ দুর্গের সঙ্গে আপনি পরিচিত।

এঁ্যা—না—না।

নির্ভয়ে আসুন।

চলুন।

তিনজনে ওপরে ওঠে।

শিবাজী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি দূরের পর্বতশ্রেণীর দিকে নিবদ্ধ। গভীর চিন্তামগ্ন শিবাজী।

প্রভু। কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মালশ্রী।

এ্যাঁ। চমক ভাঙে শিবাজীর। মালশ্রীর মুখের পানে তাকান। কি সংবাদ মালশ্রী।

আগন্তুক সন্ন্যাসী আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

অদূরে দণ্ডায়মান সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকান শিবাজী। একটু বিস্মিত হন। স্থির দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মুখের পানে তাকিয়ে থাকেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বারবার সন্ন্যাসীর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন সন্ন্যাসীর কাছে। প্রণাম করতে যান। দু'পা পিছিয়ে যান সন্ন্যাসী।

কি হ'ল ?

প্রণাম গ্রহণ করার নিষেধ আছে বৎস।

সন্ন্যাসী গম্ভীর কণ্ঠে ডাকেন, শিবাজী।

সন্ন্যাসীর কথায় জ্বলে ওঠে শিবাজীর দুই চোখের দৃষ্টি।

বল বৎস।

আমি আপনাকে চিনি !

চেনেন ?

হ্যাঁ। আপনার নিখুঁত ছদ্মবেশ বিভ্রম সৃষ্টি করলেও আপনার কণ্ঠস্বর ধরিয়ে দিয়েছে আপনাকে।

কেল্লাদারকে স্থান পরিত্যাগের ইঙ্গিত করেন শিবাজী। চলে যান মাধব রাও।

কি সংবাদ বাজী ? জিজ্ঞাসা করেন শিবাজী।

সন্ন্যাসী বাজী ফসলকার।

সংবাদ শুভ।

সত্যই তাহলে বাদশাহ পুত্রী মাতুরা গমন করছেন ?

হ্যাঁ প্রভু। বাদশাহ আওরঙজেব মাতুরায় শিবির স্থাপন করে কন্যার আগমন প্রতীক্ষা করে আছেন।

উত্তম। একমুহূর্ত চুপ করে থাকেন শিবাজী। বলেন, বাদশাহের এই প্রতীক্ষা আমাকে ব্যর্থ করতেই হবে বাজী। হ্যাঁ, বাদশাহ পুত্রীর রক্ষী সংখ্যা কত হবে ?

অনুমান তিন চার শত। তবে…

কি?

একজন মারাঠার পক্ষে বাদশাহ পুত্রীকে হরণ করা অসম্ভব হবে না বলেই আমার মনে হয়।

সম্ভব?

হ্যাঁ।

কেমন করে?

পথ প্রদর্শকের জন্যে।

কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি প্রভু? কারণ পথ প্রদর্শক আপনারই একজন অনুচর।

কে সে?

নিতাইজী।

নিতাইজী! ভীষণভাবে চমকে ওঠেন শিবাজী।

হ্যাঁ প্রভু। নিতাইজী পথ প্রদর্শকের ছদ্মবেশে বাদশাহ পুত্রীর সঙ্গে আসছেন।

কিন্তু…

কি প্রভু? শিবাজীর মুখের দিকে তাকান বাজী।

না কিছু না। ভবানীর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন নির্বিঘ্নে কাজ শেষ করতে পারেন।

তিনিও তাই বলেন। বলে বাজী। ভবানীর কৃপায় কোন বিপদ তাঁকে স্পর্শ করবে না।

সমস্ত কথা শিবাজীকে বলে বাজী। শিবাজীর নির্দেশ শোনে।

এক সময় বলে, এবার আমাকে বিদায় দিন প্রভু।

এই রাত্রে?

হ্যাঁ, প্রভু। আজ রাত্রেই সমস্ত সংবাদ নিতাইজীকে জানাতে হবে।

শিবাজীর কাছে বিদায় নিয়ে যেভাবে দুর্গে প্রবেশ করেছিল সেই ভাবেই নিঃশব্দে দুর্গ ত্যাগ করে বাজী ফসলকর। দুর্গের কেউই বুঝতে পারে না কে এই সন্ন্যাসী, কেন এসেছিলেন দুর্গে?

মালশ্রী বাজীকে বিদায় দিতে আসে।

মালশ্রী। ডাকে বাজী।

বাজী।

তোমার ব্যবহারে আমি প্রীত।

দুর্ব্যবহার বল। রহস্য করে মালশ্রী।

কর্তব্য পালনে দুর্ব্যবহার নিন্দনীয় নয় বন্ধু।

জানি বন্ধু। কিন্তু ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি, আমরা ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরের সাথে মিশেছি তবু তোমাকে চিনতে পারলুম না।

দুঃখ কোর না বন্ধু। আমার ছদ্মবেশ ধারণ সার্থক হয়েছে। হাসে বাজী ফসলকর। বলে, সমস্তই ভবানীর কৃপা।

সত্য বাজী। ভবানীর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই সম্ভব নয়। তুমি দেখ ভবানীর কৃপায় প্রভু নিশ্চয় সফল হবেন। মারাঠা জাতি, হিন্দুধর্ম আবার তার যোগ্য মর্যাদা ফিরে পাবে।

নিশ্চয়ই পাবে বন্ধু। সেই শুভ দিনের আশায় দেশের অগণিত জনগণ দিবারাত্র ভবানীকে ডাকছে। প্রভু নিশ্চয়ই মহারাষ্ট্রের মুক্তি নিয়ে আসবেন।

আমিও বিশ্বাস করি বন্ধু।

বিদায় বন্ধু।

পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। নিঃশব্দে নীচে নেমে ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটিল পার্বত্য পথে অদৃশ্য হয়ে যান সন্ন্যাসী।

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মালশ্রী। মনে পড়ে শৈশবের সেই উজ্জ্বল দিনগুলিকে। কৈশোরের প্রতিটি মুহূর্তকে। সেদিনের সেই কয়েকটি দুরন্ত কিশোরকে। তন্নজী, মালশ্রী, শিবাজী, বাজী ফসলকর, যশজী মাওলাকে। দুরন্ত বন্য কিশোরগুলির অসম্ভব স্বপ্নকে।

সে স্বপ্ন কালে সত্য হয়েছে। সে দিনের সেই খেলার রাজা শিববা আজ রাজা হয়েছে। ভারত সম্রাট আলমগীর আজ তাকাতে বাধ্য হয়েছেন মহারাষ্ট্রের দিকে। সাজাহানের ময়ুর সিংহাসনে

কাঁপন ধরিয়েছে আজ সেদিনের সেই দুরন্ত কয়টি কিশোরদলের নেতা শিববা—-আজকের শিবাজী।

কিন্তু যশজী আজ নেই। নীরার বুকে এক দুরন্ত বর্ষার রাত্রে খেলার রাজাকে বিপদমুক্ত করতে গিয়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছেন। বহু সন্ধান করেছিল কিন্তু সন্ধান মেলে নি। কৌতুকময়ী নীরা লুকিয়ে ফেলেছিল যশজীকে বুকের মাঝে।

বাজীকে বিদায় দিয়ে ফিরে আসে মালশ্রী।

শিবাজী তখনও তেমনি ভাবে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। নক্ষত্রের জ্যোতিতে পূর্ণ প্রকৃতি।

দুর্গ পিছনের বেগবতী নীরা কল্ কল্ কলহাসির মূর্ছনায় রাত্রির নিঃস্তব্ধতাকে বারে বারে কাঁপিয়ে তুলছে। নিশুতি রাতের বাতাসের দোলায় একটা অস্পষ্ট হিস্ হিস্ শব্দ।

প্রভু। কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মালশ্রী।

মালশ্রী।

হ্যাঁ, প্রভু।

বাজী চলে গেছে?

হ্যাঁ, প্রভু।

চুপ করে থাকেন শিবাজী। আকাশের দিকে আবার চোখ তুলে তাকান। কি যেন ভাবেন।

প্রভু। আবার ডাকে মালশ্রী।

এঁ্যা। চমকে ওঠেন শিবাজী।

কি ভাবছেন?

নিতাইজীর কথা ভাবছি। যদি…

কি প্রভু?

সে কথা ভাবতে আমার ভয় হয় মালশ্রী।

ভবানীর কৃপায় নিতাইজীর কোন বিপদ হবে না প্রভু।

জানি মালশ্রী। তবু মন মানছে না।

চুপ করে থকে মালশ্রী।

গুরুদেবের কোন সংবাদ পেলে মালশ্রী? একসময় জিজ্ঞাসা করেন শিবাজী।

না প্রভু। আজ বিকালে তাঁর আশ্রমে গিয়েছিলুম। শিষ্যরাও সঠিক কোন সংবাদ দিতে পারলেন না।

আজ প্রায় মাসাধিকাল তিনি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এত বিলম্ব তিনি করেন না। কেমন আছেন কে জানে।

আবার চুপ করেন শিবাজী। কথা বলেন না আর।

গুরুদেব রামদাস স্বামী প্রায় মাসাধিককাল হ'ল তীর্থ ভ্রমণে গেছেন। যাত্রার পুর্বে বলে গিয়েছিলেন মথুরা যাচ্ছেন, কিন্তু তিনি যাবার পর থেকে তাঁর কোন সংবাদ আর পাওয়া যায় নি। এমন তিনি করেন মাঝে মাঝে। হঠাৎ যাত্রার সময় সকলকে বলে চলে যান। কোন শিষ্যকেও সঙ্গে নেন না। কিছুদিনের মতো কোন সংবাদ পাওয়া যায় না তাঁর। আবার একদিন যেমন গিয়েছিলেন তেমনি ফিরে আসেন।

কিন্তু এবার তিনি একা যান নি। ক'জন শিষ্যও তাঁর সঙ্গে গেছেন তবু যাত্রার পর থেকে আজ অবধি কোন সংবাদ নেই তাঁর। তাছাড়া যে কাজে শিবাজী হাত দিতে চলেছেন এতে গুরুদেবের মতামত নেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তিনি যে কোথায় আছেন তা না জানায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন শিবাজী। কয়েকজন অনুচরকেও পাঠিয়েছেন তাঁর সন্ধানে।

প্রভু। ডাকে মালশ্রী।

মালশ্রীর দিকে নীরবে তাকান শিবাজী।

রাত্রি অধিক হ'ল।

চল।

ধীরে ধীরে নেমে আসেন শিবাজী।

পিছনে তন্বঙ্গী মালশ্রী।

॥ দুই ॥

আওরঙজেব কন্যা মেহেরুন্নিসা চলেছে মাথুরা অভিমুখে। বাদশাহ তাঁর আদরিণী কন্যার জন্যে মাথুরায় শিবির স্থাপন করে কন্যার আগমন প্রতীক্ষা করছেন।

সঙ্গে চলেছে দাস দাসী, সৈন্য সামন্ত। মহা সমারোহে চলেছে মেহেরুন্নিসা।

মেহেরুন্নিসাকে মাথুরা আহ্বানের অন্য কারণও আছে। কারণ দিল্লী প্রাসাদ অন্তঃপুরের গোপন সংবাদে আওরঙজেব জানতে পেরেছেন ইদানিং মেহেরুন্নিসা দিন দিন চরম বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ছে। কন্যাকে হারেমের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে আওরঙজেব মেহেরুন্নিসাকে মাথুরায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আহ্বান জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন।

পিতার পত্র পেয়ে বিলম্ব করে নি মেহেরুন্নিসা। কারণ মেহেরুন্নিসা অল্প বয়সেই বুঝেছিল পিতার স্নেহ লাভ করতে হলে পিতার প্রতিটি ইচ্ছা এবং কর্মে তৎপর থাকতে হবে। নাহলে চিরতরে নির্বাসন নিতে হবে পিতার স্নেহ থেকে।

তাই আয়োজন সম্পূর্ণ হতেই মাথুরা অভিমুখে যাত্রা করেছিল মেহেরুন্নিসা। কষ্ট হয়েছিল খুবই কিন্তু পিতার আহ্বান অমান্য করার সাহস মেহেরুন্নিসার হয় নি।

তারপর দিনের পর দিন নতুন পথে নতুন দেশভ্রমণের আনন্দ জেগেছিল মনে। ভুলে গিয়েছিল হারেমের বিলাসিতার ব্যথা। নতুন পথে যাত্রা মনে প্রাণে মেনে নিয়েছিল মেহেরুন্নিসা। তাছাড়া সূর্যালোক হীন মোগলহারেমের যন্ত্রণাকাতর দিনগুলি ছেড়ে বাইরের মুক্ত আলো বাতাসের মাঝে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছিল মেহেরুন্নিসা।

তখন মধ্যাহ্নকাল। ভাদ্রের আকাশে আগুনরঙা সূর্যটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। পার্বত্য পথের কঠিন পাথরগুলো যেন আগুনের টুকরো।

ক্লান্ত মেহেরুন্নিসা। শিবিকার ভিতরে বসে থাকতে পারে না আর। অসহ্য মনে হয় মখমল মোড়া শয্যাটাকে।
বাঁদী মারফৎ বিশ্রামের জন্য শিবিকা নামাতে আদেশ জানায় মেহেরুন্নিসা। পার্বত্য উপত্যকায় শিবিকা নামায় বাহকরা। অস্থায়ী তঁবু খাটান হয় মেহেরুন্নিসা আর বাঁদীদের জন্যে। তাঁবুতে প্রবেশ করে শয্যার 'পরে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটাকে এলিয়ে দেয় মেহেরুন্নিসা। কাছে ছুটে আসে প্রিয় বাঁদী সাহিরা।
শাহাজাদী।
উঁ।
আদেশ করুন।
সাহিরার মুখের দিকে তাকায় মেহেরুন্নিসা। ক্লান্ত সাহিরা। তবু······। একটু চুপ করে থাকে মেহেরুন্নিসা। বলে, মাতুরা পৌঁছতে আর কদিন লাগবে জানিস ?
জানি।
কদিন ?
শুনলুম আরো দিন তিনেকের মতো লাগবে।
আরো তিন দিন!
হ্যাঁ। কারণ দুর্গম পথ বলে বহু সাবধানে চলতে হচ্ছে। তাই বেশি সময় লাগছে।
অন্য পথ নেই ?
আছে। তবে পথ প্রদর্শক কি সমস্ত কথা বলছিল।
কি বলছিল ?
বলছিল এ পথ দুর্গম হলেও বিপদ শঙ্কা কম।
ওঃ।
শীতল পানীয় নিয়ে আসে বাঁদীরা। নিয়ে আসে আহার্য্য। আহার শেষে শয্যায় দেহটাকে এলিয়ে দেয়।
সাহিরা। একসময় ডাকে মেহেরুন্নিসা।
আদেশ করুন।

এ পথে ভয়ের কি কারণ আছে ?
আছে বলেই শুনলাম।
কি সে ?
শিবাজী।
শিবাজী !
আজ্ঞে হ্যাঁ।
সামান্য একজন দস্যুর ভয়ে এই দুর্গম পথে আসার কি কারণ থাকতে পারে বুঝি না। অত সৈন্য থাকা সত্বেও কি করতো সে। তাছাড়া আর যাই করুক ভারত সম্রাট আলমগীর কন্যার ক্ষতি করবার সাহস সামান্য দস্যুর হত না।
কথা বলে না বাঁদী। নত মুখে চুপ করে থাকে।
সাহিরা। ডাকে মেহেরুন্নিসা।
আদেশ করুন।
কেমন লাগছে তোর এ ভ্রমণ।
ভাল……
আমারও ভাল লাগছে। প্রাসাদ ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছিল খুব। কিন্তু কি করবো, পিতার আদেশ। জানিস—।
আদেশ করুন।
উজির পুত্র খুব জব্দ হবে। প্রতিদিন হয়তো আমার সন্ধানে আসবে। কোন দিন প্রহরীদের চোখে পড়বে। তারপর……
মনের আনন্দে হেসে ওঠে মেহেরুন্নিসা। সাহিরা নতমুখে চুপ করে থাকে।
আচ্ছা সাহিরা।
আদেশ করুন।
তুই তো সুন্দরী। তোকে কেউ কোন দিন মহব্বত করেছে।
আমি বাঁদী শাহাজাদী !
সত্যি তোর বড় কষ্ট, নারে ?
সাহিরার জন্যে দুঃখ বোধ হয় মেহেরুন্নিসার। বাঁদী সাহিরা।

ক্রীতদাসী। দুঃখ, বেদনা আর লাঞ্ছনা ভরা অন্ধকার জীবন। আলো নেই। নেই মুক্তি।

তাঁবুর বাইরে পথপ্রদর্শক আর সেনাপতি নাজির খাঁর কথা শোনা যায়।

আমার মনে হয় এখুনি আমাদের যাত্রা করা উচিত।

যেমন হুকুম! তবে যেরকম গরম বাতাস বইছে তাতে শাহাজাদীর কষ্টের পরিসীমা থাকবে না।

তাহোক। আমি এখুনি যাত্রা করবো।

যো হুকুম।

সত্য কথা! একে দুর্গম পথ তাতে পাথর ছাড়া কিছু দেখা যায় না। কোথাও এতটুকু তৃণ নেই। রৌদ্রে পাথর এমনই উত্তপ্ত হয়ে আছে যে নগ্ন পায়ে পথ চলা অসম্ভব। কিন্তু নাজির খাঁর ভয় যদি দেরীতে যাত্রা করে কোন নিরাপদ ফাঁকা জায়গায় সন্ধ্যার পূর্বে আশ্রয় স্থান ঠিক না করা যায় তাহলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ এই অপরিচিত পার্বত্য প্রদেশের কোন গুপ্ত গিরিসঙ্কটের গোপন স্থানে সেই মারাঠা দস্যু নেই কে বলতে পারে। তাছাড়া শিবিকাবাহক আর পথপ্রদর্শক এই দেশীয়। ওদের 'পরে বিশ্বাস করে কোন কাজ না করাই উচিত। সেইজন্যে নাজির খাঁ তখুনি যাত্রা করবার আদেশ জানায়।

তাঁবুর ভেতর থেকে সব কথা শোনে মেহেরুন্নিসা।

সাহিরাকে বলে, সাহিরা সেনাপতি নাজির খাঁকে বলে আয় আমি ক্লান্ত, আমার পক্ষে এখনই যাত্রা করা সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয় বৈকালে যাত্রা করলেই হবে। কি বলেন শুনে আয়!

চলে যায় সাহিরা। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভাদ্রের রৌদ্রদগ্ধ আকাশের দিকে তাকায় মেহেরুন্নিসা। ধাঁধা লাগে।

একটু পরে ফিরে আসে সাহিরা।

হ্যাঁ।

কি বললেন!

তিনি দেখা করতে চান।

নিয়ে আয়।

একসময় তাঁবুর দ্বারের কাছে এসে দাঁড়ান নাজির খাঁ। শুভ্রকেশ বৃদ্ধ। পিতার বহুদিনের পার্শ্বচর। সময়ে অসময়ে কাছে কাছে থাকেন। নাজির খাঁকে স্নেহ করেন বাদশাহ তাই কন্যাকে মাদ্রা নিয়ে যাবার দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছেন।

শাহাজাদী। কুণ্ঠিত হয়ে ডাকেন নাজির খাঁ।

আসুন।

ভিতরে প্রবেশ করে কুর্নিশ করে দাঁড়ান বৃদ্ধ।

বসুন খাঁ সাহেব।

বসেন নাজির খাঁ।

শাহাজাদী।

বলুন।

শুনলাম আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চান আপনি।

হ্যাঁ, খাঁ সাহেব। আমি ক্লান্ত। শরীরটাকে শয্যার 'পরে ভালভাবে এলিয়ে দেয় মেহেরুন্নিসা। মুখের স্বচ্ছ আচ্ছাদন সরে যায়। বলে, সূর্যোলোকহীন হারেমের মাঝে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। পিতার আহ্বানে পথে বেরিয়ে ভেবেছিলুম এবার বুঝি আলো বাতাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় ঘটবে কিন্তু আপনার কঠিন নিয়মের নাগপাশে সে ইচ্ছা সরে যেতে দেরী হল না। হারেমে তবু খোলা মেলা জায়গা ছিল এখানে তাও নেই।

আমাকে এজন্যে ক্ষমা করবেন শাহাজাদী। আপনার এই কষ্টের জন্য আমি দুঃখিত কিন্তু বাদশাহের হুকুম পথে যেন দেরী না করি।

বিশ্রাম না নিতেও কি বাদশাহ আদেশ করেছেন?

না শাহাজাদী।

তবে?

মহারাষ্ট্রের এই পাহাড়গুলোতে সব সময় বিপদের ভয়, সেই কারণে নিরুপায় হয়ে দ্রুত গন্তব্য স্থলের দিকে যাত্রা করতে হচ্ছে।

কি ভয় ?

শিবাজী।

সে তো সামান্য দস্যু।

সামান্য কিনা বলতে পারব না শাহাজাদী, তবে কৌশলী।

আপনার সৈন্যরা কি যুদ্ধে অক্ষম ?

না শাহাজাদী। অক্ষম বা ভীরু তারা নয়। সম্মুখ যুদ্ধে তাদের সমকক্ষ যোদ্ধা খুব কমই আছে। কিন্তু শিবাজী এমনই চতুর যে যুদ্ধের কোন সুযোগই দেয় না।

হুঁ। দেখছি শিবাজী ভীতি আপনারও কম নয়।

শাহাজাদী।

হ্যাঁ তাই। শিবাজীকে যত কৌশলী চতুর বুদ্ধিমান আপনি ভাবুন না কেন আমি বলছি সে মূর্খ দস্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। পিতাও তাই বলেন।

ওঃ।

আপনি যান। বিকালে যাত্রা করা হবে।

যো হুকুম।

কুর্নিশ করে চলে যায় সেনাপতি নাজির খাঁ।

ধীরে ধীরে একসময় সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ে। যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। পথপ্রদর্শক পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলে। হঠাৎ সূর্যাস্ত না হতেই সমস্ত গিরিশিখর ছায়াচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। মেঘে ঢেকে যায় সারা আকাশ। অন্ধকারে ভরে যায় দশদিক। চঞ্চল হয়ে ওঠে সমস্ত দলটি। কিন্তু এমনি সংকীর্ণ পথ যে বৃষ্টি নামলে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার কোন উপায় নেই। তাছাড়া অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম পথে মুহূর্তের অসাবধানতার ফলে কি যে হবে তার ঠিক নেই। সেনাপতি নাজির খাঁ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিভাবে যে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারেন না। আশ্রয়ের যে ব্যবস্থা করবেন তারও উপায় নেই। শিবিকা বাহকরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। এমনিভাবে কিছুদূর যাওয়ার পর বাহকরা দাঁড়িয়ে

পড়ে। কারণ পথ এমনই সংকীর্ণ যে অতি সাবধানে না চললেই বিপদ। বাহকরা কি করবে স্থির করতে পারে না।
কি হ'ল দাঁড়ালে কেন? এগিয়ে আসেন নাজির খাঁ।
উত্তরে বাহকরা পথের দিকে দেখিয়ে দেয়। পথের অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন নাজির খাঁ। পথ এমনি দুর্গম মানুষের পক্ষে পার হওয়া অসম্ভব বললেই হয়। পথের পাশে পাথরগুলো আলগা ভাবে ঝুলে আছে। সামান্য অসাবধানতার ফলে বিপদ ঘটা অসম্ভব নয়।
এখন উপায়? নাজির খাঁ পথপ্রদর্শকের দিকে তাকান।
পার হওয়া অসম্ভব নয় হুজুর। উত্তর দেয় পথপ্রদর্শক।
কি করে?
আকাশ একটু শান্ত হ'লে এখন যত ভয়ঙ্কর বলে পথটাকে মনে হচ্ছে তখন তা হবে না।
পথের অবস্থা এমন তুমি জানতে?
পথ একটু খারাপ একথা জানতুম হুজুর কিন্তু এত খারাপ হয়ে আছে জানতুম না। বর্ষায় এমন হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।
বৃষ্টি নামলে এখন দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে।
তাছাড়া উপায় নেই হুজুর। একটু কষ্ট করতেই হবে।
পথপ্রদর্শকের উপর রাগে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে নাজির খাঁর। অধিক কষ্টে নিজেকে শান্ত করেন। শাহাজাদীর ওপরও রাগ কম হয় না। সে সময় যদি যাত্রা করা হত এ দুর্ভোগ তাহলে ভুগতে হত না।
আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছে আকাশ। ক্ষণে ক্ষণে বজ্র শব্দে কেঁপে উঠছে পাহাড়টা। মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি সমস্ত পাহাড়টা ভেঙে গুঁড়িয়ে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে।
বজ্রের শব্দে মেহেরুন্নিসাও কেঁপে উঠছে বারবার। সাহিরার একটা হাত চেপে ধরে তাকিয়ে আছে তার মুখের পানে। নির্বিকার বাঁদী সাহিরা।

সাহিরা। মৃদু কণ্ঠে ডাকে মেহেরুন্নিসা।

সে ডাক সাহিরার কানে পৌঁছায় না। ঝড়ের শব্দে হারিয়ে যায় কণ্ঠস্বর। স্তব্ধ পাষাণ মূর্তির মতো নিশ্চল সাহিরা।

সাহিরা। আবার ডাকে মেহেরুন্নিসা।

উঁ। সাড়া দেয় সাহিরা।

সাহিরা।

আদেশ করুন। সংবিত ফিরে পায় সাহিরা।

কি ভাবছিস ?

কিছু না শাহাজাদী।

সাহিরা।

আদেশ করুন।

সত্যই কি তোর মন মুহূর্ত আগে চিন্তা শূন্য ছিল ?

একথা কেন শাহাজাদী।

কি ভাবছিলি তুই ? মৃত্যুর কথা ?

না শাহাজাদী।

মৃত্যু চিন্তা তোর মনে ক্ষণিকের তরেও আসে নি আমাকে এ বিশ্বাস করতে বলিস ?

এসেছিল সত্য, কিন্তু মুহূর্তমাত্র। আমি অন্য কথা চিন্তা করছি।

কি কথা ?

উত্তর দেয় না সাহিরা। চুপ করে থাকে।

সাহিরা।

আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি বলতে পারব না।

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে মেহেরুন্নিসা। অপমানে রাঙা হয়ে ওঠে মুখ। হারেমে হলে সাহিরার এই অবাধ্যতার যোগ্য দণ্ড সে পেত। কিন্তু আকাশে বজ্র বিদ্যুৎ আর দুর্গম গিরি সঙ্কটের মাঝে মেহেরুন্নিসার চোখে ক্রোধের আগুনটা দপ্‌ করে জ্বলে উঠেই নিভে যায়।

বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় সাহিরার দিকে তাকিয়ে করুণায় মন ভরে যায় মেহেরুন্নিসার। নারী হৃদয়ে নারীর বেদনা উপলব্ধি করে।

সাহিরার হাতে মৃদু চাপ দেয় মেহেরুন্নিসা। বলে, তোর ব্যথা আমি বুঝি সাহিরা।
মেহেরুন্নিসার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে সাহিরা। খেয়ালী বাদশাহপুত্রীর মুখের পানে অন্ধকারের মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।
সাহিরা।
এঁ্যা!
কি ভাবছিলি?
আমার অতীত।
অতীত!
হ্যাঁ শাহাজাদী।
বল সে কথা।
কি করবেন শুনে। একটা সামান্যা বাঁদীর কথা নাই বা শুনলেন?
না আমি শুনবো। তুই বল।
সেই দুর্গম গিরি সঙ্কটে বিপদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খেয়ালী শাহাজাদীর কাছে সাহিরা তার অতীত জীবনের কথা বলে। শোনে মেহেরুন্নিসা। সাহিরার জন্য বেদনা বোধ করে মনে।
ধনীর দুলালী সাহিরা। শৈশবে মাতৃহারা, তাই সে বণিক পিতার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। লক্ষ্ণৌর জীবনের সে দিনগুলোকে কোনদিনই ভুলবে না সাহিরা। পিতাপুত্রীর ছোট্ট সংসার। দাসদাসীর বাহুল্য নেই। নেই আভিজাত্যের অহঙ্কার। সংগীত পাগল পিতার আদরিণী কন্যা পিতার হৃদয়ের কাছাকাছি এসেছিল সংগীতের অনুরাগে।
দিন কাটছিল। আনন্দভরা সুখী দিনগুলো নদীর স্রোতের মতো খুশীতে চঞ্চল হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এত সুখ সহ্য হল না সাহিরার ভাগ্যে। কারা যেন পিতাকে হত্যা করে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এল আনন্দভরা দিনগুলো থেকে।
অনেক অত্যাচার আর লাঞ্ছনার স্রোত বয়ে চলল কোমল কিশোরীটির ওপরে। অত্যাচারের বন্যায় ক্ষত বিক্ষত হল দেহ মন। বাঁদী

বাজারে বিক্রী হল সাহিরা। হ'ল ক্রীতদাসী। দিল্লী হারেমে কেমন করে এসে পড়ল একদিন।
সে সব দিনের সমস্ত ঘটনার ছবি মনে পড়লে আজও সাহিরার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। দুরন্ত এক প্রতিহিংসা স্পৃহা জেগে ওঠে মনের মাঝে। কিন্তু নিরুপায় সাহিরা। সাহিরা আজ বাঁদী।
সাহিরা। ডাকে মেহেরুন্নিসা।
বলুন শাহাজাদী।
এজীবন তোর অসহ্য নারে ?
না শাহাজাদী।
তবে ?
মুক্তি আমি চাই না শাহাজাদী। আপনার সেবা করে আমি কাটিয়ে দিতে চাই জীবন।
সাহিরা। সাহিরার একখানা হাত চেপে ধরে মেহেরুন্নিসা। বলে, আমি কথা দিলাম সাহিরা তোকে আমি ত্যাগ কোরব না।
কথা বলতে পারে না সাহিরা। ছল্ ছল্ করে ওঠে দুই চোখ।
বৃষ্টি হয় না। ঝড় বিদ্যুতের পরে আস্তে আস্তে মেঘ কেটে যায় আকাশের অন্ধকার একটু তরল হয়। বাহকরা শিবিকা তোলে। প্রথমে মশাল হাতে এগিয়ে চলে পথ প্রদর্শক। বাহকরা শিবিকা নিয়ে সন্তর্পনে পথ প্রদর্শককে অনুসরণ করে।
সেই দুর্গম পথ বাহকরা শিবিকা নিয়ে পার হওয়া মাত্র কয়েকজন অস্ত্রধারী কর্তৃক আক্রান্ত হল এবং কয়েকজন বাহকদের কাছ থেকে শিবিকা কেড়ে নিয়ে দ্রুত সেই অন্ধকার পথে ছুটে চললো। মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা। মেহেরুন্নিসা শিবিকা মধ্যে ভয়ে পাষাণের মতো বসে রইল। কারা এবং কি জন্যেই বা এমন ব্যবহার করল কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। শুধু কানে এল কিছু মানুষের সম্মিলিত চিৎকার।
আর কিছু মনে নেই মেহেরুন্নিসার।
এইভাবে শিবিকা আক্রান্ত হতে সকলে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে

ছিল। বিমূঢ়তা কাটতে সৈন্যরা শিবিকা রক্ষার জন্যে ছুটে আসে কিন্তু অনেকেই আক্রমণকারীদের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারায়। সকলে ভয় পেয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আক্রমণকারীদের একজন বলে, এক পা এগুলেই প্রাণ হারাবে। যে যেখানে আছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। একটু পরেই যেতে দেব।

আমাদের শিবিকা কোথায়? জিজ্ঞাসা করেন নাজির খাঁ।

শিবিকা কোথায় সে কৈফিয়ৎ চেওনা। বাদশাহকে জানিও তাঁর কন্যার সম্ভ্রমের কোন ত্রুটি হবে না।

কিন্তু কেন তাঁকে হরণ করলে?

প্রয়োজন আছে।

কি প্রয়োজন?

বলতে বাধ্য নই।

তুমি কে?

আমি? একটু চুপ করে থাকেন সেই মূর্তি। বলেন, বাদশাহকে বোলো তিনি যাকে পার্বতীয় দস্যু বলে ঘৃণা করেন তাঁর কন্যা তারই হাতে বন্দিনী।

আপনি শিবাজী!

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান নাজির খাঁ। ইতিপূর্বে শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটলেও শিবাজী সম্বন্ধে বহু কথা শুনেছিলেন।

ভয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সকলে।

এবার তোমরা যেতে পার। একসময় বলেন শিবাজী।

আমাদের পথপ্রদর্শক কোথায়?

তাকেও নিয়ে যাচ্ছি আমি। তাছাড়া এই গিরিসঙ্কট পার হয়ে উৎরাই পাবে। পথপ্রদর্শক ছাড়াই পথ চিনে নিতে কষ্ট হবে না তোমাদের।

মুহূর্তে বাদশাহী সৈন্যদের সামনে থেকে অন্তর্হিত হল শিবাজী।

সবাই ছুটে আসে। আহতরা ছাড়া আর কেউ নেই।

শিবাজীর কয়েকজন অনুচর আর পথপ্রদর্শক নিতাইজী কিছুদূরে অপেক্ষা করছিলেন। মেহেরুন্নিসাকে নিয়ে শিবিকা বাহকরা মঙ্গলগড় দুর্গের দিকে এগিয়ে গেছে। শিবাজীর নির্দেশ অনুসারে বাদশাহ পুত্রী মেহেরুন্নিসা সেখানে থাকবে।

নিঃশব্দে শিবাজী এসে দলের সঙ্গে মিলিত হন।

কি সংবাদ প্রভু? জিজ্ঞাসা করেন নিতাইজী।

শুভ।

বাদশাহী সৈন্যরা আমাদের অনুসন্ধান করবে নাকি?

মনে তো হয় না। কারণ শিবাজীর সঙ্গে ইতিপূর্বে সাক্ষাৎ না ঘটলেও শিবাজীর নামের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচয় আছে। তাছাড়া এই অপরিচিত বিপদ সঙ্কুল পার্বত্য প্রদেশে নিজেদের জীবন রক্ষার্থেই সদা সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে।

আমার মনে হয় ওদের ফিরে না যেতে দেওয়াই উচিত ছিল। বলেন নিতাইজী।

না নিতাইজী। অকারণ কতকগুলো জীবন নেওয়ায় কোন লাভ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়েছে।

নিতাইজী উত্তর করেন না। শিবাজীর এই নীতি বরাবরই তাঁর মনপুতঃ নয়। শিবাজী অকারণ হত্যা পছন্দ করেন না। শত্রু হলেও কার্যোদ্ধার শেষে তিনি ক্ষমা করেন শত্রুদের। নিতাইজী চান শত্রুর শেষ। কাজ শেষ হলেও শত্রুকে দয়া প্রদর্শনের কোন অর্থই তিনি খুঁজে পান না। কারণ যে শত্রু আজ শিবাজীর কৃপায় প্রাণ ফিরে পেল কালই তো সে আবার নবোদ্যমে শিবাজীর বিনাশে এগিয়ে আসবে। তার থেকে আজই যদি তাকে ধ্বংস করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে শত্রুতাচারণের কোন সুযোগই তার মিলবে না।

কিন্তু ভিন্ন মত শিবাজীর। এইজন্যে ইতিপূর্বে কয়েকবার বিপদের সম্মুখীনও হতে হয়েছে, তবুও মতের পরিবর্তন হয় নি শিবাজীর। মনে প্রাণে একবার যা তিনি গ্রহণ করেন তাকে ত্যাগ করবেন না একথা জানেন নিতাইজী।

নিতাইজী। ডাকেন শিবাজী।

আদেশ করুন।

আপনাকে আদেশ করবো এমন দুঃসাহস আমার নেই নিতাইজী। কারণ জীবন তুচ্ছ করে একের পর এক যে অসাধ্য সাধন আপনি করেছেন তা করা শিবাজীর পক্ষেও সম্ভব নয় নিতাইজী। ভবানীর পাদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছি কার্যোদ্ধার ব্যতীত অকারণ জীবহত্যা কোনদিন করবো না।

শেষের দিকে শিবাজীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

আমাকে মার্জনা করবেন প্রভু।

নিতাইজীকে বুকে টেনে নেন শিবাজী। বলেন, আমাকেও আপনি ক্ষমা করবেন নিতাইজী। কারণ আপনার যুক্তি মূল্যহীন নয়। কিন্তু কি করবো আমি নিরুপায়।

অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেন সবাই। শিবাজী বলেন, বাজী নিরাপদে আছে তো?

হ্যাঁ প্রভু। আগামী কালই সে ফিরে আসবে।

বাদশাহপুত্রীর যাতে কোন অসুবিধা না হয় আপনি, চন্দ্ররাও আর মালশ্রী তা দেখবেন।

আপনি!

আমি মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবো। হয়তো ফিরতে দু একদিন বিলম্ব হবে আমার। ইতিমধ্যে মাদুরায় গোপনে সংবাদ নেবার জন্যে লোক পাঠাবেন। আমার মনে হয় আওরঙজেব শিবাজীকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে ব্যবস্থা করবেন।

আমারও তাই মনে হয়।

আপনি কাল প্রভাতেই চর পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। সৈন্যরা গিয়ে পৌঁছবার আগেই যেন যেতে পারে। আর যেমন যেমন সংবাদ আসে আমাকে জানাবার ব্যবস্থা করবেন।

তাই হবে প্রভু।

অনুচরদের সঙ্গে একটি স্থানে গিয়ে দাঁড়ান শিবাজী। সেখানে

কয়েকটি অশ্ব বৃক্ষশাখায় বাঁধা ছিল। শিবাজীর কয়েকজন অনুচর অপেক্ষা করছিল সেখানে।

চন্দ্ররাও। ডাকেন শিবাজী।

শিবাজীর একজন অনুচর কাছে এসে দাঁড়ায়।

আদেশ করুন প্রভু।

দাসী সংগ্রহ করেছ?

করেছি প্রভু।

বিশ্বাস করতে পারা যায় তাদের?

হ্যাঁ প্রভু। নীরাবাঈও চাকন দুর্গ থেকে এসে পৌঁচেছেন।

নীরাবাঈ এসেছে?

হ্যাঁ প্রভু।

বেশ। আর শোন সকলকে জানিয়ে দেবে বাদশাহপুত্রীর সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়। আর আমার সম্বন্ধে কোন কথাই যেন বাদশাহ পুত্রীকে না বলা হয়।

বলব প্রভু।

এবার আপনারা যাত্রা করুন।

শিবাজীকে প্রণাম জানিয়ে সকলে মঙ্গলগড় দুর্গের উদ্দেশে যাত্রা করে।

স্থির হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে বসে থাকেন শিবাজী ও নিতাইজী।

নিতাইজী।

বলুন।

আমার অনুপস্থিতিতে আপনি সব দেখবেন।

দেখব প্রভু।

পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন।

ধীরে ধীরে পূর্বগামীদের অনুসরণ করেন নিতাইজী।

শিবাজী তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

আকাশে দু' একটি করে ফুটে উঠছে সন্ধ্যাতারা।

চাকন দুর্গের উদ্দেশে যাত্রা করেন শিবাজী।

॥ তিন ॥

কক্ষের বাতায়ন পাশে চুপ করে বসেছিলেন জীজাবাঈ।

আকাশে সন্ধ্যাতারার অজস্র হীরকখণ্ড নিশীথিনী রাত্রির দিকে বিস্ময়াকুল আঁখি মেলে স্বপ্নের প্রহর গোনায় ব্যস্ত। শরতের সুনীল আকাশে আবছা আবছা শুভ্র মেঘের ভেলা, রাত্রির প্রহরেও তাদের নিরুদ্দেশ যাত্রায় বিরাম নেই। মৃদু মন্দ বাতাস পাহাড়ী বনলতার গন্ধ বয়ে আনছে।

আশে পাশে মহারাষ্ট্রের নাতি উচ্চ পর্বতগুলির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিলেন জীজাবাঈ। জীজাবাঈয়ের মন আজ কি এক যেন অশুভ আশংকায় প্রভাত থেকেই চঞ্চল হয়ে আছে। পুত্র শিবাজীর আজ কয়েকদিন কোন সংবাদ নেই। হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণে ব্যস্ত আছে পুত্র। তন্নজী মালশ্রীও হয়তো সেই কারণে কয়েকদিন আসতে পারে নি। পুত্রকে অনেকদিন দেখেন নি জীজাবাঈ। মালশ্রী মারফৎ শিবাজীর সমস্ত সংবাদ অবগত হন তিনি। পুত্র অদর্শনের অশ্রান্ত মাতৃহৃদয় মালশ্রীর সংবাদে কিছুটা শান্ত হয়। কিন্তু আজ কয়েকদিন মালশ্রীও কোন সংবাদ নিয়ে আসে নি।

যেমন পুত্র তেমনি তার বন্ধু। মনে মনে ভাবেন জীজাবাঈ। দুজনেই চতুর শিরোমণি। প্রতিবারেই মালশ্রী এসে জানায় শিবাজী আসছেন। আশায় আশায় দিন গোনেন জীজাবাঈ। শিবাজী আসে না। অভিমানে ভরে যায় বৃদ্ধার অন্তর।

মালশ্রী আসে।

কি সংবাদ মালশ্রী ? জিজ্ঞাসা করেন জীজাবাঈ।

সংবাদ শুভ মা। প্রভু কিছু দিনের মধ্যেই আসছেন।

কতদিন পরে মালশ্রী ?

প্রভু বলেছেন শীঘ্রই তিনি আসবেন।

তোমার প্রভু কি খুব ব্যস্ত মালশ্রী ?

হ্যাঁ মা।

তাহলে তোমার প্রভুকে গিয়ে জানিও তাঁর আসবার প্রয়োজন নেই।

একথা কেন মা ?

কেন তা কি বোঝ না তুমি !

সব বোঝে মালশ্রী। লজ্জিত হয়। মাতৃহৃদয়ের ব্যর্থ প্রতীক্ষার ব্যথা আপন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে মালশ্রী। মাথা নত করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

মালশ্রী। একসময় ডাকেন জীজাবাঈ।

মা।

তোমার প্রভু কি সত্যই খুব ব্যস্ত ?

হ্যাঁ মা। একটু চুপ করে থাকে মালশ্রী। বলে, আপনার কাছে না আসতে পারার জন্যে তিনিও কম দুঃখীত নয় মা। কিন্তু······

তা আমি জানি মালশ্রী। তোমার প্রভুকে বোল তার কাজ শেষ করেই তিনি যেন আসেন।

জীজাবাঈয়ের মুখের দিকে চকিতে তাকিয়ে ছিল মালশ্রী। মুগ্ধ হয়েছিল শিবাজী জননীর উত্তরে। ব্যাকুল মাতৃহৃদয়ের অশান্ত কাতর প্রতীক্ষাকে তুচ্ছ করে পুত্রের কর্তব্য কার্য সমাপনের আদেশ দিচ্ছেন শিবাজী জননী।

মনে মনে শিবাজী জননীর চরণে সহস্র প্রণাম জানিয়েছিল তন্নজী মালশ্রী। আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, প্রভুকে তাই বলব মা।

তাই বোল মালশ্রী। বোল, তার কাজ ফেলে রেখে সে যেন না আসে। মাতৃভূমির প্রয়োজনের কাছে জননীর প্রয়োজন বড় নয়।

বলেছেন জীজাবাঈ।

মুগ্ধ হৃদয়ে বিদায় নিয়ে শিবাজীর কাছে ফিরে গেছে মালশ্রী।

সব শুনে জননীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়েছেন শিবাজী।

প্রতীক্ষা সুরু হয়েছে জীজাবাঈয়ের।

মালশ্রীর আগমন তিনি চান নি। চেয়েছেন পুত্রদর্শন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে জীজাবাঈয়ের দুরন্ত প্রতীক্ষা।

কেউ আসে নি।

আকাশের দিকে তাকান জীজাবাঈ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে কখন রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে জানতে পারেন নি। নীরা কাছে ছিল কিন্তু সেও আজ নেই। সে কাছে থাকলে বারবার এসে শয্যা গ্রহণের জন্য তাড়া দিত। শিবাজীর প্রয়োজনে সে আজ মঙ্গলগড়ে চলে গেছে। কি প্রয়োজন কিছুই জানেন না তিনি।

অন্যদিন শয্যা গ্রহণ করলেও নিদ্রা আসে না জীজাবাঈয়ের চোখে। সমস্ত অঙ্গ জ্বালা করে অসহ্য যন্ত্রণায়।

বারবার মনে পড়ে পুত্রের কথা। এই মুহূর্তে পুত্র হয়তো সংগ্রাম রত। হয়তো বিপদ সঙ্কুল পথে শক্রর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে অনুচরদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে নিঃশব্দে। আজ এই প্রথম নয়। যেদিন কিশোর বালক তার মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাওলী বন্ধু নিয়ে দুরন্ত শীতের রাত্রে প্রথম অধিকার করল চাকন দুর্গ। সেইদিন থেকেই এই চিন্তা শুরু হয়েছে তাঁর। দিনে রাতে সর্বক্ষণ অহরহ এই চিন্তা তাঁর সাথে সাথে ফিরছে। ভবানীর কাছে প্রতিদিন পুত্রের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করছেন।

হঠাৎ শিশুর ক্রন্দনে সচকিত হয়ে ওঠেন জীজাবাঈ।

মাতৃহারা সন্তান। শিবাজীর পুত্র শম্ভু।

এই শিশুই আজ তাঁর সব।

কতদিন হবে?

মনে মনে হিসাব করেন জীজাবাঈ। তিন বছর পার হয়ে গেছে। শম্ভুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা হ'ল শিবাজীর পত্নী। শিবাজী তখন পুনায়। পত্নীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েও আসতে পারল না শিবাজী। তখন শিবাজী ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত।

সেদিন থেকে জীজাবাঈ বুকে তুলে নিয়েছে শিশুকে। বুকে নিয়ে মানুষ করে তুলছে আজ তিন বছর।

হ্যাঁ, পত্নীর মৃত্যুর বেশ কয়েকদিন পরে এসেছিল শিবাজী। অপরাধীর মতো মাথা নত করে এসে দাঁড়িয়ে ছিল জননীর সামনে।

পুত্রকে তিরস্কার করতে পারেন নি জীজাবাঈ। বীরের জননী তিনি। বীরপুত্র দেশের জন্যে সংগ্রামরত। সংসারের বিপদে কাছে না থাকায় কি এমন ক্ষতি হ'ল। যে যাবার সে চলে গেছে। পুত্র কাছে থাকলেও যেত। বরং দেশের বিপদকালে পুত্র যদি তার কর্তব্য কর্ম ফেলে সংসারের মাঝে ছুটে আসতো তাহলে সেদিন পুত্রকে ক্ষমা করতে পারতেন না তিনি।

মৃত্যু শয্যায় শায়িতা পুত্রবধূও তাই বলেছিল।

শিবাজীকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে শুনে বলেছিল, আমি চাই না এই সময় তিনি ছুটে আসুন। পুত্রবধূর কথায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন জীজাবাঈ। নীরবে আশীর্বাদ করেছিলেন।

ধীরে ধীরে এক সময় মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছিল। গভীর নিদ্রায় নিদ্রিতা হয়ে পড়েছিল পুত্রবধূ। আর জাগে নি।

তার পর থেকে ছোট শিশুটিকে নিজের বুকে তুলে নিয়েছিলেন জীজাবাঈ।

কান পাতেন জীজাবাঈ। না শিশুর ক্রন্দন আর শোনা যায় না। দাসী বোধ হয় ঘুম পাড়িয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে দুরন্ত শিশু।

পিতার মতই হয়েছে পুত্র। এতটুকু শিশুর দৌরাত্মে মাঝে মাঝে দাস দাসী, জীজাবাঈ পর্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠেন। দুরন্ত শিশু নিজের ইচ্ছা মতো পথ চলবে ; বাধা দিলেই কুরুক্ষেত্র বাঁধাবে।

মাঝে মাঝে ভাল লাগে না জীজাবাঈয়ের। ভাবেন, সবকিছু ছেড়ে তীর্থক্ষেত্রে চলে যাবেন। শিশুকে বলেন সে কথা। শুনে ছোট হাতে কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে শিশু। আধ আধ কণ্ঠে বলে।

যেতে দিলে তো।

আমি লুকিয়ে পালিয়ে যাব। বলেন জীজাবাঈ।

আমিও যাব। উত্তর দেয় শিশু।

আমি যখন যাব তখন তো তুই ঘুমিয়ে থাকবি।

আমি ঘুমোব না।

খেলায় মাতে শিশু। মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখে যায় জীজাকে।

সব বোঝেন জীজা। যদি লুকিয়ে পালিয়ে যান সেই ভয়ে পাহারা দিচ্ছে।

আসে রাত্রি। শিশুকে শয্যায় শুইয়ে ঘুম পাড়ান জীজাবাঈ। গল্প বলেন রোজকার মতো। যেমন বহুদিন আগে ছেলেবেলায় ছোট্ট শিবাজীকে ঘুম পাড়াবার সময় বলতেন।

কিন্তু ঘুমোয় না শিশু। চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে থাকে।

সন্দেহ জাগে মনে জীজাবাঈয়ের।

শম্ভু। ডাকেন জীজাবাঈ।

দাদী। চোখ মেলে চায় শিশু।

ঘুমচ্ছ না কেন?

ঘুমাব না আমি।

কেন?

আমি ঘুমুলে তুমি যে পালিয়ে যাবে।

গভীর মমতায় মাতৃহারা শিশুকে বুকে চেপে ধরেন জীজাবাঈ। বলেন, নারে পাগল আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

সত্যি!

সত্যি দাদু, নে ঘুমিয়ে পড়।

মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ে শিশু। ওর অসহায় ঘুমন্ত কচি মুখখানির দিকে তাকিয়ে ব্যথায় ভরে যায় জীজার হৃদয়। চোখ ভরে ওঠে জলে।

মা—মা।

কক্ষদ্বারের বাইরে দাসীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। আশ্চর্য হ'ন জীজা।

এত রাত্রে দাসী ডাকে কেন?

ভেতরে আয়। দাসীকে ভিতরে ডাকেন জীজা।

দাসী ভিতরে প্রবেশ করে।

কি হয়েছে?

প্রভু এসেছেন মা।

আমার শিব্বা এসেছে!

হ্যাঁ মা।

কোথায় সে ?

এই যে মা।

বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করে মায়ের চরণে প্রণাম করেন শিবাজী। বহুদিন পরে পুত্রকে কাছে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন জীজা। চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে অজস্র ধারায় আনন্দাশ্রু।

মাতার চোখের অশ্রু মুছিয়ে দেন শিবাজী।

বলেন, কেঁদ না মা। শিবাজীর জননী দুঃখে কাঁদবে মা ?

দুঃখে নয় বাবা, কাঁদছি আনন্দে। উত্তর দেন জীজা। পুত্রের হাত ধরে বসান।

সেই রাত্রে দাসীদের ঘুম থেকে তোলেন জীজাবাঈ। আহার্য প্রস্তুতে আদেশ দেন। বিলম্ব করলে হয়তো আহার করবার সুযোগ পাবেন না। হয়তো কাল প্রভাতেই চলে যাবে পুত্র।

মাতার ব্যস্ততা দেখে মৃদু মৃদু হাসেন শিবাজী। বাধা দেন না। নিজ পুত্রের শিয়রে বসে থাকেন শিবাজী। অকাতরে ঘুমচ্ছে শিশু। ঘুম থেকে তোলেন না।

এক সময় কাছে এসে দাঁড়ান জীজাবাঈ।

সব কুশল তো পুত্র ?

হ্যাঁ মা।

নীরাবাঈ কেমন আছে ?

ভাল।

মালশ্রী কি খুব ব্যস্ত ?

হ্যাঁ মা। কয়েকদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। সেইজন্যে মালশ্রী আসতে পারে নি।

কার্যোদ্ধার হয়েছে ?

হ্যাঁ মা সফল হয়েছি। তবে…

কি পুত্র ?

এইবার বোধ হয় মহারাষ্ট্রে সত্যই আগুন জ্বলে উঠবে। বাদশাহ আওরঙজেব এবার মহারাষ্ট্রের বুকে আগুন জ্বালিয়ে তুলবেন। একটু

চুপ করেন শিবাজী। দূর আকাশের অগণিত নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে একটুক্ষণ স্থির নয়নে তাকিয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, ভুল আমি করি নি। বাদশাহ আওরঙজেবকে এ আঘাতটুকু দেবার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন আছে আমার নিজের। বাদশাহ সৈন্য বাহিনীর ধ্বংসের পরীক্ষায় শিবাজীর উত্থান পতনের ইতিহাস মহারাষ্ট্রেই রচিত হবে। তিলে তিলে মনের মধ্যে যে আশা এতকাল লালন করে এসেছি এবার তা প্রকাশের সময় এসেছে। মারাঠার পরিচয়ের এবার দিন আসছে।

শিবাজীর কথায় বৃদ্ধা জীজার অন্তরটা কেঁপে ওঠে অশুভ আশঙ্কায়। পুত্রের ধীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মাতৃহৃদয়ে ব্যথার সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন, কি প্রয়োজন ছিল পুত্র বাদশাহের রোষানলকে এমন সর্বনাশারূপে প্রজ্বলিত করে তোলবার ?

সময় এসেছে মা। জননীর ব্যাকুল মুখের পানে তাকিয়ে বলেন শিবাজী, ছোট ছোট সংগ্রামে আমার অনুচররা জয়লাভ করলেও দিনে দিনে তারা হীনবল হয়ে পড়ছে। কর্তব্য, কর্মে পরিণত হয়ে পড়ছে তাদের মন। আগের সে উদ্দীপনা ক্রমশই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। তাই আজ আমি কঠিন কঠোর সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাই। দেশাত্মবোধের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে চাই তাদের অন্তরে।

জ্বলে ওঠে শিবাজীর দুই চোখের দৃষ্টি। দেখেন জীজাবাঈ। জননীর অন্তরেও ইচ্ছার তরঙ্গ জাগে। মৃদু কণ্ঠে ডাকেন—পুত্র।

মা।

যে প্রশ্ন তোমাকে করবো তা হয়তো অনধিকার চর্চা। তবুও সব কথা জানবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কি জানতে চাও মা ?

বাদশাহকে কি এমন আঘাত হেনেছ যার জন্যে বাদশাহ এবার মহারাষ্ট্রের বুকে আগুন জ্বালাতে দ্বিধা করবেন না ?

পুত্রের মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান জীজাবাঈ।

বাদশাহ পুত্রীকে আমি হরণ করেছি মা।

পুত্র!

সত্য মা।

কথা বলেন না জীজাবাঈ। বলতে পারেন না। অন্তরটা দুরন্ত অমঙ্গল আশঙ্কায় থর থর করে কেঁপে ওঠে। পুত্রের এই কর্মে মাতার অন্তরে শেল হানে। মারাঠার আশা ভরসা তাঁর পুত্র, কিন্তু এ কি পরিচয় প্রকাশ করল।

মনে পড়ে বহু শত সহস্র বর্ষের অতীতকে। যেদিন রাবণ রাজা সীতা হরণ করেছিলেন সেইদিনকে। ভগ্নী সূর্পনখার অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে স্ববংশে ধ্বংস হয়েছিলেন। জাতির ইতিহাস কলঙ্কের কালিমা মাখতে দ্বিধা করে নি তাঁর নামে। বীর সুপণ্ডিত রাজা রাবণ চিরদিন মানুষের মনে হীন রাক্ষস রূপে রয়ে গেলেন। পেলেন না শ্রদ্ধার সম্মান। পেলেন না এতটুকু করুণার অমৃত ধারা।

ইচ্ছে করলে সব পেতে পারতেন তিনি। ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতেন। স্থান পেতেন মানুষের অন্তরে। সীতা হরণের কলঙ্ক কালিমা তাঁর সব গৌরব মুছে দিলে।

সম্মান পেলেন বিভীষণ। ধর্মদ্রোহী, জাতিদ্রোহী বিভীষণ। পেলেন শ্রীরামচন্দ্রের স্নেহ। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য।

মা—ডাকেন শিবাজী।

বল পুত্র। পুত্রের মুখের পানে তাকান জীজাবাঈ।

আমার কাজ হয়তো তোমার মনে ব্যথা দিয়েছে মা।

সত্য পুত্র।

কিন্তু মা এছাড়া অন্য পথ আমার ছিল না। এ সুযোগ হারালে অনেক কিছুই আমি হারাতাম।

তোমার কাজের নিন্দা বা সমালোচনা করছি না পুত্র। তবু একটা কথা আজ তোমাকে বলব।

বল মা?

নারী হরণের কলঙ্ক বড় সর্বনাশা কলঙ্ক পুত্র। যার জন্য বহুরাজ্য,

জাতি ধ্বংস হয়েছে। নারী হরণের জন্যে সোনার লঙ্কা হয়েছে ছারখার। ভগ্নীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যই তিনি হরণ করেছিলেন সীতাকে।

দোষ যদি কারো থাকে তা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের। যৌবনাবতী অনার্য কন্যা সূর্পনখা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রূপে লুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু তাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণের মিথ্যাভাষণে। তবুও শাস্তি হল সূর্পনখার। ধ্বংস হল লঙ্কা রাজ্য। বাদশাহ পুত্রীকে হরণ করায় আমি ব্যথিত পুত্র। কারণ বাদশাহ পুত্রী হরণের কলঙ্ক যদি দিকে দিকে রাষ্ট্র হয় তা হলে সে কলঙ্ক আমার পুত্র শিবাজীর নামে রটবে না, সমস্ত মারাঠা জাতির নামে প্রচার হবে। বাদশাহের ক্রোধানলে ধ্বংস হবে সমগ্র হিন্দুজাতি।

কিন্তু মা বাদশাহ কি নারী হরণ করেন নি। ধ্বংস করেন নি হিন্দুর দেবমন্দির। যে জঘন্য অত্যাচার তিনি দিনের পর দিন করছেন তার কি কোন প্রতিকার করা উচিৎ নয় মা ?

সত্য পুত্র। বাদশাহের অত্যাচারের নজির মেলে না সত্য। কিন্তু তিনি যে সমস্ত হিন্দুস্থানের ভাগ্যবিধাতা। তাঁর কলঙ্ক কাহিনী প্রচার করার সাহস কারো নেই। কিন্তু তোমার কলঙ্কে যদি আজ দেশ ছেয়ে যায় তাহলে তোমারই যে অপকার হবে পুত্র। মিথ্যা কলঙ্কে বন্ধুও যে দূরে সরে যায়। তাছাড়া বাদশাহ যেমন অপকার করেছেন উপকারও কম করেন নি।

উপকার !

হ্যাঁ পুত্র, উপকার। বাদশাহ আকবর হিন্দুকে বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধে হিন্দুর যে ক্ষতি করে গেছেন তাতে তার লুপ্ত চেতনা ফিরতে আওরঙ্গজেবের এই নির্মম আঘাতের প্রয়োজন হিন্দুর জীবনে ছিল পুত্র।

একে তুমি উপকার বলছ মা ?

বলছি পুত্র। ধীরে ধীরে বলেন জীজাবাঈ। হিন্দুর সত্যকার পরিচয় পেয়ে বাদশাহ আকবর বুঝেছিলেন শুধুমাত্র অস্ত্রাঘাতে হিন্দুর হিন্দুত্বকে লোপ করা সম্ভব নয়। মুসলমানের পক্ষে হিন্দুকে দমন

করা সম্ভব নয়। তাই তিনি মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন। হিন্দুদের ছলে বলে কৌশলে চিরআত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধেছিলেন। হিন্দুর অস্ত্রাঘাতে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন হিন্দুর রাজশক্তি। টোডরমল্লকে দিয়ে জয় করিয়েছিলেন বঙ্গদেশ।

তারপর বাদশাহ জাহাঙ্গীর। অলস বিলাসপ্রিয় বাদশাহ কিন্তু মানব দরদী। তারপর সম্রাট সাজাহান। ক্রুর চক্রান্তকারী বাদশাহ। নিজের আত্মীয় স্বজন ভাই বন্ধু যাকেই সিংহাসনের দাবীদার মনে করেছিলেন তাঁকেই হত্যা করেছেন নির্বিচারে, কিন্তু হিন্দুর প্রতি দুর্বলতা তাঁরও ছিল। হিন্দুর হিন্দুত্ব তাঁর সময়েও লোপ পাচ্ছিল। আওরঙজেব কঠোর, কঠিন। দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার সুরু করেছেন হিন্দুর উপর। জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহকে করেছেন হাতিয়ার। ছিন্ন করেছেন হিন্দুর সঙ্গে সমস্ত স্নেহ বন্ধন। সুরু করেছেন নিস্পেষণ। এ অত্যাচারে হিন্দু যেমন দিনে দিনে সর্বহারা রিক্ত হচ্ছে, তেমনি তার মনের মধ্যে জাগতে সুরু করেছে মনুষ্যত্ব। হিন্দু আজ বুঝেছে হিন্দু সর্বহারা রিক্ত হলেও মানুষ। হিন্দু হীন ভীরু কাপুরুষ নয়। তার প্রমাণ আজকের মহারাষ্ট্র।

জননীর মুখের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন শিবাজী। বুঝতে পারেন বাদশাহের অত্যাচারের সম্বল শুধু আঁখিজল নয়, তার মাঝে হিন্দুর নব জাগরণ।

কিন্তু মা……

বল পুত্র।

বাদশাহ পুত্রীকে হরণ করে আমি তার ক্ষমতাকে আঘাত দিয়েছি।

সত্য কথা। অন্যায় হয়তো সেদিক থেকে কিছু করনি কিন্তু আমার অনুরোধ তাঁর কোনরূপ অমর্যাদা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখ।

তুমি নিশ্চিন্ত থেক মা। আমি সেই রকমই আদেশ দিয়েছি। বাদশাহ পুত্রীর যদি কোনরূপ অমর্যাদা কোন কারণে হয় তার প্রতিকার আমি সব সময় করবো। জগৎ যদি আমাকে নারী হরণের কলঙ্কের ধিক্কার দেয়—দিক। শিবাজী তাঁর কাছে অকলঙ্ক থাকবে।

দাসী এসে সংবাদ দেয় আহার্য প্রস্তুত।
মাতা পুত্র উঠে পড়েন। কাছে বসিয়ে বহুদিন পরে পুত্রকে আহার করান জীজাবাঈ। অনুযোগ করেন কম আহার করার জন্যে। কথা বলেন না শিবাজী। হাসেন।
জীজাবাঈয়ের কাছে আজও যেন শিবাজী সেই ছোট্ট বালকটি আছেন।

পিতা আমার মা কোথা ?
বালক শম্ভু প্রশ্ন করে পিতাকে। শিশুর প্রশ্নে সহসা কোন উত্তর দিতে পারেন না শিবাজী।
পিতা। আবার ডাকে বালক।
বল পুত্র।
আমার মা কোথায় ?
অদূরে দাঁড়িয়ে পিতাপুত্রের কথা শুনছিলেন জীজাবাঈ। কাছে এগিয়ে আসেন। শিশুকে তুলে নেন আপন ক্রোড়ে।
দাদী।
বল বাবা।
আমার মা কোথা ?
পিতাকে ছেড়ে শম্ভু বৃদ্ধা জীজাবাঈকে প্রশ্ন করে। আজ এই প্রথম নয়। বহুদিন এ প্রশ্ন শিশুর মনে হয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছে দাদীকে। অশ্রু চেপে রেখে উত্তর দিয়েছে জীজা, কিন্তু উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারে নি শিশু তাই পিতাকে কাছে পেয়ে সেই প্রশ্ন তুলেছে।
আমার মা কোথা ? আবার প্রশ্ন করে শিশু।
মা আছেন বাবা।
কোথায় ?
ওই আকাশে।
কবে আসবে ?
সময় হলেই আসবে।

তুমি তো রোজই বল সময় হলেই আসবে। কবে সময় হবে? অবুঝ বালক প্রশ্ন করে। অতিকষ্টে অশ্রু রোধ করেন জীজাবাঈ। বলেন, এবার আসবে।

সত্যি!

সত্যি।

সত্যি পিতা?

বালকের প্রশ্নের উত্তরে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়েন শিবাজী।

কবে আসবে পিতা?

বালকের মুখের পানে অসহায় ভাবে তাকান শিবাজী। মিথ্যা সান্ত্বনা বাক্য মুখে আসে না। একদৃষ্টে পুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে থাকেন। মাতৃহারা অবোধ শিশুর জন্যে অন্তরটা ব্যথায় ভরে যায়। ইচ্ছে হয় এই মিথ্যা ছলনা না করে পুত্রকে বলেন, তার মা কোনদিনই আর ফিরে আসবেন না।

পারেন না। নিঃশব্দে মাথা নত করে বসে থাকেন। অদূরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অশ্রু মোছেন জীজাবাঈ।

পিতা। পিতাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ডাকে বালক।

বল পুত্র। সচকিত হয়ে ওঠেন শিবাজী।

রাগ করেছ তুমি?

রাগ!

হ্যাঁ।

না পুত্র।

তবে কথা বলছ না কেন?

এই যে বলছি পুত্র।

ম্লান একটু হাসেন শিবাজী। পুত্রকে কাছে টেনে নেন।

পিতার বুকে মাথা রাখে বালক। চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে ছ ফোঁটা অশ্রু। কেন, তা বুঝি সে নিজেও জানে না।

ছদিন পরে এক অপরাহ্ণে চাকন ছর্গে আসে তন্নজী মালশ্রী।

সংবাদ শুভ। জানায় মালশ্রী।
বাদশাহী পুত্রী কুশলে আছেন তো?
হ্যাঁ প্রভু। তবে…
বল মালশ্রী।
তিনি বড় উতলা হয়ে পড়েছেন। পরিচারিকাদের সব সময় প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত করে তুলছেন।
কেন?
আপনার পরিচয় জানতে চান।
পরিচয় জানানো হয় নি তো?
না প্রভু। আজ তিন দিন দুর্গে কোন পুরুষের দর্শন তিনি পান নি। আপনার নির্দেশ মতো কোন সেনানী দ্বিতলে আজ তিন দিন ওঠে নি।
উত্তম। একটু চিন্তা করেন শিবাজী। বলেন, মাদুরার কোন সংবাদ জানতে পেরেছ?
না প্রভু।
এখন গিয়ে বিশ্রাম নাও।
তন্বঙ্গী মালশ্রী চলে যায়।
ধীরে ধীরে দুর্গ শীর্ষে ওঠেন শিবাজী।
আকাশে গোধূলির আবীর মাখান। আসন্ন সন্ধ্যার মৃদু নূপুর ধ্বনি বাতাসে। দিকচক্রবালে বিদায়ী সূর্যের রক্তিমচ্ছটা। রাত্রির কালো ছায়া বুকে নিয়ে সন্ধ্যা আসছে নিঃশব্দ চরণে। আকাশ-মাটি-পৃথিবী হারিয়ে যাবে গভীর কালো অন্ধকারের আবর্তে। দুর্গ শীর্ষে দাঁড়িয়ে বিদায়ী সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন শিবাজী। অজস্র চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে মন। ভবিষ্যৎ দুঃশ্চিন্তায় বারবার কেঁপে ওঠে অন্তরটা।
যে পথে তিনি এগিয়ে চলেছেন এই কি সত্য পথ? এই পথে এগিয়ে গেলে দেশ জাতি ধর্মের শৃঙ্খল মোচন কি সার্থক হবে? মারাঠার জীবনে অনেক আশা, অনেক রোশনাইয়ের সন্ধান মিলবে কি? সুখ, স্বপ্ন, হাসি আনন্দে ভরে উঠবে কি মারাঠার জীবন? যবনের অত্যাচারের কশাঘাত থেকে রক্ষা পাবে কি হিন্দু ধর্ম?

প্রভু ?

চিন্তাজাল ছিন্ন হয়। ফিরে তাকান শিবাজী। দুর্গের কেল্লাদার।

কি চাও ?

একটি নারী আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থিনী।

নারী ! আশ্চর্য হন শিবাজী।

হ্যাঁ প্রভু। যবনী।

যবনী ! বিস্মিত হন শিবাজী।

হ্যাঁ প্রভু।

চল।

ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসেন শিবাজী। কেল্লাদারের সঙ্গে উপস্থিত হন তার কুঠিতে। সাক্ষাৎ প্রার্থীনিকে শিবাজীর পরিচয় দেয় কেল্লাদার। শিবাজীকে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে নারী।

কে তুমি নারী ? জিজ্ঞাসা করেন শিবাজী।

বিদেশিনী।

আমার কাছে কি চাও ?

প্রয়োজন গোপনীয়।

ইঙ্গিতে কেল্লাদারকে স্থান পরিত্যাগ করতে বলেন শিবাজী। কেল্লাদার চলে যেতে বলেন, এবার বল।

নির্ভয়ে বলব ?

শিবাজীর কাছে নারীর কোন ভয়ের কারণ নেই। তোমার বক্তব্য তুমি নির্ভয়ে বলতে পার।

জানি। তবু মনের দ্বিধা যায় না।

এ দ্বিধা কেন ?

চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি বলে।

কি প্রমাণ পেয়েছ ?

আপনি নিজেও তা জানেন।

স্মরণ হচ্ছে না আমার।

ধন্য আপনার স্মরণশক্তি। মাত্র তিন দিনে ভুলে গেলেন এতবড়

ঘটনার কথা ?
চমকে ওঠেন শিবাজী। বোরখাবৃতা নারীর চোখ দুটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান শিবাজী।
কি বলতে চাও তুমি ?
যে কথা মনে পড়তে চমকে উঠলেন আপনি আমি তাই বলতে চাই।
তুমি কে ?
বিদেশিনী।
মিথ্যে কথা। নিশ্চয় তুমি সব জান।
জানি। কারণ...
কি ?
আমি শাহাজাদী মেহেরুন্নিসার বাঁদী।
কি চাও তুমি আমার কাছে ? তীক্ষ্ণ শোনায় শিবাজীর কণ্ঠ।
জবাব।
কিসের ?
শুনেছিলুম মারাঠা বীর শিবাজী পার্বতীয় দস্যু কিন্তু মনুষ্যত্বহীন নন। নারী, শিশু ও বৃদ্ধের ওপর অত্যাচার করেন না। অকারণ রক্তক্ষয়কে তিনি ঘৃণা করেন। সেদিন সেকথা শুনে বিশ্বাস করেছিলুম। বাদশাহ আওরঙজেবের থেকেও তাঁকে বড় আসনে বসিয়েছিলুম মনে মনে, কিন্তু সে বিশ্বাস আমার চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। যা শুনেছিলুম তা মিথ্যা—ভুল। যা দেখলুম সত্য। মারাঠা বীর শিবাজী অনুচর দিয়ে পথ ভুলিয়ে নিয়ে এসে নারী হরণ করেন। বোরখা পরিবৃতা নারীর দিকে চেয়ে কথাগুলো শোনেন শিবাজী। আশ্চর্য হন। মনে দুরন্ত কৌতূহল জাগে। এ বাঁদী না অন্য কেউ ? সামান্যা বাঁদী এত তেজ এত ক্ষমতা পেল কোথা থেকে। যে শিবাজীর নামে বাদশাহ আওরঙজেব ভয় পান তাঁর কন্যার বাঁদী একথা শিবাজীর সামনে দাঁড়িয়ে বলবার সাহস পেল কোথা থেকে ?
নারী। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকেন শিবাজী।
বলুন।

আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেবে?

সাধ্যাতীত না হলে দেব।

তুমি শাহাজাদীর সঙ্গে ছিলে?

ছিলাম।

শাহাজাদীকে কি ভাবে হরণ করা হয়েছে দেখেছ?

দেখেছি।

সৈন্যরা এখন কোথায় জান?

জানি না।

জানা উচিত ছিল।

আপনার কাছে থাকলেও আমার কাছে নেই। তাছাড়া আমি পালিয়েছিলাম।

পালিয়েছিলে?

হ্যাঁ। বাঁদীর জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিলুম তাই সে সুযোগের অপব্যবহার করি নি।

আজ আমার কাছে এসেছ কেন? আর আমি এখানে আছি এ সংবাদ জানলে কেমন করে?

আপনি এখানে আছেন এ সংবাদ আমি জানতাম না। পথিকদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলুম এ দুর্গ আপনার। যদি এখানে আশ্রয় পাই কালে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এই আশায় এখানে এসেছিলুম।

কি উদ্দেশে আমার কাছে এসেছো তাতো জানালে না?

সে কথা আগেই বলেছি।

কিন্তু তা তো সত্য নয় নারী।

সত্য নয়?

না।

কি সত্য তবে?

সত্য তুমি নিজে।

আমি নিজে!

হ্যাঁ।

সাহিরা কোন উত্তর দিতে পারে না। শিবাজী যে কত চতুর বুঝতে পারে সে। পলাতকা বাঁদী যদি কোন বাদশাহী সৈন্যের নজরে পড়ে সেই ভয়ে যে সে শিবাজীর আশ্রয়ে নিরাপদ হতে চায় তা বুঝতে পেরেছেন শিবাজী।

নারী। ডাকেন শিবাজী।

বলুন!

তোমার আজকের পরিচয়ের মাঝে যে গভীর বেদনা লুকিয়ে আছে তা আমি বুঝেছি। তুমি শাহাজাদীর বাঁদী হলেও যে তুমি সামান্যা নারী নও এ পরিচয় তুমি আমার কাছে লুকোতে পার নি। তবু তোমার আগের প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি। শাহাজাদীকে আমি রাজনীতির প্রয়োজনে হরণ করেছি সত্য কিন্তু কোন ক্লেশ শাহাজাদীকে বরণ করতে হবে না। আমার কাজ শেষ হলে সসম্মানে দিল্লীতে পৌঁছে দেবার কর্তব্য আমার।

এবারেও কোন কথা বলে না সাহিরা। মাথা নত করে বসে থাকে।

নারী।

বলুন। মাথা তোলে সাহিরা।

আর কিছু জানতে চাও?

না।

তুমি কোথায় যাবে?

দিল্লী।

হারেমে?

না।

তবে?

কোথায় থাকবো তা জানি না।

তবে দিল্লী যেতে চাও কেন?

প্রয়োজন আছে।

কিন্তু থাকবে কোথায়?

দিল্লীতে স্থানের অভাব হবে না আমার। ইচ্ছে আছে যদি তেমন সময় সুযোগ আসে নতুন পরিচয়ে পরিচিত হব।

কি সে পরিচয় ?

কথা বলে না সাহিরা। ধীরে ধীরে বোরখার অবগুণ্ঠন সরায় মুখ থেকে। সাহিরার মুখের পানে তাকিয়ে চমকে ওঠেন শিবাজী। রূপ নয় যেন আগুনের জ্বলন্ত শিখা।

কিন্তু···

বলুন।

ও যে ঘৃণ্য পথ।

ওই পথই আজ আমার একমাত্র কাম্য। ওই ঘৃণ্য পথ ধরেই ধীরে ধীরে তলিয়ে যাব আমি। শেষ হয়ে যাব। আর···

আগুন জ্বলে ওঠে সাহিরার দুই নয়নে।

নারী।

বলুন।

যদি তোমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় আমাকে অসঙ্কোচে জানিও।

প্রতিদানের বিনিময়ে ?

প্রতিদান ! না নারী, শিবাজী এক্ষেত্রে প্রতিদান প্রত্যাশী নয়। তবে যে পথ তুমি গ্রহণ করবে স্থির করেছ তাতে আমার সমর্থন নেই।

সাহায্য আমি চাই। সাহায্যের আশাতেই আমি ছুটে এসেছি আপনার কাছে। দয়া করে দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে দিন আমাকে।

তাই হবে। আমার বিশ্বস্ত অনুচর তোমাকে দিল্লী পৌঁছে দেবে। আজ তুমি বিশ্রাম নাও।

সাহিরার থাকবার ব্যবস্থা করে বিদায় নেন শিবাজী।

পরদিন তখনও আকাশের বুক থেকে আলো ছায়ার মায়া কাটে নি। ম্লান অস্পষ্ট ছায়া ছায়া অন্ধকারটা তখনও আকাশের কোলে লেগে আছে। পাখীদের কলরব সবে মাত্র সুরু হয়েছে। উষার রক্তরাঙা

স্পর্শে ঘুম ভাঙছে পাহাড়গুলির।
মাতা ও পুত্রের কাছে বিদায় নেন শিবাজী। অশ্রু সজল চোখে পুত্রকে আশীর্বাদ করে বিদায় দেন বৃদ্ধা জীজা।
পুত্র বলে, আবার কবে আসবেন পিতা?
পুত্রকে কাছে টেনে নেন শিবাজী। পুত্রের শির চুম্বন করে বলেন, আসব পুত্র।
মাতা ও পুত্রের কাছে বিদায় নিয়ে অশ্বারোহণে যাত্রা করেন শিবাজী। সঙ্গে ছদ্মবেশে তন্নজী মালশ্রী আর বোরখা আবৃতা সাহিরা।
মালশ্রী।
আদেশ করুন প্রভু।
সাবধানে থাকবে। কাজ শেষ হলে শীঘ্র ফিরে আসবে।
তাই হবে প্রভু।
ধীরে ধীরে চলেন তিনজন। কারো মুখে কথা নেই। তিনজনেই নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন। একটি পথের বাঁকে গিয়ে দাঁড়ান তিনজন। এখান থেকে ভিন্ন পথে যাত্রা সুরু হবে তাদের। আকাশের সূর্যটা তখন অনেকখানি উপরে উঠেছে।
সাহিরা। ডাকেন শিবাজী।
বলুন।
এখনও তোমার এ সংকল্প ত্যাগের সময় আছে।
উত্তর দেয় না সাহিরা। মাথা নত করে থাকে।
ভেবে দেখ তুমি, তোমার অজ্ঞানতার জন্যে তুমি নিজের কি সর্বনাশ করতে চলেছ।
আমি জানি। তবু তুমি সেই ভুল করতে চলেছ। আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমার সমস্ত ভার নিচ্ছি। তোমার বাকী জীবন যাতে সুন্দর ভাবে কাটে তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
কিন্তু…
বল সাহিরা।
আমি আপনাকে বিশ্বাস করি কিন্তু আপনার অনুরোধ আজ আমার

পক্ষে রাখা সম্ভব নয়।

ওঃ। একটু চুপ করে থাকেন শিবাজী। মৃদু কণ্ঠে বলেন, তোমাকে আর আমি বাধা দেব না। কিন্তু কার জন্যে তুমি ওই জ্বলন্ত নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিতে চলেছ ?

চুপ করে থাকে সাহিরা।

সাহিরা।

আমাকে ক্ষমা করবেন, তার নাম প্রকাশ করতে আমি পারব না। শুধু জেনে রাখুন, আমার এই অবস্থার জন্যে দায়ী সে।

কথা বলেন না শিবাজী।

মালশ্রী আর সাহিরা বিদায় নেয়।

ওদের দুজনের অশ্ব দুটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওদের যাত্রাপথের পানে তাকিয়ে থাকেন শিবাজী।

সাহিরার জন্যে ভরে যায় মনটা।

॥ চার ॥

মাদুরা।

দিল্লীশ্বর আওরঙজেব নিজ শিবিরে একাকী বসে ছিলেন। ভ্রূকুটি কুটিল মুখমণ্ডল প্রশান্ত। সংবাদ এসেছে আগামী কালই মেহেরুন্নিসা মাদুরা এসে পৌঁছাবে। প্রিয় কন্যার দর্শনের জন্যে বাদশাহ আজ মনে প্রাণে সত্যই ব্যাকুল।

কন্যার থাকবার জন্যে পৃথক শিবির তৈরী হয়েছে। দিল্লী হারেমে মেহেরুন্নিসার প্রিয় সকল বস্তুই আনিয়েছেন বাদশাহ। মেহেরুন্নিসা যাতে কোন জিনিসের অভাব অনুভব না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।

মেহেরুন্নিসার সঙ্গে এখন কিছুদিন তিনি মাদুরাতেই কাটাবেন। পরে

কন্যাকে দিল্লী পাঠিয়ে দিয়ে রাজস্থান অভিমুখে যাত্রা করবেন তিনি। হয়তো এই সময়ের মধ্যে মেহেরুন্নিসার চরিত্রের কিছু পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে। বাইরের জগৎকে দেখে চিনে হয়তো শুধু মাত্র মনের ক্ষুধায় লালায়িত হতে ভবিষ্যতে কুণ্ঠিত হবে মেহেরুন্নিসা। হয়তো বাইরের এই আলো বাতাস ভরা পরিবেশের মাঝে থাকাকালীন পূর্বকৃত অসংযমের প্রতি ঘৃণার ভাব আসতে পারে মনে।
না কন্যার দোষ তিনি বড় করে দেখেন না। কারণ যে পরিবেশের মাঝে মেহেরুন্নিসা বাল্য কৈশোর কাটিয়েছে সূর্যালোকহীন হলেও অসংযম ব্যাভিচার ছাড়া কিছু নেই সেখানে। গোপনে যৌবনকে উপভোগ করার উপায় সেখানে যত্রতত্র।
জানেন আওরঙজেব। দেখেছেন কিছু কিছু। মনে হয়েছে এ অন্যায় এ পাপ। এর শেষ হোক। দোষ অন্তঃপুরবাসিনীদের সত্য কিন্তু দুষ্ট মদনের জ্বালা সহ্য করা সম্ভব নয়। তৈমুর বংশের কোন কন্যাই বুঝি পারেন নি অনেক আশার স্বপ্নকে স্বার্থক রূপ দিতে। তাই বাধ্য হয়ে তারা সুরা আর গোপন ব্যাভিচারে লিপ্ত থেকেছে দিনের পর দিন।
জাহানারা, রোশেনারা, জেবউন্নিসা, মেহেরুন্নিসা। বোন, কন্যা কেউ বাদ যায় নি। শিক্ষিতা বিদুষী মোগল কন্যারা কেউ রোধ করতে পারেন নি তাদের মনের দুর্বলতা। নিজে বাদশাহ হয়ে গোপনে অনেক চেষ্টা করেছেন আওরঙজেব। ব্যর্থ হয়েছেন বারবার। সংবাদ পেয়েছেন দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে ব্যাভিচারের বন্যা।
কঠোর হাতে এই ব্যাভিচার দমন করবার চেষ্টা করেছেন। প্রধানা বেগম দিলরাশবানুর মৃত্যুর পর প্রিয়তমা কন্যা জেবউন্নিসাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন দৌলতাবাদে প্রিয় পার্শ্বচর বন্ধু আকিল খাঁর কাছে। দৌলতাবাদ দুর্গে জেব এখন পড়াশুনা নিয়ে থাকে।
ভেবেছিলেন একের পর এক সমস্ত বন্ধ করবেন কিন্তু চারিদিক থেকে অশান্তির আগুন তাঁকে গ্রাস করতে ছুটে এসেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন যোধপুর রাজ যশবন্ত সিংহ। বিদ্রোহী হয়েছে নিজপুত্র

মহম্মদ। শিবাজীর চাতুরি দিনের পর দিন দুঃসাহসিকভাবে বেড়ে চলেছে। রাজনীতির গোলকধাঁধায় আজ তিনি বিভ্রান্ত। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে একের পর এক উপায় উদ্ভাবন করেছেন। আদেশ দিয়েছেন প্রতিটি বিষয়ে। কারো কথা শোনেন নি। কারো মতামত জানতে চান নি। নিজের কূট বুদ্ধিতে যা মনে হয়েছে তাই করেছেন। বিশ্বাস করেন নি কাউকে।

সব বিশ্বাসঘাতক বেইমানের দল। পুত্র-স্ত্রী সব। বিশ্বাস করে সুখে নিদ্রা গেলে বুকে ছুরি বিঁধতে বেশি দেরী হবে না।

তাইতো দেখছেন তিনি। পিতা বিশ্বাস করেছিলেন। পিতার বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি রেখেছেন। ভাইদের শেষ করেছেন নির্মম ভাবে।

পিতামহ বিশ্বাস করেছিলেন পিতাকে। পিতামহের বিশ্বাসের মর্যাদা পিতাও রেখেছিলেন। তাঁর মতে শুধু ভাই নয়, ভাই বন্ধু আত্মীয় যাকে মসনদের দাবীদার মনে হয়েছে তাকেই তিনি হত্যা করেছিলেন নিষ্ঠুরভাবে।

দোষ তাঁর নয়। দোষ পিতার নয়। দোষ দিল্লীর মসনদের। যার জন্যে পুত্র পিতাকে নির্যাতন করতে কুণ্ঠিত হয় না। ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি মারে।

ওই মসনদের জন্যে।

না কোন অন্যায় তিনি করেন নি। অথর্ব পঙ্গু বৃদ্ধের হাত থেকে রাজদণ্ডটুকু তুলে নিয়েছেন। কাফের দারার হাত থেকে রক্ষা করেছেন ধর্মকে। বুদ্ধির পরীক্ষায় জয়ী হয়েছেন তিনি। ভাইয়েদের বুকে ছুরি মারতে হয়েছে। প্রয়োজন হয়েছিল তাই মেরেছিলেন। যদি প্রয়োজন হয় পুত্রদের বুকেও ছুরি বসাতে কুণ্ঠিত হবেন না তিনি।

মহম্মদকে বন্দী করে রেখেছেন গোয়ালিয়র দুর্গে। যদি প্রয়োজন হয় আকবর, মুয়াজ্জম্, কামব্‌কস সব পুত্রদেরই তিনি বন্দী করতে দ্বিধা করবেন না। তবে তাঁর মৃত্যুর পর বুদ্ধির খেলায় যে জয়ী হবে

সেই বসবে দিল্লীর মসনদে। মহম্মদের মতো অন্য পুত্ররাও যদি মূর্খের মতো কাজ করে তার ফল তাদেরই ভোগ করতে হবে।
আওরঙজেবের কাছে শত্রু শত্রুই। ভাই বন্ধু পিতা পুত্রের স্থান সেখানে নেই। নেই মায়া-মমতা-দয়া-দাক্ষিণ্য।
মনে তাঁর ভোগ বিলাসের আকাঙ্খা কোনদিন জাগে নি। পূর্বে যেমন দিন কাটতো তাঁর আজও তেমনি কাটে। ভাবলে হাসি পায় তাঁর। দীন তুনিয়ার মালিক তিনি। বাদশাহ আলমগীর তিনি। সারা হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। তবে তিনি এমন দীন ভাবে জীবন কাটাবেন কেন? ঐশ্বর্য আর বিলাসের মাঝে থেকেও তিনি কেন দূরে সরে থাকবেন?
খোদার সতর্ক বাণী শোনেন তিনি! খোদা তাঁকে পূর্বপথেই চলার নির্দেশ দেন।
বাদশাহ আলমগীর সুখ ঐশ্বর্যের স্রোতে মগ্ন হতে পারেন না। আর তাই তিনি অন্যের জীবনে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন না। হারেমের সমস্ত সংবাদ শুনেও কঠিন হাতে দমন করতে পারেন না হারেমবাসীনিদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা। যার কর্ম সেই করুক। শুধু দেখেন সীমা অতিক্রম করছে কিনা।
তাই আপন কন্যা মেহেরুন্নিসার সমস্ত সংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।
মাত্র এই অল্প বয়সে তাঁরই প্রিয়তমা কন্যা সুরা আর বিলাসের স্রোতে মগ্ন হয়েছে। কন্যা তাঁর সুন্দরী নয় কিন্তু কমনীয় দেহ সৌষ্ঠবে মৃত্যুমুখী পতঙ্গের মতো গোপনে সূর্যালোকহীন হারেমে অজস্র রক্ষীর মধ্যে দিয়েও পুরুষদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসছে। কিভাবে যে এই অসম্ভব ব্যাপার সঙ্ঘটিত হচ্ছে তিনি জানেন না। আর তারই ফলে হারেমের অন্যান্য কুমারী কন্যাদের হিংসার পাত্রী হয়ে উঠেছে।
নিজ ভগিনী রোশেনারার কোপে পড়েছে মেহেরুন্নিসা। পড়েছিল একদিন জেবুন্নিসাও। প্রতিহিংসার আগুন বুকে নিয়ে রোশেনারা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায় মেহেরুন্নিসার আশেপাশে। যে কোন

অসতর্ক মুহূর্তে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে কন্যার উপরে। সংবাদ শুনে গর্জে উঠেছিলেন আওরঙজেব। ইচ্ছে করেছিল অন্তঃপুরের প্রতিটি নারীকে বেত্রাঘাতে জর্জরিতা করে সারা জীবনের মতো বন্দিনী করে রাখেন অন্ধকূপ মাঝে।

অতিকষ্টে ক্রোধ দমন করেছিলেন তিনি। বসে বসে চিন্তা করেছিলেন। শেষে স্থির করেছিলেন নিজের কাছে কন্যাকে কিছুদিন নিয়ে এসে রাখবেন। বাইরের মুক্ত আবহাওয়ার মাঝে এসে কিছুদিন কাটালে হয়তো কন্যার মানসিক পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে।

আবার ভেবেছিলেন কন্যা হয়তো দিল্লী ছেড়ে আসতে চাইবে না। অজুহাত দেখিয়ে হারেমেই থাকতে চাইবে। তা যদি করতো তাহলে কন্যা বলে ক্ষমা করতেন না তিনি।, তার অবাধ্যতার যোগ্য শাস্তি তিনি দিতেন।

তা করে নি মেহেরুন্নিসা। পিতার পত্র পেয়েই যাত্রা করেছে সাক্ষাৎ উদ্দেশে। সংবাদ পেয়েছিলেন আওরঙজেব।

কন্যার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বাদশাহ। সুচতুরা কন্যা নিশ্চয় সমস্ত বুঝতে পেরেছে তাই পিতার আহ্বানে সাড়া দিতে বিলম্ব করে নি। নাহলে কোন বিলাসিনী নারীর পক্ষে সম্ভব নয় সব কিছু ত্যাগ করে দূর দুর্গমে পাড়ি দেওয়া।

এ চিন্তা হয়তো তাঁর ভুলও হতে পারে। ভেবেছেন বাদশাহ। জ্যেষ্ঠা কন্যা জেবুন্নিসার মতো মেহেরুন্নিসাও তাঁকে সত্যই ভালবাসে। আওরঙজেব বাতায়ন পথে আকাশের দিকে তাকান। এখন মধ্যাহ্ন। আকাশের গায়ে একখণ্ড জ্বলন্ত সূর্য। উষ্ণ বাতাসের গতি মৃদু।

এই কোন্ হ্যায় ?

হাঁকেন বাদশাহ। ভৃত্য কুর্নিশ করে এসে দাঁড়ায়।

গোলাম খাঁ কাঁহা ? জিজ্ঞাসা করেন আওরঙজেব।

গাছতলায় বসে আছে জাঁহাপনা। উত্তর দেয় ভৃত্য।

গাছতলায়! আশ্চর্য হন বাদশাহ।

হ্যাঁ জাঁহাপনা।

কেন ?

তাতো বলতে পারবো না জাঁহাপনা।

কি পারো তাহলে ? বিরক্ত হন বাদশাহ।

জিজ্ঞাসা করে আসবো ?

না থাক।

নত শিরে দাঁড়িয়ে থাকে ভৃত্য।

শোন। বলেন বাদশাহ।

আদেশ করুন জাঁহাপনা।

গোলাম খাঁকে পাঠিয়ে দাও।

ভৃত্য কুর্নিশ করে চলে যায়।

বসে থাকেন আওরঙজেব। চতুর রসিক বৃদ্ধ গোলামখাঁকে একটু বুঝি স্নেহ করেন আওরঙজেব। বাল্যকাল থেকে গোলামখাঁকে দেখে আসছেন তিনি। দেখে এসেছেন পিতার পাশে পাশে। লোকটা কবি। একটু পাগলাটে ধরণের। কি করে আর কি বলে সব সময় নিজেও বুঝি বুঝতে পারে না।

আমাকে এগুলো পাঠিয়েছেন হুজুর ? বলতে বলতে ভিতরে প্রবেশ করেন বৃদ্ধ গোলাম খাঁ।

হাঁ। বস।

বসব না হুজুর।

কেন ?

এতক্ষণ বসে ছিলুম হুজুর।

কোথায় ?

গাছতলায় হুজুর।

কেন তোমার জন্যে নির্দিষ্ট কোন স্থানে নেই ?

আছে হুজুর। গাছ তলায় বসে একটা পাখীর বাসা দেখছিলুম হুজুর। আর……

আরো আছে !

আছে হুজুর। চারটে পাখীর ছানা।

আর কিছু নেই ?

আরো আছে। একটা সাপ।

পাখীর বাচ্চা আর সাপ কি এক সঙ্গে খেলা করছিল ?

না হুজুর। সাপটা বিষধর গোখুরা।

তারপর ?

গাছের নীচে বসে আছি। দেখি একটি সাপ নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে পাখীর বাসার দিকে। একটু একটু করে। বাসা থেকে মাত্র হাত খানেক তফাৎ। এমন সময়······

কি হল ?

একটি বাচ্চা বাসা থেকে বেরিয়ে এল হুজুর। গিয়ে বসল বাসার পাশের ডালে। সাপ তেড়ে গেল তাকে লক্ষ্য করে। এই ফাঁকে অন্য বাচ্চা তিনটি বেরিয়ে এল। কিন্তু প্রথম বেরিয়ে আসা বাচ্চাটা সাপের মুখের কাছে। আর বুঝি রক্ষে নেই।

চুপ করে গোলাম খাঁ।

তারপর কি হল ? জিজ্ঞাসা করেন বাদশাহ।

আমি দেখি নি হুজুর।

দেখ নি ?

না চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলুম।

প্রথম বাচ্চাটি তাহলে সাপের মুখে গেল ?

না হুজুর।

তবে ?

সাপটি পপাত ধরণী তলে।

কি করে ?

বোধহয় অন্য বাচ্চা তিনটি সাপের ল্যাজে কাঠি দিয়েছিল। সাপ রেগে পেছনে মারলে ছোবল, আর সঙ্গে সঙ্গে ধরণীতে এসে পড়ল। অবশ্য এটা আমার অনুমান।

ধন্য তোমার অনুমান শক্তি গোলাম খাঁ। বাদশাহের মুখে মৃদু হাসি। তারপর কি হল ?

তারপরের দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি হুজুর। আপনার ডাক শুনে ছুটে এসেছি এখানে।

এ থেকে কি বুঝলে তুমি?

আবার মৃদু মৃদু হাসেন তিনি। এ তাঁর প্রসন্ন মনের প্রতিচ্ছবি।

কিছুই বুঝি নি হুজুর।

কিছুই বোঝ নি?

না হুজুর। আমি শুধু চোখ দিয়ে দেখেছি কিছু চিন্তা করি নি।

ধন্য তুমি গোলাম খাঁ। আজ প্রথম জানলুম তোমার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে।

সত্য হুজুর। আগে এক সঙ্গে কাজ করতো। কিন্তু দিন দিন দেখছি লোপ পাচ্ছে সে শক্তি। চেষ্টাও তাই আজকাল করি না, কিন্তু দেখে বোঝবার জো নেই। এখন শুধু চোখ দিয়ে দেখে যাই।

বাদশাহের মুখ মুহূর্তে রক্তবর্ণ ধারণ করে। কথা বলেন না তিনি।

প্রহরী এসে সেলাম করে দাঁড়ায়।

কি চাও?

সেনাপতি নাজির খাঁ আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

শাহ্জাদী এসেছেন? আগ্রহ প্রকাশ পায় বাদশাহের কণ্ঠে।

না জাঁহাপনা।

কোন শিবিকা আসে নি?

না জাঁহাপনা!

কেন? গর্জে ওঠেন বাদশাহ আলমগীর।

জাঁহাপনা।

নিয়ে এস তাকে।

মুহূর্তে কঠিন আকার ধারণ করে আওরঙজেবের মুখমণ্ডল। কুটিল আবর্ত রচনা করে চোখের শাণিত দৃষ্টি। ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করে চোখ মুখ।

ধীরে ধীরে মাথা নত করে প্রবেশ করেন বৃদ্ধ নাজির খাঁ। বাদশাহকে কুর্নিশ করে নতমুখে দাঁড়ান।

নাজির খাঁ।   বজ্রকণ্ঠে ডাকেন বাদশাহ।

কেঁপে ওঠেন নাজির খাঁ।   ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দেন।

জাঁহাপনা।

শাহাজাদী দিল্লী থেকে আসে নি ?

এসেছিলেন জাঁহাপনা।

কোথায় ?

কথা বলতে পারেন না নাজির খাঁ। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

উত্তর দাও।

তবুও কোন উত্তর দিতে পারেন না নাজির খাঁ।

নাজির খাঁ।

জাঁহাপনা।

শাহাজাদী কোথায় এখন ?

জানি না জাঁহাপনা।

জান না !

না জাঁহাপনা।

মিথ্যে কথা।

সত্য জাঁহাপনা।

তবে কোথায় শাহাজাদী ?

তাঁকে......

বল কি হয়েছে তাঁর ?

তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

হরণ করেছে !

হ্যাঁ জাঁহাপনা।

কে সে ?

বাদশাহের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কেঁপে ওঠে সমস্ত শিবির।   সৈন্য সেনাপতি পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে শঙ্কাভরা দৃষ্টিতে তাকায়। অজানিত আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে সকলে।

কে সে দস্যু ! যে আলমগীর কন্যাকে হরণ করেছে। তার কি প্রাণে

এতটুকু ভয় নেই? সে কি জানে না কাকে হরণ করেছে! কি মূল্য তাকে দিতে হবে?

কে সে? আবার গর্জে ওঠেন আওরঙজেব।

শিবাজী।

সামনে বজ্রপাত হলেও বুঝি এতটা চমকে উঠতেন না আওরঙজেব। শিবাজীর নামোচ্চারণে স্তব্ধ হয়ে যান তিনি।

মারাঠা দস্যু। দাঁতে দাঁত ঘসেন আওরঙজেব। দুরন্ত ক্রোধে থর থর করে কেঁপে ওঠে সমস্ত শরীর।

হ্যাঁ জাঁহাপনা। শিবাজী হিন্দু বাহকদের ষড়যন্ত্রে শাহাজাদী আর তাঁর প্রিয় বাঁদীকে হরণ করেছে।

তোমরা কি ঘুমিয়ে ছিলে?

বাধা দিয়েছিলুম জাঁহাপনা। কিন্তু অপরিচিত পার্বত্য পথে কোথায় যে······

মিথ্যে কথা। গর্জে ওঠেন আওরঙজেব।

সত্য জাঁহাপনা।

তার প্রমাণ?

আমাকে দেখুন জাঁহাপনা। শুধু আমি নই আমার প্রতিটি সৈন্যই আহত। শিবাজীর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত তারা।

দেখেন আওরঙজেব। সেনাপতি নাজির খাঁর সমস্ত দেহ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত। ক্ষত কোথাও শুকিয়েছে কোথাও বা পচে ঘায়ের সৃষ্টি করেছে।

সহসা কি করবেন স্থির করতে পারেন না। অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়ান।

ভয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন নাজির খাঁ। নিজের অযোগ্যতার দোষারোপ হিন্দু শিবিকা বাহকদের ওপর চাপিয়ে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করে নিজের এবং সৈন্যদের শরীর অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করেছেন নাজির খাঁ। কিন্তু ধূর্ত আওরঙজেব কি বিশ্বাস করে তাকে মুক্তি দেবেন মৃত্যুর হাত থেকে?

মৃত্যুকে তিনি ভয় পান না। বহুবার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শাহজাদা আওরঙজেবের জন্যে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর নিপুন অসি চালনার কাছে মৃত্যু এগুতে পারে নি। খুশী হয়েছেন আওরঙজেব। জীবনে তিনি তাঁকে পুরস্কারও কম দেন নি।

কিন্তু আজ?

অস্থির হয়ে ওঠেন নাজির খাঁ। বাদশাহ অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কখনও বা কয়েক পদ গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। মুষ্ঠিবদ্ধ হচ্ছে দুই হাত। সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠছে অস্থিরভাবে। বিচিত্রভাব ধারণ করছে মুখমণ্ডল।

একসময় স্থির হয়ে দাঁড়ান আওরঙজেব।

নাজির খাঁ।

জাঁহাপনা। ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দেন বৃদ্ধ নাজির খাঁ।

বেইমান বাহকদল কোথায়?

তাদের বেঁধে নিয়ে এসেছি জাঁহাপনা।

নিয়ে এস এখানে।

বাদশাহের আদেশে বাহকদের নিয়ে আসা হয়।

স্থির অন্তর্ভেদি দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বাহকদের দিকে তাকিয়ে থাকেন বাদশাহ। ধীরে ধীরে কঠিন আকার ধারণ করে মুখ।

বাহকরা সকলেই পাহাড়ী উপজাতি। বলিষ্ঠ চেহারা। সরল মুখ। কদিনের অনাহার অত্যাচারে শরীর জর্জরিত।

কে তোরা?

কেউ কোন কথা বলে না। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। সাহস পায় না কেউ কোন কথা বলতে। কারণ কথা বলার অর্থ যে প্রহার সেটুকু তারা দুদিনে বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছে।

কে তোরা? অসহ্য রাগে চিৎকার করে ওঠেন বাদশাহ।

হুজুর। ভয়ে ভয়ে একজন সাড়া দেয়।

কে তুই?

আমি সর্দার, হুজুর।

আমার মেয়ে কোথা ?
জানি না হুজুর।
জানিস না ?
সত্যি হুজুর। খেটে খাই আমরা। খেটে পয়সা কামাতে এসেছিলুম। কারা আমাদের কাছ থেকে ওদিন সন্ধে বেলা পাল্কী নিয়ে পালিয়ে গেল। আর······
চুপ কর পাজী বেইমানের বাচ্চা।
সর্দারের মুখে সজোরে লাথি মারেন বাদশাহ। মুখ ফেটে ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সর্দার।
কেউ কোন কথা বলে না। বলতে পারে না তারা। সর্দারের অত্যাচারে গায়ের রক্ত তাদের গরম হয়ে ওঠে। তবু তারা সর্দারের নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে। হাত পা বাঁধা তাদের। তারা অসহায়।
শিবাজী কে তোদের ?
কেউ কোন কথা বলে না।
শিবাজী কে তোদের ? জবাব দে।
জানি না হুজুর। উত্তর দেয় সর্দার।
আবার মিথ্যে কথা।
আবার লাথি মারেন। ক্ষ্যাপা নেকড়ের মতো চাবুক হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন সর্দারের ওপর। এক সময় সর্দারের দেহটা নিশ্চল হয়ে যায়। শ্রান্ত হয়ে বসেন বাদশাহ। আদেশ দেন সবকটাকে খতম করবার।
মৃত্যুদণ্ড শুনেও নীরবে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। শুধু ধক্ ধক্ করে জ্বলে ওঠে সবার চোখের মণি দুটো।
সৈন্যরা সকলকে টেনে বার করে। সর্দারের দেহটাকে ফেলে দেবার জন্যে নিয়ে যায়। মরে গেছে সর্দার।
নাজির খাঁ। একসময় ডাকেন বাদশাহ।
জাঁহাপনা।
তোমাদের সকলকে ওকাজের পুরস্কার আমি দেব।
জাঁহাপনা।

তোমার প্রতিটি সৈন্যের চল্লিশ ঘা বেত আর সাতদিন খাওয়া বন্ধ। আর তোমার······

থামেন বাদশাহ। নাজির খাঁ মুখের দিকে একবার তাকান। সে মুখ রক্তশূন্য।

নাজির খাঁ।

জাঁহাপনা।

কি পুরস্কার তুমি চাও। মৃত্যু না······

জাঁহাপনা। আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন বৃদ্ধ।

হ্যাঁ, মিথ্যা কথা বলেছ তুমি আমাকে। আমাকে তুমি ভুল বুঝিয়েছ।

ভুল বুঝিয়েছি ?

হ্যাঁ, ভুল বুঝিয়েছ। গর্জে ওঠেন আওরঙজেব। শিবাজী যখন শাহাজাদীকে হরণ করে বাধা তুমি দাও নি। বাধা দেবার সুযোগ সে তোমাদের দেয় নি।

জাঁহাপনা।

হ্যাঁ। কারণ তোমার থেকেও তার পরিচয় আমি ভালই জানি।

একথা সত্য ?

সত্য জাঁহাপনা।

কি শাস্তি তুমি চাও। মৃত্যু ?

আমাকে ক্ষমা করুন জাঁহাপনা।

ক্ষমা! কুটিল হাসিতে ভরে যায় বাদশাহের মুখ। অন্যায়ের কোন ক্ষমা আওরঙজেব জানে না। অপরাধীকে কোনদিন ক্ষমা করে নি আওরঙজেব। কি চাও তুমি ? তোমার সৈন্যদের মতো তিলে তিলে মৃত্যু না······

জাঁহাপনা।

চুপ। কাঁদলে আওরঙজেবের কাছে ক্ষমা মেলে না। হ্যাঁ, তোমার যোগ্য শাস্তি মৃত্যু।

নাজিরখাঁকে প্রহরী বার করে নিয়ে যায়।

ক্লান্তিতে চোখ বোজেন আওরঙজেব।

এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিলেন গোলাম খাঁ। কথা বলেন নি। নীরব দর্শক হয়ে দেখছিলেন বাদশাহ আলমগীরের অমানুষিক বিচার। দেখেছেন বাদশাহের মধ্যে স্বার্থপর শয়তানটাকে। যা মাত্র অল্পক্ষণ আগে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বাদশাহ আলমগীরকে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রূপে তিনি দেখেছেন; নিপুন অভিনেতা বাদশাহ। লোভী স্বার্থপর শয়তানী মূর্তিটাকে বিভিন্ন রূপের আড়ালে তিনি ঢেকে রাখেন।

সিংহাসন তাঁর শৃঙ্খল। রাজ্য ঐশ্বর্য কিছুই তিনি চান না। আজীবন তিনি মক্কার হাতছানি দেখেছেন। সব ছেড়ে তিনি আল্লার ডাকে সাড়া দিতে চান কিন্তু পারেন না। পারেন না এই জন্যে তিনি গেলে কে হাল ধরবে এ রাজ্যতরীর।

এই কথা বারবার শুনিয়েছেন তিনি। বাদশাহী ছেড়ে ফকিরীর আকর্ষণে সাড়া দিতে গেছেন।

পারেন নি। সবাই তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু গোলাম খাঁ বাদশাহকে বারবার তাঁর নিজরূপে দেখেছেন। হিংস্র, উলঙ্গ, স্বার্থপর। কঠিন, কঠোর, নির্মম। দয়া, মায়া, মমতাহীন। স্নেহ, ভালবাসাহীন।

আত্মজার হরণের অপরাধে নির্বিচারে হত্যা করলেন কতগুলি নিরপরাধী সরল মানুষকে। যারা বাদশাহ জানে না, শিবাজী জানে না। জানে না জগতের অনেক কিছুই। জানে শুধু পরিশ্রম করতে আর তাদের অনাড়ম্বর সরল জীবনকে।

বাদশাহ জানল না তাদের। শুনল না তাদের কথা। বুঝল না তাদেরও কিছু বলার আছে। আত্মজা হরণের অপরাধে নিজের পক্ষে বিচার করে, নির্বিচারে মৃত্যুদণ্ড দিল। আর অসহায় অবোধ মানুষগুলো তাদের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে মাথা পেতে নিল মৃত্যুদণ্ড। বাদশাহের অন্যায় বিচারেব প্রতিবাদে একটি কথাও বলল না। সবলের অত্যাচার দুর্বল মাথা পেতে নিয়ে নীরবে গিয়ে দাঁড়াল মৃত্যুর দ্বারে।

হঠাৎ মর্মভেদী তীক্ষ্ণ আর্তনাদে চোখ মেলেন বাদশাহ দেখেন গোলাম খাঁকে।

গোলাম খাঁ।

হুজুর।

ও কিসের শব্দ ?

মৃত্যু পথযাত্রীর আর্তনাদ হুজুর।

ওঃ।

আবার চোখ বোজেন আওরঙজেব।

হুজুর। মৃদুকণ্ঠে ডাকেন গোলাম খাঁ।

বল।

সুন্দর আপনার বিচার হুজুর।

গোলাম খাঁ। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন আওরঙজেব।

গোস্তাফী মাফ করবেন হুজুর।

তোমার অধিকারের সীমা তুমি ছাড়িয়ে যাচ্ছ গোলাম খাঁ। আমার সঙ্গ যদি তোমার ভাল না লাগে তুমি দিল্লী চলে যাও।

কসুর হয়েছে হুজুর।

মনে রেখ একথা।

মনে থাকবে হুজুর। আমি ভুলবো না।

কথা বলেন না আওরঙজেব।

বাইরে বেরিয়ে আসেন গোলাম খাঁ। এসে দাঁড়ান দুপুরের সেই গাছটির নীচে যেখানে দেখেছিলেন চারটি পক্ষীশাবক অদ্ভুত উপায়ে নিজেদের রক্ষা করেছিল। বিষধর গোখুরাকে ফেলে দিয়েছিল মাটিতে।

মারাঠা বীর শিবাজীও কি তবে……।

চমকে ওঠেন গোলাম খাঁ। একি ভাবছেন তিনি। যার অন্নে জীবন ধারণ করে আছেন তারই অমঙ্গল কামনা করছেন ?

কিন্তু অন্যায় যা……

না। ন্যায় অন্যায় কিছুই চিন্তা করবেন না তিনি। তিনি শুধু দেখে

যাবেন। কিন্তু পারেন না। বারবার ভিতরের ঘুমিয়ে পড়া মনুষ্যত্বটা মাথা তুলে জেগে উঠতে চায়।
একবার যদি ঘুমে অচেতন হয়ে যেত।
তাহলে ভালই হ'ত।
মনে মনে ভাবেন গোলাম খাঁ।

॥ পাঁচ ॥

শাহাজাদী মেহেরুন্নিসাকে নিয়ে শিবিকা বাহকরা অনেক দুর্গম পথ পার হয়ে একটি দুর্গের কাছে এসে শিবিকা নাবায়।
মেহেরুন্নিসা এতক্ষণ বিমূঢ় আড়ষ্ট ভাবে চোখ বুজে বসেছিল। শিবিকা বাহকদের দুর্গম পথে দ্রুত চলায় বারবার মনে হয়েছে এই বুঝি পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের গভীর খাদে গিয়ে পড়বে। মৃত্যু ভয়ে ভীতা মেহেরুন্নিসা বারবার আল্লাকে ডেকেছে বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।
বাহকরা শিবিকা নামাতে চেতনা ফিরে আসে। চোখ মেলে মেহেরুন্নিসা। অন্ধকার। জমাট বাঁধা কালো অন্ধকার চারিধারে। প্রেতের মতো আশে পাশে পর্বতের প্রাচীর। উপরের উন্মুক্ত আকাশও ভাল ভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। এমনই দুর্গম স্থান।
একজন মুখে বিচিত্র শব্দ করে। উত্তর আসে দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে।
একটু পরে উপর থেকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে একটি দোলা।
শাহাজাদী।
মেহেরুন্নিসার কাছে এসে দাঁড়ায় একব্যক্তি। বিনীত কণ্ঠে আহ্বান জানায়।
মেহেরুন্নিসা অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তার মুখের দিকে। কথা বলে না।

অনুগ্রহ করে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে আপনাকে।
কেন?
রাত্রে দুর্গ দ্বার খোলা নিষিদ্ধ তাই দোলায় চড়ে দুর্গে প্রবেশ করতে হবে।
না! দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় মেহেরুন্নিসা।
শাহাজাদী।
আমি দুর্গে প্রবেশ করবো না।
কিন্তু…
কে তোমরা, কেন আমাকে ধরে এনেছ?
চন্দ্ররাও কোন উত্তর দেয় না।
তোমাদের দলপতি কোথায়?
প্রভু স্থানান্তরে গেছেন।
কে সে?
এবারেও চন্দ্ররাও নিরুত্তর থাকে।
কি নাম তার?
নাম জানতে চাইবেন না শাহাজাদী।
কেন?
প্রভুর নিষেধ আছে!
ওঃ।
ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপে মেহেরুন্নিসা। সমস্ত মুখ রাগে অপমানে আরক্ত হয়ে ওঠে। ইচ্ছা করে এই মুহূর্তে সামনে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে পদাঘাতে তার এই অবাধ্যতার শাস্তি দেয়। দিল্লীর হারেম হলে তাই করতো মেহেরুন্নিসা। সেখানে অবাধ্য বাঁদীদের পদাঘাতে তাদের অবাধ্যতার শাস্তি দেয় মেহেরুন্নিসা।
কিন্তু এটা দিল্লীর হারেম নয়। মহারাষ্ট্রের দুর্গম পর্বতের মাঝে শত্রু হস্তে বন্দিনী মেহেরুন্নিসা। রাগ প্রকাশ করার কোন উপায়ই নেই। বেশি অবাধ্যতা করলে এই কঠিন হৃদয় দস্যুদের হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হবে।

কিন্তু কেন এই দস্যুরা তাকে ধরে এনেছে ? কি এদের উদ্দেশ্য ।
ভেবে কিছুই স্থির করতে পারে না মেহেরুন্নিসা।
এরা কি জানে না তার পরিচয় ? ভাবে মেহেরুন্নিসা। নিশ্চয় জানে যদি না জানতো তাহলে তাকে এভাবে ধরে নিয়ে আসতো না।
শাহাজাদী। মৃদুকণ্ঠে ডাকে চন্দ্ররাও।
বল।
রাত্রি অধিক হয়েছে।
তাতে কি ?
অনুগ্রহপূর্বক দুর্গে প্রবেশ করে বিশ্রাম করবেন চলুন।
যদি দুর্গে প্রবেশ না করি ?
দুর্গে যদি স্ব-ইচ্ছায় প্রবেশ না করেন তাহলে বলপূর্বক আপনাকে দুর্গে প্রবেশ করাতে বাধ্য করা যায়। কিন্তু তা আমরা করবো না কারণ আপনার যাতে কোনরূপ অসম্মান না হয় সে বিষয়ে প্রভুর নিষেধ আছে। আমি আবার অনুরোধ করছি আপনি দুর্গে প্রবেশ করুন।
বলতে বলতে কাছে এসে দাঁড়ান নিতাইজী। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান শাহাজাদীর দিকে।
সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না মেহেরুন্নিসা। সমস্ত মনের অসম্ভব জেদটা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যায়। চোখ নত করে।
শাহাজাদী।
বলুন।
আশা করি দুর্গে প্রবেশের অকারণ আপত্তি আপনি করবেন না। আপনি আমাদের বন্দিনী। বন্দিনীর প্রতি যে ব্যবহার করা হয় তা আমাদের কাম্য নয়। তাই অনুরোধ করছি স্ব-ইচ্ছায় আপনি দুর্গে প্রবেশ করুন।
কিন্তু…
বলুন।
কেন আমাকে এভাবে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে ?
সে কথা সময়ে জানতে পারবেন।

কে আপনারা ?

পরিচয় দেওয়ায় প্রভুর নিষেধ আছে। তবে যে-ই হই আমরা আপনার ক্লেশের কোন কারণ হবে না আমাদের আতিথেয়তা।

যথেষ্ট ক্লেশের কারণ হয় নি কি আপনাদের ব্যবহার ?

সত্য। কিন্তু এছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিল না। এর জন্য আপনি মার্জনা করবেন।

মেহেরুন্নিসা আর কথা বলে না। আগন্তুকের উপস্থিতি মেহেরুন্নিসার কণ্ঠস্বরকে যেন চেপে ধরেছে। অসহায় ভাবে নিয়তির বিধান মেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয় মেহেরুন্নিসা।

দুর্গে প্রবেশ করে মেহেরুন্নিসা অজ্ঞাত দস্যুর বন্দিনী হয়ে।

দুটি নারী এগিয়ে আসে। যথারীতি সম্মান জানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যায় দ্বিতলের একটি কক্ষে।

শাহাজাদী। ডাকে একজন !

বল।

আহারের ব্যবস্থা করি আপনার ?

না।

কিন্তু···

যাও বেরিয়ে যাও তোমরা।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ আক্রোশে চিৎকার করে ওঠে মেহেরুন্নিসা।

ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে শয্যায়। চোখের দুকূল ভাসিয়ে অশ্রু ঝরে। লজ্জায়—ঘৃণায়—অপমানে।

দাসীরা প্রদীপ নিভিয়ে বেরিয়ে যায়।

মেহেরুন্নিসা তখনও অসহায় ভাবে কাঁদছে।

পরদিন প্রভাতে পাখীদের কাকলি ধ্বনিতে ঘুম ভাঙে মেহেরুন্নিসার। অবাক বিস্ময়ে শয্যার ওপর উঠে বসে মেহেরুন্নিসা। এ কোথায় সে ? এতো দিল্লীর হারেম নয়। কাশ্মিরী শালের সুকোমল শয্যা তো এখানে নেই। এ যে রোমশ পশু চর্মের শয্যায় শুয়ে ছিল সে !

আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ে মেহেরুন্নিসার। দিল্লী ত্যাগের পরের সমস্ত ঘটনা। নিজের মন্দ অদৃষ্টের কথা স্মরণ হয়। অশ্রুসজল হয়ে ওঠে দুই আঁখি।

উঠে দাঁড়ায় মেহেরুন্নিসা। ধীরে ধীরে কক্ষটির চারিধারে ঘুরে বেড়ায়। প্রাসাদের হেমপাত্রপূর্ণ আতর গোলাপ মৃগনাভি কিছুই নেই এখানে। আছে অগুরু চন্দন আর সুগন্ধি ফুল। তারই সুবাসে কক্ষের বাতাস পরিপূর্ণ।

ভাল লাগে মেহেরুন্নিসার। আতর গোলাপ মৃগনাভির উগ্র গন্ধ অপেক্ষা এখানের এই অগুরু চন্দন আর সুগন্ধি ফুলের সুবাস।

ভাল লাগে এখানের এই নির্জনতা। এই প্রভাতে দুর্গম পাহাড়ী দুর্গটির কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। মানুষ আছে কি নেই বোঝাই যায় না। কেবল পাখীদের কাকলি ধ্বনি প্রভাতের মৃদুমন্দ বাতাসে ভেসে আসছে।

কিন্তু দিল্লীতে ?

দিনে রাতে সদা সর্বক্ষণ হৈ হৈ—চিৎকার আর কোলাহলের বন্যা। তোপধ্বনি। হারেম রক্ষিনীদের মুক্ত অস্ত্র হাতে পরিভ্রমণ। সদাসর্বদা অন্তহীন সাবধানতা। একটা অজানিত ভয়ের ছায়া।

বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মেহেরুন্নিসা। তাকায় সীমাহীন নীল আকাশের দিকে। প্রভাতী অরুণের রক্তরাগে ঝল্‌মল্ করছে সমস্ত আকাশ। পাখীদের হালকা ডানায় নিরুদ্দেশ যাত্রার ছবি।

দুর্গের নীচেই নদী। বেগবতী। পাহাড়ী ঝর্ণার মতো কলচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছে। কোথায় কত দূরে কে বলতে পারে। হয়তো গিয়ে যমুনার সঙ্গে কোথাও মিলিত হয়েছে। কি নাম এর ? নাম আছে কি ? মনে মনে ভাবে মেহেরুন্নিসা।

শাহাজাদী।

দাসী এসে অদূরে দাঁড়ায়।

দেখে মেহেরুন্নিসা। স্বাস্থ্যবতী নারী। সুশ্রী। যুবতী।

শোনো।

কাছে এসে দাঁড়ায়।
এ নদীটির নাম কি ?
নীরা।
বড় সুন্দর নাম তো।
হ্যাঁ শাহাজাদী।
আচ্ছা।
আদেশ করুন।
তোমার নাম কি ?
নীরাবাঈ।
নিজের মনে খিল খিল করে হেসে ওঠে মেহেরুন্নিসা। অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাবাঈ।
তোমার ও নাম কেন ?
জানি না শাহাজাদী।
কে দিয়েছিল তোমার নাম ?
আমার পিতা।
চমকে ওঠে মেহেরুন্নিসা। পিতার কথা মনে পড়ে। কত আশা করে তিনি তার আশা পথ চেয়ে আছেন।
বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মেহেরুন্নিসার। কে বলতে পারে আবার কবে পিতার সঙ্গে দেখা হবে। এ জীবনে হবে কি ? কোন দিন এই দুর্গ ছেড়ে বেরুতে পারবে কি না আল্লাই জানেন।
ভাবে মেহেরুন্নিসা।
পিতা নিশ্চয় সমস্ত সংবাদ শুনে তার উদ্ধারের জন্যে সৈন্য পাঠাবেন। সৈন্যরা দুর্গ আক্রমণ করবে। বাদশাহ আলমগীরের রণ নিপুন সৈন্য-দের কাছে এই বর্বর দস্যুরা মুহূর্তে পরাজিত হবে। তারপর...
তার পরের কথা ভাবতে পারে না মেহেরুন্নিসা। নির্বিচারে সকলকে হত্যা করবে পিতার সৈন্যরা। আওরঙজেবের কন্যা হরণের প্রতিফল পাবে মৃত্যুতে। হয়তো সেই সঙ্গে সৈন্যরা, নীরাবাঈ আর দুর্গের সমস্ত নারীদের উপরও অত্যাচার করবে।

করুক। এতটুকু ক্ষতি নেই তাতে মেহেরুন্নিসার। দস্যু কন্যা নীরা। তারও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। যদি সেদিন উদ্ধারের জন্যে কেঁদে পড়ে তবুও করুণা করবে না মেহেরুন্নিসা।

সাহিরা কোথায় এখন? সে কি ফিরে গেছে! কি করছে এখন সাহিরা। তার কথা ভাবছে কি?

বাঁদী হলেও সাহিরাকে ভালবেসে ফেলেছিল মেহেরুন্নিসা। বড় শান্ত ও বাধ্য ছিল সাহিরা। আদেশ পালন করতে এতটুকু দ্বিরক্তি করে নি কোন দিন।

কন্যা অপহরণের সংবাদ শুনে পিতা হয়তো কাউকে ক্ষমা করবেন না। পিতাকে বেশ ভালভাবেই জানে মেহেরুন্নিসা। অন্যায়ের ক্ষমা নেই পিতার কাছে। সাহিরাকেও হয়তো অনেক লাঞ্ছনা সইতে হবে। কি দোষ সাহিরার? না, কোন অপরাধ তার নেই। নেই কারুরই। শাহাজাদীর বাঁদী তারা। সুখ স্বাচ্ছন্দ দেখা আদেশ পালন করাই তাদের কাজ। তবুও পিতার চোখে অপরাধিনী প্রতিপন্ন হবে তারা।

শাহাজাদী। মৃদু কণ্ঠে ডাকে নীরা

নীরার মুখের পানে তাকায় মেহেরুন্নিসা। নীরাকে দস্যুকন্যা বলে মন মেনে নিতে চায় না। বড় সরল সুন্দর মুখখানি। শান্ত দুটি চোখ। মেহেরুন্নিসা আজ নতুন চোখে দেখে সব কিছু।

শাহাজাদী।

চলুন।

কোথায়?

স্নানাগারে।

কেন?

পথশ্রমে ক্লান্ত আপনি। স্নান করলে শরীর মন সুস্থ হয়ে উঠবে।

চল।

নীরার সঙ্গে দ্বিতল থেকে নীচে নামে মেহেরুন্নিসা। এসে উপস্থিত হয় স্নানাগারে।

আসনে বসিয়ে নিজের হাতে খুলে দেয় সাপের মতো বেণীর বন্ধন। মুক্ত করে দেয় ভ্রমর কৃষ্ণ কেশগুচ্ছকে। পরিচর্যা করে কেশের। তারপর এক সময় খুলে নিতে যায় অঙ্গের বসন।

থাক নীরাবাঈ। ইতস্ততঃ করে মেহেরুন্নিসা।

স্নান করবেন না? জিজ্ঞাসা করে নীরা।

করবো।

তবে?

না কিছু নয়।

একে একে শরীরের সমস্ত বসন খুলে নেয় নীরা। আজ এই প্রথম ইতস্ততঃ করে মেহেরুন্নিসা। অন্তর থেকে একটা মৃদু লজ্জার স্রোত রাঙা করে সমস্ত মুখ। দিল্লী হারেমের বেহিসেবী জীবনটাকে মনে করিয়ে দেয় দস্যু কন্যা নীরাবাঈয়ের মার্জিত ব্যবহার।

সুরার নেশায় সেখানে দিন রাত্রি বিবস্ত্র অবস্থাতেই কাটতো মেহেরুন্নিসার। নারীর লজ্জা কি বস্তু জীবনে তার স্পর্শ পায় নি। বাঁদীরা হাসতে হাসতে খুলে নিয়েছে অঙ্গের বসন। ফিরেও দেখে নি তা।

গোপনে পুরুষ এসেছে শয্যায়। কঠিন আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে কাটিয়ে দিয়েছে প্রহরের পর প্রহর। পুরুষের পুরুষত্ব শুধু উপভোগ করেছে। নিজের কামনার বস্তু হিসেবে ব্যবহার করেছে পুরুষকে। ভালবাসে নি। আঁখির কটাক্ষপাতে কাছে টেনেছে। যৌবনের প্রলোভনে আকর্ষণ করেছে। তবুও প্রেমের মন্দিরে তাকে বসায় নি। মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রেম জানে না মেহেরুন্নিসা। যা জানে তা কামনা। দৈহিক পরিতৃপ্তি। মনের খবর সেখানে নেই। আছে শুধু সুরা আর মরদ।

এই ভাবেই কেটেছে মেহেরুন্নিসার কৈশোর সুরু থেকে যৌবন শেষের বাকী দিনগুলি। তবু তৃপ্তি মেলে নি মেহেরুন্নিসার।

বিরোধ দেখা দিয়েছে একদিন। নারীতে নারীতে। প্রতিযোগিতায় বার বার জয়ী হয়েছে মেহেরুন্নিসা। হিংসার আগুনে জ্বলে উঠেছে

রোশেনারা।

শাহ্জাদী।

চমকে ওঠে মেহেরুন্নিসা। নিজের দিকে তাকায়। কখন স্নান শেষে নতুন বস্ত্র পরিয়ে দিয়েছে নীরা জানতে পারে নি। এমনি চিন্তা মগ্ন ছিল।

নীরা।

আদেশ করুন।

এ বস্ত্র কার?

আপনার।

কোথা থেকে এল?

প্রভু সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কে তোমাদের প্রভু?

মাথা নত করে চুপ করে থাকে নীরা।

বলবে না?

আদেশ নেই।

ওঃ। একটু চুপ করে থাকে মেহেরুন্নিসা। অসহ্য রাগ দাগে মনের মধ্যে। বলে, আর কি কি আনিয়েছে তোমার প্রভু।

আদেশ করুন।

সুরা আনিয়েছেন?

না।

কেন, তিনি জানতেন না?

জানতেন।

তবে?

সুরাকে ঘৃণা করেন প্রভু।

তা করুন। তিনি ঘৃণা করেন করুন, আমি করি না। তীক্ষ্ণ শোনায় মেহেরুন্নিসার কণ্ঠ। বলে, আমার জন্যে যখন এত করেছেন সুরাও আনাতে পারতেন।

জানাবো তাঁকে?

জানিও।

উত্তেজনায় হাঁফায় মেহেরুন্নিসা। এ রাগ না অভিমান বুঝতে পারে না। অভিমান যদি হয় তবে কার ওপর। সেই বর্বর দস্যুর ওপর! কি দায় তার। কিসের অভিমান তার 'পরে।

শাহাজাদী।

নীরার দিকে তাকায় মেহেরুন্নিসা।

আহার করবেন চলুন।

সুরা না হলে আহার করবো না।

কিন্তু…

কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন শাহাজাদী। আপনি যদি আহার না করেন প্রভু শুনে ভীষণ দুঃখীত হবেন।

বেশ চল।

ভাবে মেহেরুন্নিসা। আশ্চর্য হয়। এ কি করছে সে। দস্যু হস্তে বন্দিনী সে। কিন্তু এ কি রকম ব্যবহার সে করছে?

কারণ মেহেরুন্নিসা দস্যু হস্তে বন্দিনী হলেও এ পর্যন্ত মন্দ ব্যবহার পায় নি। অদৃশ্য দস্যুপতির নির্দেশে তার প্রতি সকলের বিনীত ব্যবহার মেহেরুন্নিসার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় নি।

শাহাজাদী। ডাকে নীরা।

এ্যাঁ।

কি ভাবছেন?

কিছু না।

আসুন।

নীরাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে মেহেরুন্নিসা।

এই ভাবে তিন দিন পার হয়ে যায়।

শুয়ে বসে ঘুমিয়ে কেটে যায় মেহেরুন্নিসার তিনটি দিন রাত্রি।

গল্প করে নীরার সঙ্গে। বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। ভেবে আশ্চর্য

হয় মেহেরুন্নিসা। এসব কি করে সম্ভব হচ্ছে তার পক্ষে। মাঝে মাঝে তাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

শাহাজাদী।

বল।

আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে ?

না, না।

তবে ?

ও কিছু না আমি পিতার কথা চিন্তা করছি।

ওঃ।

চুপ করে যায় নীরা। চোখ দুটি ছল ছল করে ওঠে। বেদনায় ভরে যায় অন্তর। কোন কথা বলতে পারে না।

মাঝে মাঝে অসাবধানবশতঃ নীরার কাছে তার প্রভুর কথা তুলে ফেলে মেহেরুন্নিসা। নিরুত্তরে মাথা নত করে নীরা।

নীরা নিয়ে আসে কিছু পুস্তক। সাগ্রহে দেখে মেহেরুন্নিসা। ফার্দৌসি, হাফেজ, শেখসাদি প্রভৃতি মহাকবিগণের পারস্য ভাষায় রচিত কাব্য গ্রন্থ।

এসব কোথায় পেলে নীরা ? জিজ্ঞাসা করে মেহেরুন্নিসা।

প্রভু সংগ্রহ করেছেন।

তিনি পড়েন ?

না।

তবে ?

আপনার জন্যে।

আশ্চর্য হয় মেহেরুন্নিসা। তার সুখ সুবিধা আনন্দ বিধানের কোন ত্রুটি রাখেন নি দস্যুপতি। তার প্রিয় প্রতিটি বস্তুই মেহেরুন্নিসা এই দুর্গম দুর্গে পাচ্ছে। কি করে এমন সম্ভব হ'ল ভেবে পায় না মেহেরুন্নিসা।

অদৃশ্য দস্যুপতির প্রতি ক্রমে ক্রমে কৌতূহল বাড়ে। অন্তর চঞ্চল হয়ে ওঠে। কে সে ? কি তার পরিচয়।

জানবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে মন। কিন্তু নিরূপায়·মেহেরুন্নিসা। তিনদিন তিনরাত্রি পার হয়ে গেছে ; দস্যুপতি আসে নি। এমনকি এই দুর্গের মধ্যে একটি পুরুষকে পর্যন্ত দেখতে পায় নি। পুরুষ আছে এ উপস্থিতি জানতে পেরেছে মেহেরুন্নিসা।

নীরা। ডেকেছে মেহেরুন্নিসা।

আদেশ করুন শাহাজাদী। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নীরা।

এ দুর্গে কি কোন পুরুষ নেই ?

এ প্রশ্ন কেন শাহাজাদী ?

আজ পর্যন্ত কোন পুরুষকে দেখতে পেলাম না তাই।

আছে শাহাজাদী। দুর্গের অপরদিকে থাকে তারা। এদিকে আসা নিষেধ তাদের।

কেন ?

প্রভুর এই রকমই নির্দেশ আছে।

চুপ করে গেছে মেহেরুন্নিসা। নীরাকে আর কোন প্রশ্ন করে নি। দস্যুপতির এই ব্যবস্থায় মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছে মেহেরুন্নিসা। তিনি অবর্তমানে অনুচররা যদি শাহাজাদীর বিরক্তির উদ্রেক করে তাই এই ব্যবস্থা করে গেছেন তিনি।

কিন্তু কে এই দস্যু ?

মেহেরুন্নিসাকে এইভাবে বন্দিনী করে রাখবার কারণ কি ?

বহু চিন্তা করেও স্থির করে উঠতে পারে নি মেহেরুন্নিসা।

পিতা হয়তো এর কারণ নির্ণয় করতে পেরেছেন। তিনি হয়তো মহারাষ্ট্রের এই দস্যুকে জানেন। হয়তো এতক্ষণে তার উদ্ধারার্থে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পূর্ণ করেছেন। কিন্তু মেহেরুন্নিসা কিছুই স্থির করতে পারে নি।

কারণ মেহেরুন্নিসা আবাল্যকাল থেকে হারেমের মাঝে বড় হয়ে উঠেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হয়েছে। বিলাসিতায় জীবন কাটাবার নানা উপকরণ। মন তাকে সেই দিকে টেনে নিয়ে গেছে। বিলাসিতার মাঝে দিনে দিনে নিমজ্জিত হয়েছে মেহেরুন্নিসা।

বাইরের জগতের কোন সংবাদ তাই রাখে নি। সময় মেলে নি স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছু চিন্তা করবার।

কিছু দিন আগে বিরাট এক ঝড় উঠেছিল দিল্লীতে। অবাক বিস্ময়ে শুধু দেখেছিল মেহেরুন্নিসা। বোঝবার চেষ্টা করে নি সেই বিপুল পরিবর্তন। দাদু সাজাহান বন্দী হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন আগ্রার দুর্গে। দারার কন্যারা হারেম থেকে অদৃশ্য হয়েছিল একদিন। পিসী জাহানারা রক্ত নেত্রে সব সময় ঘুরে বেড়াতেন। তারপর একদিন হারেম থেকে আগ্রার দুর্গে চলে গেলেন। স্ব-ইচ্ছায় তিনি পিতার কাছে গেছেন প্রচার হয়েছিল। এই কথা কিন্তু কিশোরী মেহেরুন্নিসা কিছু না বুঝলেও বিশ্বাস করে নি। বিমাতা নবাববাঈও তাই বলেছিলেন।

পিসী রোশেনারা সুরার নেশায় মেতে উঠলেন। দেখল মেহেরুন্নিসা। যত দেখতো ততোই অবাক হ'ত। কি এক আশ্চর্য অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যেত মেহেরুন্নিসার সমস্ত সত্তা।

শৃঙ্খলাহীন হারেমের তখন চরম অবস্থা। কলহ আর ব্যাভিচারের বন্যা দুর্দাম গতিতে বয়েছিল সেদিন হারেমে। সূর্যালোকহীন হারেম যেখানে বাদশাহ ছাড়া অন্যের পদার্পণ ঘটে নি, সেখানেও গোপনে এসে প্রবেশ করেছিল পুরুষ।

সুরা পান করতে দেখে একদিন রোশেনারাকে প্রশ্ন করেছিল মেহেরুন্নিসা।

ও কি খাচ্ছ তুমি?

অমৃত। উত্তর দিয়েছিল রোশেনারা।

ও খেলে কি হয়?

আনন্দ।

আর কিছু হয় না?

আর কি চাই তোর? প্রশ্ন করেছিল রোশেনারা।

না সেদিন কিছুই চায় নি মেহেরুন্নিসা। মনের কৌতূহল দমন করতে না পেরে প্রশ্ন করেছিল মাত্র।

প্রশ্ন করা শেষ হতে চলে আসছিল মেহেরুন্নিসা। ডেকেছিল রোশেনারা।

এই শোন।

বল। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেহেরুন্নিসা। অতিকষ্টে শয্যার ওপর উঠে বসেছিল রোশেনারা।

খাবি একটু ?

না।

কেন, খা না একটু।

কি হবে খেয়ে ?

আনন্দ পাবি।

আনন্দের অভাব নেই আমার।

কিন্তু এ যে নতুন আনন্দের দাওয়াই।

না।

খাবি না ?

না।

মেহেরুন্নিসাকে কাছে টেনে নিয়েছিল রোশেনারা। তুই বাহুর আলিঙ্গনে। চুম্বন করেছিল অধরে।

তুই বড় সুন্দর। বলেছিল রোশেনারা।

তিক্ত কটু গন্ধে গুলিয়ে উঠেছিল মেহেরুন্নিসার সমস্ত শরীর। দ্রুত পালিয়ে এসেছিল কক্ষ ছেড়ে।

কাল আবার আসবি। বলেছিল রোশেনারা।

কোন উত্তর দেয় নি মেহেরুন্নিসা।

রোশেনারার কাছ থেকে পালিয়ে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছিল। ঠোঁট হুটো তখনও জ্বালা জ্বালা করছে। একটা অদৃশ্য কি যেন লেগে ছিল হুই ঠোঁটে। খারাপ লাগে নি নতুন অনুভূতিটা।

ভেবেছিল আর যাবে না রোশেনারার কাছে কিন্তু কি এক অদৃশ্য টানে পরদিন টেনে নিয়ে গিয়েছিল মেহেরুন্নিসাকে।

মেহেরুন্নিসাকে দেখে উঠে বসেছিল রোশেনারা।

এসেছিস। আয় কাছে আয়।
কাছে গিয়েছিল মেহেরুন্নিসা। আলিঙ্গনের মাঝে টেনে নিয়েছিল রোশেনারা। অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিয়েছিল চোখ মুখ।
কেঁপে কেঁপে উঠেছিল মেহেরুন্নিসা। শরীরের রক্তে উষ্ণ স্রোত বয়ে গিয়েছিল। দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছিল রোশেনারাকে। ভাল লেগেছিল রোশেনারার আদর।
একদিন মেহেরুন্নিসা যেতে কক্ষ থেকে বাঁদীদের বার করে দিয়েছিল রোশেনারা।
বলেছিল, আজ তোকে আমি আমার মনের মতো করে সাজাব। তোর জন্যে নতুন পোষাক আনিয়েছি।
মনে মনে আনন্দিত হয়েছিল মেহেরুন্নিসা। রোশেনারাকে ভীষণ-ভাবে ভালবাসতে ইচ্ছা করেছিল।
কক্ষদ্বার বন্ধ করেছিল রোশেনারা।
তারপর কাছে এসে পরিধেয় প্রতিটি বস্ত্র একে একে খুলে নিয়েছিল নিজের হাতে।
ভীষণ লজ্জা করেছিল মেহেরুন্নিসার। বাধা দিয়েছিল। শোনে নি রোশেনারা।
মেহেরু। ডেকেছিল রোশেনারা।
উঁ।
নিজের দিকে কোনদিন চেয়ে দেখেছিস ?
দেখেছি।
কি দেখেছিস ?
উত্তর দিতে পারে নি মেহেরুন্নিসা। বুকটা ভয়ে দুরু দুরু করে উঠেছিল। ইচ্ছা করেছিল ছুটে পালিয়ে যায় কক্ষ ছেড়ে। পারে নি মেহেরুন্নিসা। পা দুটো যেন কার্পেট মোড়া মেঝের সঙ্গে গেঁথে গিয়েছিল।
মেহেরু। ডেকেছিল রোশেনারা।
বল।

আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখ।

তাই দেখেছিল মেহেরুন্নিসা। রোজ যেমন দেখে। কিশোরী মেহেরুন্নিসা নিজের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখেছিল। চোখে পড়েছিল নতুন কিছু।

কি দেখছিস?

এবারেও কোন উত্তর দিতে পারে নি মেহেরুন্নিসা!

নিজের শরীর থেকে সমস্ত বস্ত্র খুলে ফেলেছিল রোশেনারা। দেখতে পারে নি মেহেরুন্নিসা। দুরন্ত লজ্জা এসে শরীরের রক্ত হিম করে দিয়েছিল। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল ভয়ে।

মেহেরু।

উঁ।

চোখ খোল। আদেশ করেছিল রোশেনারা।

চোখ খুলেছিল মেহেরুন্নিসা।

আমাকে দেখ। দেখ আমার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

তাই করেছিল মেহেরুন্নিসা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো রোশেনারার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। দেখেছিল পূর্ণ নারী অঙ্গের বিচিত্র গঠন। যার প্রকাশ ঘটছে তার নিজের শরীরে।

মেহেরুন্নিসার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে টেনে নিয়েছিল রোশেনারা। চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলেছিল। মেহেরুন্নিসাকে নিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিল রোশেনারা। দিবালোকে দিল্লী হারেমে রুদ্ধদ্বার কক্ষে একটি কামনা জর্জরিতা নারী একটি সুকমল মনে পাপের বীজ বপন করেছিল।

সেদিন যদি ক্ষণিকের জন্যেও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতো রোশেনারা। যদি দেখতে পেত ভবিষ্যতের করুণ ছবিটা। যে বীজ সে বপন করছে কালে বিষবৃক্ষ হয়ে তারই অপকার সাধনে ব্রতী হবে। তাহলে বোধ হয় সেদিনের সেই জঘন্য কাজ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারতো। এক কামকাতুরা নারীর ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে ভারী করে তুলতো না হারেমের বাতাসকে। বুঝি মেহেরুন্নিসার

জীবনও অন্য পথে চালিত হ'ত।

বোঝে নি রোশেনারা। বিকৃত মনের বিকার সাধনে নিজেকে চালিত করেছিল। কিশোরী মেহেরুন্নিসার জীবনে এনেছিল পরিবর্তন।

নারী অঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে কি এক বিচিত্র ক্ষুধায় কাতর হয়েছিল মেহেরুন্নিসা। দিনে দিনে হয়ে উঠেছিল ছলনাময়ী চতুরা। রোশেনারাকে তুচ্ছ করে মেতে উঠেছিল পাপের খেলায়।

নেশার মতো মনে হয়েছিল জীবনটাকে। ধর্মাধর্ম লজ্জা ভয় সবকিছু বিস্মৃত হয়েছিল। যে সুরাকে একদিন অন্তর থেকে ঘৃণা করেছিল সেই সুরাতেই হয়েছিল আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

কোন বাধা নেই। কোন নিয়মের বাঁধন নেই। কারো কথা কানে তোলে নি মেহেরুন্নিসা।

একদিন পিতার আহ্বান এল।

প্রথমে ভেবেছিল হারেম ছেড়ে যাবে না। কিন্তু কঠিন কঠোর বাদশাহ আলমগীরের আহ্বানকে অস্বীকার করতে পারে নি। যাত্রা করেছিল পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। কিন্তু পথে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হ'ল। এসে পড়ল এক নতুন জগতে। নতুন জীবন এখানে। শান্ত সুন্দর নিস্তব্ধ পরিবেশ। দুর্গম পর্বতমালা আর গভীর অরণ্য। আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

তাই এখানে মেহেরুন্নিসার জীবনে পরিবর্তনের স্রোত এসে গ্রাস করতে চাইছে আগের জীবনটাকে। অসহ্য আত্মদাহে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে দিবারাত্র। তাই বার বার মুক্তির কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মেহেরুন্নিসা।

মুক্তি চাই।

অসহ্য এ জীবন।

অসহ্য বিবেকের দংশন।

তৃতীয় দিনের রাত্রি প্রভাত হয়।

ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে মেহেরুন্নিসা।

আকাশে তখন প্রভাতের রক্তলেখা। বাতাসে নতুন দিনের রাগিনী। পাখীদের কাকলীতে খুশীর বারতা।

শয্যা ছেড়ে বাতায়নের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় মেহেরুন্নিসা। নীচে বেগবতী নীরা খুশীর ছন্দে বয়ে চলেছে আপন মনে।

কাছে এসে দাঁড়ায় নীরাবাঈ। মৃদু কণ্ঠে বলে।

শাহাজাদী, সুখে নিদ্রা হয়েছিল তো ?

কথা বলে না মেহেরুন্নিসা। মৃদু হাসে।

তারপর প্রতিদিনের মতো নীরাবাঈয়ের সহায়তায় প্রভাতের প্রতিটি কাজ শেষ করে।

বেলা বাড়ে।

আপন মনে বসে বসে এলোমেলো চিন্তায় মনটাকে ভরে তোলে মেহেরুন্নিসা।

ছুটে আসে নীরা।

শাহাজাদী।

কি হ'ল নীরা ?

প্রভু এসেছেন।

কে এসেছেন ? ঠিক বুঝতে পারে না। আবার প্রশ্ন করে মেহেরুন্নিসা।

প্রভু এসেছেন শাহাজাদী।

সত্য ?

সত্য শাহাজাদী।

মনে মনে চঞ্চল হয়ে ওঠে মেহেরুন্নিসা। দস্যুপতির আগমন প্রতীক্ষায় উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে। দুরন্ত এক কৌতূহল অসহ্য বেদনা জাগায় মনে।

বেলা বাড়ে। ব্যর্থ হয় মেহেরুন্নিসার দুরন্ত প্রতীক্ষা।

দস্যুপতি আসেন না।

নীরা। ডাকে মেহেরুন্নিসা।

আদেশ করুন শাহাজাদী।

কই তোমার প্রভু তো এলেন না ?

কি জানি শাহাজাদী। আমি ঠিক…

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কি তিনি প্রয়োজন মনে করেন না?

অন্য কাজে বোধ হয় ব্যস্ত আছেন।

মেহেরুন্নিসার সমস্ত অন্তর রাগে অভিমানে আচ্ছন্ন হয়। দুরন্ত এক বিতৃষ্ণা জাগে দস্যুপতির ওপর। কদিনের সেবা যত্নে যেটুকু পরিবর্তন মনের মধ্যে এসেছিল তা অন্তর্হিত হয়। শাহাজাদী মেহেরুন্নিসা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে অন্তরে।

একসময় আহারের আহ্বান জানায় নীরা!

আমি আহার করবো না। দৃঢ় কণ্ঠে জানায় মেহেরুন্নিসা।

কিন্তু……

যা বলছি তাই শোন।

প্রভু শুনলে রাগ করবেন।

করুক।

অনেক সাধ্যসাধনা করে নীরা। কিছুতেই আহার করে না মেহেরুন্নিসা। শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। লজ্জায় অপমানে সমস্ত অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়। আলমগীর কন্যাকে অপমান করবার সাহস রাখে, কে এই দস্যু?

ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় নীরা।

শাহাজাদী।

একসময় পুরুষের মৃদু কণ্ঠের আহ্বানে চমকে ওঠে মেহেরুন্নিসা। আগন্তুকের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকায়।

আগন্তুক অনতি দীর্ঘ ছন্দ, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু। অপূর্ব বীর শরীর। সুন্দর সহাস্য মুখমণ্ডল। চোখের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে অন্যের পক্ষে দৃষ্টি মিলিত করা কষ্টকর।

দেখে মেহেরুন্নিসা। আগন্তুক পুরুষকে ভাল করে লক্ষ্য করে। এই দস্যুপতি! মনে মনে ভাবে মেহেরুন্নিসা। দস্যু বলে মন মেনে নিতে চায় না।

শাহাজাদী। আবার ডাকেন আগন্তুক।

উত্তর দিতে পারে না মেহেরুন্নিসা। মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নত করে।

আপনি আহার করেন নি কেন?

রুচি নেই। মৃদু কণ্ঠে বলে মেহেরুন্নিসা।

তাই কি?

হ্যাঁ।

সত্য নয়। মৃদু হাসেন আগন্তুক।

হাসি দেখে অন্তর জ্বলে ওঠে মেহেরুন্নিসার। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে।

কে আপনি?

শিবাজী।

শিবাজী!

হ্যাঁ শাহাজাদী।

আমি বাদশাহ আলমগীর কন্যা। কি জন্যে আপনি আমাকে ধরে এনেছেন?

আপনি যে বাদশাহ কন্যা তা আমার অজানা নয়, আর তার জন্যেই আপনার পিতার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি। এর জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। বলেন শিবাজী। আমার আতিথেয়তা যাতে আপনার কষ্টের কারণ না হয় সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আমি। তারপর আপনার পিতার সঙ্গে আমার স্থির সৌহার্দ হলে সসম্মানে আমি আপনাকে দিল্লী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবো।

তৈমুর বংশধর বাদশাহের সঙ্গে সামান্য পার্বতীয় দস্যুর স্থির সৌহার্দ। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে কেঁপে ওঠে মেহেরুন্নিসার ওষ্ঠদ্বয়। এ আপনার দুরাশা।

জানি শাহাজাদী এ আমার দুরাশা মাত্র। একটু চুপ করে থাকেন শিবাজী। মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, আমি দস্যু নই শাহাজাদী। আমি এই পার্বতীয় দেশের স্বাধীন রাজা। তৈমুর বংশে জন্মগ্রহণ করে উত্তরাধিকার সূত্রে দিল্লীশ্বর হওয়ার সৌভাগ্যকে আমি অস্বীকার করি না তবে নিজের বাহুবলে এবং বুদ্ধিতে সাম্রাজ্য স্থাপনকে আমি জীবনে শ্রেয় মনে করি। তাই করেছি আমি। বাল্যকালে যে স্বপ্ন

দেখেছি তারই সার্থক রূপ দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাই আমার কাম্য শাহাজাদী।

সে স্বপ্ন কি সার্থক হবে মনে করেন কোনদিন ?

নিশ্চয়ই হবে। জাতির মনে যদি স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগে, হাজার শৃঙ্খলে তাকে বেঁধে রাখলেও সে থাকে না।

দিল্লীশ্বর দুর্বল নন। ইচ্ছা করলে তিনি এই পার্বত্য এলাকা মরুভূমিতে পরিণত করতে পারেন।

সম্ভব। কিন্তু দিল্লীশ্বরের মনে যদি সে ইচ্ছা কোনদিন জাগে তাহলে তা বাস্তবে রূপ নাও পেতে পারে।

কেন ?

আমরাও বেঁচে আছি শাহাজাদী।

কি হবে তাতে ?

সেদিন যদি কখনও আসে আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি পাবেন।

দিল্লীশ্বরকে আপনি ভয় করেন না ?

করি। কিন্তু সে ভয়কে কাটিয়ে ওঠবার মতো আত্মবিশ্বাস আমার আছে।

এ বিশ্বাস কোথায় পেলেন আপনি ?

আমার অন্তরের কাছে।

কি করে ?

পরাধীনতার ব্যথা থেকে।

আর কোন প্রশ্ন করে না মেহেরুন্নিসা। প্রশ্ন জালে এই সুচতুর দস্যুপতিকে অপদস্থ করা যাবে না বোঝে মেহেরুন্নিসা। তাই চুপ করে থাকে।

শাহাজাদী।

বলুন।

যদি আমার আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি পান অনুগ্রহ করে জানাবেন আমাকে।

সে কথা আমিও চিন্তা করেছি।

কোন সংকোচ না করে আমাকে জানাবেন।

সুরা চাই আমার।

সুরা!

হ্যাঁ সুরা।

কিন্তু···

থাক তাহলে। বিদ্রূপে কেঁপে ওঠে মেহেরুন্নিসার কণ্ঠ।

না শাহাজাদী। সুরা আপনি পাবেন।

সুরা পান করেন না আপনি?

না শাহাজাদী।

কেন?

সুরাপানে বিবেক বুদ্ধি ধর্মাধর্ম লোপ পায় বলে।

মিথ্যে কথা। গর্জে ওঠে মেহেরুন্নিসা।

হয়তো তাই। আমার এই অনভিজ্ঞতার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।

একসময় বিদায় নিয়ে চলে যান শিবাজী।

চুপ করে বসে থাকে মেহেরুন্নিসা। একসময় নীরা এসে আহার করিয়ে যায়।

শিবাজীর প্রতিটি কথা মনে পড়ে মেহেরুন্নিসার। আশ্চর্য হয়। বাদশাহের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হবার এত সাহস কোথা পেলেন শিবাজী।

শিবাজীর এই সাহসকে দুঃসাহস বলে মনে হয়েছিল মেহেরুন্নিসার। শিবাজীর প্রতিটি কথা বাতুলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে নি সে।

এখন ভাবে। এত তেজ এত দম্ভ শিবাজীর পক্ষে মিথ্যা নাও হতে পারে। যা সম্ভব তাকেই হয়তো সম্ভব করে তুলবেন শিবাজী।

আতংকে শিউরে ওঠে মেহেরুন্নিসা। অনাগত ভবিষ্যতকে চিন্তা করতে পারে না মন। পিতার বিপুল বাহিনী পরাজিত হবে সামান্য এক পার্বতীয় দস্যুর কাছে। এ যে কল্পনা করা যায় না।

পিতার শক্তির কাছে শিবাজীর শক্তি কিছু নয়। মহাসমুদ্রে এক কলসী জল ফেলার মতো। তাতে সমুদ্রের জল বাড়ল কিনা বোঝা যেমন যায় না, শক্তিশালী বিপুল বাদশাহী সৈন্যের কাছে শিবাজীর অশিক্ষিত পার্বতীয় দস্যুরা তেমনি কিছুই নয়। মুহূর্তের অস্ত্রাঘাতে কোথায় যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে হিসাব পাবে না কেউ।

পিতার কূট বুদ্ধির কাছে শিবাজী শিশু। দিল্লীশ্বর আলমগীর যাঁর নির্দেশে সারা হিন্দুস্থানের মানুষ ওঠে বসে, তাঁর কাছে এই পার্বতীয় এলাকার স্বাধীন রাজা খেতাবধারী পার্বতীয় দস্যু শিবাজী নিতান্তই শিশু।

নীরা। নীরাকে ডাকে মেহেরুন্নিসা।

শাহাজাদী।

তোমার প্রভু কোথায়?

তিনি চলে গেছেন।

কোথায়?

জানি না শাহাজাদী।

তিনি থাকেন কোথায়?

তাঁর নির্দিষ্ট থাকবার কোন স্থান নেই।

স্ত্রী পুত্র নেই?

পুত্র আছে, স্ত্রী নেই।

মারা গেছেন?

হ্যাঁ শাহাজাদী।

পুত্র থাকে কোথায়?

চাকন দুর্গে প্রভুর মার কাছে।

একটু চুপ করে থাকে মেহেরুন্নিসা। ডাকে—

নীরা।

বলুন শাহাজাদী।

তোমার প্রভু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নি কেন?

বলতে পারবো না শাহাজাদী।

আচ্ছা তুমি যাও।

হঠাৎ কি মনে হতে নীরাকে ডেকে শিবাজীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মেহেরুন্নিসা। কেন তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। পার্বতীয় দস্যু বলে যাকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে কি প্রয়োজন তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলের। বাদশাহ আলমগীর কন্যা মেহেরুন্নিসার কিন্তু বিচিত্রা নারী মন এমনি যে কৌতূহল দমন করা তার পক্ষেও সম্ভব হ'ল না।

এখন লজ্জায় ভরে যায় সারা অন্তর। একি করছে সে? একি অসম্ভব পরিণতি তার!

এখানের এই সাধারণ পরিবেশের মধ্যে থাকার ফলে অন্তরটাও কি তার সামান্য একজন নারীর মতো হয়ে গেল।

অসম্ভব। আর নয়। এই অসম্ভব পরিণতি চায় না সে।

সুরা চাই। সুরা না হলে শাহাজাদী মেহেরুন্নিসা হারিয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে।

এই কোন হ্যায়।

চিৎকার করে ওঠে মেহেরুন্নিসা। ছুটে আসে নীরা।

সরাব লাও।

সুরা

কেন তোর প্রভু পাঠান নি?

পাঠিয়েছেন শাহাজাদী।

লে আও।

এক মুহূর্ত মেহেরুন্নিসার মুখের পানে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায় নীরা।

কি বিচিত্রা চরিত্র এই শাহাজাদী। দিল্লী হারেমের গুণেই বোধ হয় এমনি হয়ে উঠেছে।

মনে মনে ভাবে নীরা।

॥ ছয় ॥

সন্ধ্যার অন্ধকারটা ঘন হয়েছে তখন।

সমস্ত শিবিরটা নীরব নিস্তব্ধ। কোথাও একটু কোলাহলের লেশমাত্র নেই। মৃতের মতো সমস্ত শিবিরটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

আলো আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারকে বিদ্রূপ করে এখানে ওখানে আলো জ্বলছে। মানুষও আছে। কয়েক সহস্র সৈন্য নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে যে যার জায়গায়। শিবির রক্ষীর দল নিঃশব্দে পাহারা দিচ্ছে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে টেনে নিয়ে। নিঃস্তব্ধ শিবিরে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা কাতর কিছু মানুষের আর্তনাদ সন্ধ্যার অন্ধকারকে বিদ্রূপ করে মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

বাদশাহ আওরঙজেব নির্বাক স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন আপন শিবিরে। গভীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখ। কুটিল আঁখিদ্বয় ভাবলেশহীন।

একটু আগেই ভয়াবহ এক মৃত্যুযজ্ঞ সম্পন্ন হয়ে গেছে। বাদশাহের হুকুমে হিন্দু শিবিকা বাহকেরা বাদশাহী সৈন্যের তরবারীর আঘাতে ছিন্ন শির নিয়ে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। তাদের মৃতদেহগুলি দূরে ফেলে দিয়ে এসেছে মেথরের দল।

চাবুকের আঘাতে জ্ঞান হারিয়েছেন বাদশাহ কন্যার রক্ষীদল। সেনাপতি নাজির খাঁর মৃতদেহটা এখনও ঝুলছে বৃক্ষ শাখায় রজ্জু বদ্ধ অবস্থায়।

সৈন্যরা দেখুক। শিখুক কাজে অকৃতকার্যতার শাস্তির নমুনা। যাতে আর কেউ কোনদিন নাজির খাঁর মতো করতে সাহসী না হয় তাই এই ব্যবস্থা।

শিবিরের দ্বার রক্ষী হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কে যেন শিবিরের দিকে এগিয়ে আসছে।

কাছে আরো কাছে।

এই কোন হ্যায়?

হেঁকে ওঠে প্রহরী

থমকে দাঁড়ায় ছায়ামূর্তি। আবার এগিয়ে আসে।

প্রহরীর চিৎকারে প্রহরারত আরো কয়েকজন প্রহরী এগিয়ে আসে।

ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ায় ছায়ামূর্তি। একজন ফকির।

কি চাই ?

বাদশাহের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

কেন ?

প্রয়োজন আছে।

আজ রাত্রে সাক্ষাৎ হবে না।

কেন ?

ব্যস্ত আছেন জাঁহাপনা।

হাসেন ফকির। শুভ্র শ্মশ্রুর মাঝে মুক্তার মতো দাঁতগুলি মশালের আলোতে চিক্ চিক্ করে ওঠে।

কিন্তু বাদশাহের সঙ্গে আমার যে বিশেষ প্রয়োজন বাবা।

কি প্রয়োজন না জানালে আজকে রাত্রে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু বাবা বাদশাহ ছাড়া আর কারো কাছে আমার প্রয়োজনের কথা যে বলা যাবে না।

সৈন্যরা পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে। প্রধান রক্ষীর কাছে সংবাদ যায়। অনেক পরে বাদশাহের কাছে। ফকির নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন শিবির দ্বারের বাইরে।

সংবাদ আসে বাদশাহের কাছ থেকে। সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছেন বাদশাহ।

বাদশাহের শিবির কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় ফকিরকে।

উঠে আসেন আওরঙজেব। ফকিরকে সম্মান জানিয়ে আসনে বসান। নিজে বসেন।

আপনার কি প্রয়োজন বলুন ফকির সাহেব।

প্রয়োজন। মৃদু একটু হাসেন ফকির। বলেন, দিল্লীতে গিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায়। শুনলাম রাজধানীতে নেই

আপনি। আবার বেরিয়ে পড়লাম পথে। দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ালাম দেশে দেশে। এখানে আছেন সংবাদ পেয়ে দর্শনের আশায় ছুটে এসেছি।

কেন ফকির সাহেব ? আশ্চর্য হন আওরঙজেব।

আপনাকে দর্শন করব বলে!

কেবলমাত্র আমাকে দর্শন করবার জন্যে ছুটে এসেছেন আপনি ?

হ্যাঁ। মৃদু হাসেন ফকির। হিন্দুস্থানের বাদশাহকে দর্শন করতে আসি নি এসেছি আল্লার সেবককে দর্শন করতে।

ফকির সাহেব!

বলুন।

ধন্য আপনি। ধন্য আপনার মহত্ত্ব।

না জাঁহাপনা মহত্ত্ব যদি কারো থাকে তা আপনারই আছে। সংসার ত্যাগ করে আমার পক্ষে যা সম্ভব হয় নি সংসারের মাঝে থেকে তাই সম্ভব করেছেন আপনি। তাই বলছি ধন্য আপনি। আপনাকে দর্শন করে ধন্য হলুম আজ আমি।

সুন্দর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ফকিরের মুখমণ্ডল।

ফকিরের সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হন আওরঙজেব। মৃদু কণ্ঠে বলেন, কিন্তু ফকির সাহেব…

বলুন।

আর ভাল লাগে না এই নাগপাশের বাঁধন। আল্লার ডাক শুনি দিবারাত্র। ইচ্ছা করে রাজ্য ঐশ্বর্য সব ছেড়ে মক্কা চলে যাই। ফকির সাহেব এই বাঁধন ছিঁড়ে আপনি আমাকে বার করে নিয়ে যেতে পারেন ?

বাদশাহ আলমগীরের কণ্ঠে করুণ আকুতি।

হাসেন ফকির। বলেন, বাঁধন ছিঁড়তে চাইলেও বাঁধন ছেঁড়া যায় না বাদশাহ। তাঁর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কিছুই করবার সাধ্য নেই। আপনার হয়তো প্রয়োজন ফুরিয়েছে কিন্তু তিনি জানেন এখন সংসারে প্রয়োজন আছে আপনাকে।

তাইতো পারি না ফকির সাহেব। কর্তব্যের বাঁধনে নিজেকে এমন ভাবে বেঁধে ফেলেছি যে মাঝে মাঝে মনে হয় এর থেকে বুঝি কোন দিনই মুক্তি পাব না।

কোন কথা বলে না ফকির। মৃদু হাসেন।

ফকির সাহেব।

বলুন।

আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দেবেন আপনি ?

সাধ্য হলে আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব।

কর্তব্য কর্ম সমাধানে অনেক অমানুষিক কাজ আমাকে করতে হচ্ছে, একি অন্যায় করছি আমি ?

অন্যায় !

তাই জিজ্ঞাসা করছি ফকির সাহেব। কঠিন কঠোর ভাবে অন্যায়ের শাস্তি দিচ্ছি, সে কি পাপ ?

পাপ !

নির্মমভাবে শেষ করছি শত্রু সেকি আমার···

না। কর্তব্য যেখানে সেখানে স্নেহ মায়া মমতার স্থান নেই।

আমিও তাই বিশ্বাস করি ফকির সাহেব। আমার কাছে কর্তব্য পালনই বড় ধর্ম।

আমি জানি বাদশাহ। কর্তব্য পালন অপরের চক্ষে যতোই নির্মম হোক। ধর্মের কাছে নয়।

ধন্য আপনি ফকির সাহেব।

হাসেন ফকির। বলেন, এবার আমাকে বিদায় দিন।

এই রাত্রে ?

হ্যাঁ বাদশাহ।

আজ বিশ্রাম নিয়ে কাল প্রভাতে···

তা হয় না বাদশাহ। আজই আমাকে যাত্রা করতেই হবে।

কোথায় যাবেন ?

তা জানি না। পথে নেমে যেদিকে চোখ যাবে সেই দিকেই যাত্রা

করবো।

আজ রাত্রে থাকলে বড় উপকার হ'ত ফকির সাহেব।

তা হয় না বাদশাহ। পরে সাক্ষাৎ করবো।

কাল প্রভাতেই আমি দিল্লী যাত্রা করবো।

কালই ?

হ্যাঁ ফকির সাহেব। কারণ আমার কন্যা এক পার্বতীয় দস্যু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছে। তার উদ্ধারের ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।

সামান্য একজন দস্যু আপনার কন্যাকে অবরুদ্ধ করেছে ?

হ্যাঁ, ফকির সাহেব। এ তার দুঃসাহস। তাই এমন শিক্ষা আমি তাকে দেবো যে আর কোনদিন মাথা তুলতে না পারে।

গর্জে ওঠেন আওরঙজেব। মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে ওঠে। অস্থির ভাবে পদচারণা সুরু করেন।

স্থির দৃষ্টিতে বাদশাহের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ফকির। এক সময় মৃদু কণ্ঠে ডাকেন।

বাদশাহ।

এঁ্যা।

যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন আওরঙজেব। নিজেকে সংযত করেন। লজ্জিত কণ্ঠে বলেন, আমাকে ক্ষমা করবেন ফকির সাহেব। হঠাৎ আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।

বসে পড়েন আওরঙজেব।

বিদায় নেন ফকির। বাদশাহ ফকিরকে উপহার দিতে চান কিন্তু গ্রহণ করেন না ফকির। বলেন, অর্থে আমার প্রয়োজন নেই বাদশাহ। আল্লার কৃপায় দিনান্তে মুষ্টিভিক্ষা পেলেই চলে।

পিড়াপিড়ী করেও করেন না বাদশাহ। ফকিরের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

বিদায় নিয়ে পথে নামেন ফকির।

ধীরে ধীরে পথ চলেন। কিছু দূরে গিয়ে দাঁড়ান। কি যেন কান পেতে শোনেন। মানুষের অস্পষ্ট কাতরোক্তি শুনে এগিয়ে যান। পর

পর কতকগুলো ছিন্ন শির মানুষের মৃতদেহ পড়ে আছে। শিয়ালে ছিঁড়ে খাচ্ছে মাংস। এগিয়ে যান ফকির। নির্ভয়ে।
ভালভাবে শোনেন। শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে যান।
চমকে ওঠেন ফকির। মৃদু চাঁদের আলোয় রক্তাক্ত মৃতদেহের মাঝে একটি জীবিত মানুষ। মরে নি।
কাছে গিয়ে মৃতদেহের মাঝ থেকে মানুষটিকে বার করেন। হতভাগ্য বেঁচে আছে।
এ সেই শিবিকা বাহকদলের সর্দার। বাদশাহের অত্যাচারে মৃত মনে করে সৈন্যরা এমনিই ফেলে দিয়েছিল।
জ্বলে ওঠে ফকিরের দুই চোখ। মানুষটিকে পরম যত্নে তুলে নেন কাঁধে। আর্তনাদ করে ওঠে যন্ত্রণায়।
আওরঙজেবের শিবির থেকে কিছু দূরে বনের মধ্যে পরিত্যক্ত এক-খানি জীর্ণ অট্টালিকার কাছে এসে দাঁড়ান ফকির। সংকেত করেন। দ্বার খুলে যায়। আলো হাতে বেরিয়ে আসে একজন।
এ কে ?
আওরঙজেবের অত্যাচারের চিহ্ন।
নিতাইজী।
বল।
কোথায় পেলেন একে ?
মৃতদেহের মাঝ থেকে।
ভিতরে গিয়ে মানুষটিকে শুইয়ে দেন ফকির। ক্ষতস্থানগুলো ধুয়ে বনলতা সংগ্রহ করে তার রস দিয়ে বেঁধে দেন। মানুষটা দুই একবার কেঁপে উঠে নিঃসাড় হয়ে যায়।
নিতাইজী।
বল।
বাঁচবে ?
মনে তো হয় না।
চুপ চাপ বসে থাকে দুজনে। তাকিয়ে থাকে অত্যাচারিত মানুষটার

মুখের দিকে। সময় পার হয়ে যায়। রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়। অচেতন হয়ে পড়ে থাকে মানুষটা।

ফকির—নিতাইজী।

ক'দিন অপেক্ষা করে যখন আওরঙজেবের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না তখন নিতাইজী স্থির করলেন যে কোন উপায়ে বাদশাহের সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। বাজীকে বললেন সে কথা।

বাজী নিতাইজীর প্রস্তাব শুনে রাজী হতে পারল না।

বললে, এ অসম্ভব নিতাইজী।

অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। প্রয়োজন হলে বাদশাহের শিবিরে যেতে হবে।

কিন্তু...

জানি। তবু আমাকে যেতে হবে।

বাজীর কোন কথা না শুনে ফকিরের ছদ্মবেশে বাদশাহের শিবিরে রওনা হলেন নিতাইজী; ফিরে এলেন বাদশাহের অত্যাচারের স্বাক্ষর করে।

নিতাইজী। এক সময় ডাকে বাজী।

বল।

যেজন্যে...

সফল হয়েছি বাজী। বাদশাহ কাল প্রভাতেই দিল্লী যাত্রা করবেন। দিল্লী গিয়ে পর্বত যুদ্ধে নিপুন সৈন্য পাঠাবেন।

এক সময় রাত্রি প্রভাত হয়। শিবাজীকে সংবাদ দেবার জন্যে যাত্রা করে বাজী। অজ্ঞান মানুষটিকে নিয়ে জনশূন্য জীর্ণ অট্টালিকা মাঝে একাকী বসে থাকেন নিতাইজী।

বাজী বলেছিল, এ যখন বাঁচবে না তখন কি প্রয়োজন আপনার থাকবার?

যেতে রাজী হন নি নিতাইজী। তাই বাজীকে একাই যাত্রা করতে হয়েছে।

এক সময় বাদশাহী শিবিরে ব্যস্ততা জাগে। সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে

যাত্রা করেন আওরঙজেব।

দেখেন নিতাইজী। কঠিন প্রতিজ্ঞায় জ্বলে ওঠে দুই চোখ।

দুদিন পার হয়ে যায়।

তৃতীয় দিন প্রভাতে চোখ মেলে চায় মানুষটা। কথা বলে।

জল।

জল দেন নিতাইজী। আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দুই চোখ।

আরো দুদিন পার হয়। ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে মানুষটা। নিতাইজীর মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

কেমন বোধ করছ?

ভাল। একটু চুপ করে থাকে মানুষটি। বলে, ওরা কোথায়?

কারা?

আমার সংগীরা?

বুঝতে পারেন নিতাইজী ও কাদের কথা বলছে। বলেন, তারা আছে।

আছে!

হ্যাঁ, তোমার নাম কি?

মল্ল!

নাম শুনে চিনতে পারেন নিতাইজী। এ সেই শিবিকা বাহকদলের সর্দার। কিন্তু এমন বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা কার সাধ্য চিনতে পারে, এ সেই মল্ল।

এক সময় মল্লের মুখে সব কথা শোনেন নিতাইজী। মল্ল সুস্থ হয়ে সব বলে। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

কি করবে তুমি?

কি করব!

গ্রামে ফিরে যাবে?

গ্রামে!

হ্যাঁ।

না সেখানে যেতে পারবো না। কোন মুখে যাব সেখানে।

কি করবে তাহলে?

উত্তর দেয় না মল্ল। চুপ করে বসে থাকে।

আমি কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাব। একসময় বলেন নিতাইজী।

চলে যাবেন?

হ্যাঁ।

আবার চুপ করে থাকে মল্ল। নিতাইজীর মুখের দিকে একবার তাকায়।

কিছু বলবে? জিজ্ঞাসা করেন নিতাইজী।

আমাকে নিয়ে যাবে? ভয়ে ভয়ে বলে মল্ল।

আমার সঙ্গে যাবে তুমি?

হ্যাঁ।

কিন্তু তোমার বাড়ির সকলে…

কেউ নেই আমার।

ওঃ।

নিয়ে যাবেন? করুণ আকুতি মল্লের কণ্ঠে।

কিন্তু আমার সঙ্গে গিয়ে কি করবে তুমি?

যা বলবেন আপনি। আপনার বাড়িতে…

বাড়ি আমার নেই।

তবে?

বনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই। আজ এখানে কাল আর এক জায়গায়।

ভীষণ কষ্টের জীবন।

আমি পারবো।

প্রভুর সমস্ত আদেশ পালন করবে মুখ বুজে?

প্রভু!

হ্যাঁ, আমাদেব প্রভু। শিবাজী।

শিবাজী!

ভীষণ ভাবে চমকে ওঠে মল্ল। মনে পড়ে সব কথা।

কি হ'ল।

সব পারবো আমি।

মল্লের মুখের দিকে তাকান নিতাইজী। বিশ্বাস করেন। বলেন, ভবানীর নামে শপথ কর কোনদিন প্রভুর আদেশ অমান্য করবে না।

শপথ করে মল্ল।

॥ সাত ॥

দিল্লীর পথে এগিয়ে চলে মালশ্রী আর সাহিরা।

পথশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ওঠে সাহিরা। চলতে পারে না আর।

বহিন। ডাকে মালশ্রী।

বলুন তন্নজী।

আজ আর এগিয়ে কাজ নেই। আশ্রয়ের ব্যবস্থা দেখি।

সূর্য অস্ত যেতে এখনও দেরী আছে তন্নজী।

ক্লান্ত তুমি।

তাহোক।

আবার পথ চলে দুজনে। নীরবে।

প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পথ চলে দুজনে। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হবার আগে আশ্রয় নেয় কোন গৃহীর বাড়িতে। ভিতরে আশ্রয় পায় না। মুসলমান বলে বাইরে রাত কাটাতে হয়। তাহোক। তবু নিরাপদ আশ্রয়।

মাঝে মাঝে পথের ধারে গাছতলায় রাত্রিবাস করতে হয়। সাহিরাকে ঘুমুতে বলে চুপ করে বসে পাহারা দেয় মালশ্রী। আত্মরক্ষার জন্যে হাতের কাছে রেখে দয় অস্ত্র।

ঘুমুতে বললেও ঘুমুতে পারে না সাহিরা। চুপ করে জেগে থাকে। ভাবে অনেক কথা। মনে পড়ে যায় অতীতের দুঃস্বপ্ন মাখা দিন-গুলোকে।

উঠে বসে সাহিরা।

কি হ'ল?

ঘুমুতে পারছি না তন্নজী।

চেষ্টা কর। না ঘুমুলে শরীর খারাপ হবে পথ চলতে পারবে না।

কেন পারবো না?

পারবে না বহিন।

কিন্তু না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন আপনি তো পথ চলছেন?

কেন কাল তো সারারাত ভীষণ ঘুমিয়েছি।

না, আপনি কাল ঘুমোন নি। ঘুমের ভান করে জেগে থাকেন আপনি।

উত্তর দেয় না মালশ্রী।

তন্নজী।

বল।

এই ভাবে রাত জাগলে অসুখ করবে আপনার।

করবে না বহিন। রাত জাগা অভ্যেস আছে আমার।

তাহোক। কাল ঘুমিয়েছি আমি, আজ আপনি ঘুমোন আমি জেগে থাকি।

তা হয় না।

কেন হয় না।

হয় না।

মালশ্রীর কোন যুক্তিই মানে না সাহিরা, জোর করে তাকে শুতে বাধ্য করে।

শুয়ে পড়ে মালশ্রী। শোবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে অচেতন হয়। নিদ্রিত মালশ্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মমতায় ভরে যায় সাহিরার বুক। আকাশের তারার আলোছায়া আঁধারে মালশ্রীর নিদ্রিত মুখের পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সাহিরা।

এক সময় দূরে মৃদু শব্দ শোনা যায়। কেমন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এধারে। এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ।

একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে সাহিরা। শরীরের সমস্ত রক্ত

হিম হয়ে যায়। মালশ্রীকে ডাকতে যায়। পারে না। গলায় স্বর ফোটে না।

এগিয়ে আসে জ্বলন্ত দুটি চোখ। কাছে আরো কাছে। আর রক্ষা নেই।

হঠাৎ অস্ত্র হাতে লাফিয়ে ওঠে মালশ্রী। ছুটে যায় জ্বলন্ত চোখ দুটির দিকে। নিমেষে মিলিয়ে যায় চোখ দুটি।

বহিন। কাছে এসে ডাকে মালশ্রী।

কে ও ?

শিয়াল।

কোথা গেল ?

পালিয়েছে।

মালশ্রী দেখে সাহিরাকে। তখনও থর থর করে কাঁপছে সাহিরা। ভাবে মালশ্রী, যে মেয়ে সামান্য শৃগাল দেখে ভয় পায় সে কেমন করে জীবনের পথে একলা চলবে।

বহিন। ডাকে মালশ্রী।

দিল্লীতে তোমার চেনা জানা কেউ আছে ?

না।

তবে কোথায় থাকবে ?

থাকবার আস্তানা একটা দেখে নেব।

রাত্রি শেষে হয় এক সময়। পথ চলা সুরু হয় দুজনের।

আকাশের সূর্যটা একসময় প্রখর হয়ে ওঠে। তপ্ত হয় বাতাস। কষ্টকর হয়ে ওঠে পথ চলা। ক্লান্ত সাহিরা আর পথ চলতে পারে না। বহিন।

তন্নজী।

একটু বিশ্রাম করবে ?

বিশ্রাম !

হ্যাঁ।

আর একটু চলুন তন্নজী।

তুমি ক্লান্ত বহিন।

হাসে সাহিরা। বলে, ক্লান্ত আপনিও। কিন্তু শুধু মাত্র আমার জন্যে বিশ্রাম নিতে রাজী নই আমি।

মালশ্রী দেখে সত্যই ক্লান্ত সাহিরা। বলে, আমিও একটু বিশ্রাম চাই বহিন।

পথের পাশে গাছের ছায়ায় বসে তুজন। খানিক বিশ্রাম করে। খাবার বার করে আহার করে তুজনে।

আচ্ছা তন্নজী। এক সময় কথা বলে সাহিরা।

বল বহিন।

দিল্লী আর কতদূর?

আর তুদিনের পথ।

মাত্র তুদিন!

হ্যাঁ বহিন।

কথা বলে না সাহিরা। নীরবে আহার করে।

আবার যাত্রা স্থরু হয়। পাশাপাশি পথ চলে তুজনে। দিনের সূর্যটা তখন পশ্চিমে হেলতে স্থরু করেছে।

রাত্রি নামে একসময়। মাঠের মাঝে জীর্ণ পরিত্যক্ত এক বাড়িতে আশ্রয় নেয় তুজনে। আহার শেষে মালশ্রীকে শুতে বাধ্য করে নিজেও শুয়ে পড়ে সাহিরা।

রাত্রি বাড়ে ক্রমশঃ। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে মালশ্রী।

ঘুম আসে না সাহিরার চোখে। কি এক অজানিত আশঙ্কায় বার বার কেঁপে ওঠে সাহিরার অন্তর। বাইরের কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে।

বিচিত্র শব্দ ওঠে মাঝে মাঝে। কারা যেন চলে যায় দ্রুত। স্পষ্ট পদ শব্দ শোনে সাহিরা। ভেসে আসে হিংস্র বন্যজন্তুর ডাক। হিংস্র উল্লাসে থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে।

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে সাহিরা। নিস্তার পায় না। মনে হয়

কার নিঃশ্বাসের শব্দ পাশে পাওয়া যাচ্ছে। কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সাহিরার।

চোখ খোলে সাহিরা। কেউ নেই। কালো অন্ধকার শুধু নীরবে বিদ্রূপ করছে।

আবার সেই শব্দ। এক সঙ্গে অনেক। দ্রুত এগিয়ে আসছে এই দিকে।

আর পারে না সাহিরা। অন্ধকারে এগিয়ে যায় মালশ্রীর দিকে। ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগায়।

কি হ'ল।

উত্তর দিতে পারে না সাহিরা।

অনেকগুলো কণ্ঠের বিকট চিৎকার ওঠে। কারা যেন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

ভয়ে মালশ্রীকে জড়িয়ে ধরে সাহিরা। তখনও বাইরে সেই বিকট চিৎকার করে চলেছে আক্রমণকারীর দল।

এক সময় চিৎকার থামে।

বহিন। ডাকে মালশ্রী।

ওরা গেছে।

হ্যাঁ।

কারা ওরা?

হায়নার দল।

দূরে সরে বসে সাহিরা। মাথা নত করে থাকে।

বহিন। ডাকে মালশ্রী।

বলুন।

ফিরে চল তুমি।

কোথায়?

আমার সঙ্গে।

তা হয় না তন্বঙ্গী।

কিন্তু একলা কি করে তুমি...

আমি পারবো তন্নজী। আমার এই অকারণ ভয়কে আমি জয় করবো।

পারবে?

আমাকে পারতেই হবে তন্নজী।

কথা বলে না মালশ্রী। অন্ধকারে সাহিরার মুখের পানে চায়। কিছুই দেখতে পায় না।

দিল্লীর কাছে এসে পড়ে একদিন। দূরে দেখা যায় যমুনার সেতু। সেতু পার হয়ে দিল্লীতে প্রবেশ করবে সাহিরা।

এবার বিদায় নিয়ে চলে যাবে মালশ্রী।

নীরবে দাঁড়ায় দুজনে। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়।

বহিন।

তন্নজী।

এবার আমাকে যেতে দাও।

চলে যাবেন।

হ্যাঁ বহিন। হাসে মালশ্রী। ওধারে প্রভু হয়তো আপনার কুশল সংবাদ জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছেন। আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

কথা বলে না সাহিরা। বলতে পারে না। দুরন্ত একটা কান্নার কুণ্ডলী বুক ঠেলে গলার কাছে উঠে আসতে চাইছে।

বহিন।

বলুন।

ভবানীর কাছে প্রার্থনা করি যেন নিরাপদ আশ্রয় লাভ কর তুমি।

উত্তরে ম্লান একটু হাসে সাহিরা।

চলি বহিন।

আসুন তন্নজী।

জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না।

বহিনকে ভুলবেন না যেন। আপনার প্রভুকে আমার আদাব জানাবেন।

জানাবো বহিন।
ফেরে মালশ্রী। যাত্রা করে আপন পথে।
চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সাহিরা। অশ্রুতে চোখ দুটি ভরে যায়।

দাঁড়াও।
পিছনে কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে সাহিরা। এগিয়ে আসে লোকটি।
কে তুমি ?
লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁপে ওঠে সাহিরার বুক। মানুষ যে এমন কুৎসিত হতে পারে এর আগে দেখে নি সাহিরা।
কি কথা বলছ না যে। বোবা নাকি ?
না।
বাঃ, কথা বলতে পার দেখছি। কে তুমি ?
জেনে লাভ ?
লাভ লোকসান আমি বুঝবো। কে তুমি ?
দেখতেই তো পাচ্ছ কে আমি। উত্তর দেয় সাহিরা।
তা বিবির আসা হচ্ছে কোথা থেকে ?
আসমান থেকে নয়।
বাঃ খাসা বুলি। যাবে কোথা ?
তোমার বাড়ি নিশ্চয়ই নয়।
আমার বাড়ি থাকলে তো যাবে।
বাড়ি নেই ?
না।
থাক কোথা ?
যখন যেখানে খুশী। তোমার বাড়ি কোথা ?
মক্কায়।
ঠাট্টা হচ্ছে ?
তোমার সঙ্গে। পাগল।
দিল্লী এসেছ কেন ?

দরকার আছে।

মরদ আছে সঙ্গে ?

পাব কোথা।

থাকবে কোথা ?

জানি না।

জানবার তাহলে দরকার হবে না। রাস্তা থেকেই লুঠ হয়ে যাবে।

আমি ?

তুমি নয়তো কি আমাকে লুঠবে নাকি। খুবসুরৎ রূপ হয়েছে তোমার। আমার ইচ্ছা হচ্ছে…ইচ্ছেটা কাজে লাগাতে এস না যেন মরবে।

ক্ষেপেছ। আমার এই মুখ যদি তোমার মুখে লাগাতে যাই ভয়ে মরে যাবে তুমি। তা তোমার যাবার যখন জায়গা নেই আমার সঙ্গে যাবে ?

তোমার বাড়ি ?

আমার বাড়ি কোথা যে নিয়ে যাব। চল।

কোথায় ?

গেলেই দেখতে পাবে।

না।

তাহলে সৈন্যদের হাতে গিয়ে পড়। দুদিনে রূপ তোমার শুকিয়ে যাবে। এবার চল।

হাত ধরে লোকটা। টেনে নিয়ে চলে সাহিরাকে। সাহিরা বোঝে বাধা দিলে কোন লাভ হবে না। নিস্তার নেই এই কুৎসিত মানুষটার হাত থেকে।

খানিক যাবার পর বাধা পায় ওরা। একজন সৈন্য এগিয়ে আসে।

এই দাঁড়াও।

দাঁড়ায় লোকটা। সাহিরাও দাঁড়িয়ে পড়ে।

এগিয়ে আসে সৈন্যটি। বলে, এই খুদা মিয়া কার আওরত নিয়ে ভেগে এলি ?

আমার।

তোর। কোথা পেলি ?

শ্বশুরের ঘরে।

বাজে বকিস নি সত্যি বল কোথা থেকে ভাগিয়ে আনলি ?

বলছি তো শ্বশুরের ঘর থেকে।

আবার বাজে বকছিস শালা।

শালা তোর বাপ।

গালাগাল দিবি না।

শালা বলে কথা বলবি না।

এগিয়ে আসে সৈন্যটি। বোরখা সরিয়ে সাহিরাকে দেখে।

খাসা মালরে। দিবি আমাকে ?

দোব।

সত্যি! কি নিবি বল ?

তোর বিবিকে।

খুদা মিয়া। গর্জে ওঠে সৈন্যটি।

তোর বিবিকে দ্রিতে পারবি না তো আমার বিবি চাইলি কেন ?

যা শালা।

যাব না তো বিবি নিয়ে তোর সঙ্গে আসনাই করবো।

সাহিরাকে নিয়ে পথ চলে খুদা মিয়া। অনেক গলি পার হয়ে এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়।

এ আমায় কোথা নিয়ে এলে ? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে সাহিরা।

তুমি থাকবে যেখানে। উত্তর দেয় খুদা মিয়া।

এখানে আমি থাকবো না।

তাহলে যাবে কোন্ চুলোয় ?

যে দিকে ইচ্ছে।

যাও তাহলে। ভাল করতে গেলুম কিনা!

কথা বলে না সাহিরা। একটু আগেই যা দেখেছে ভেবে ভয় হয়। কিন্তু তাই বলে এই অচেনা নোংরা গলির মাঝে থাকবে কেমন করে।

কি হ'ল থাকবে না যাবে ?

তুমি কি বল ?

আমি কি বলব। তোমার যা ইচ্ছা কর। ধমকে ওঠে খুদা মিয়া। তোমাকে না নিয়ে এলেই হ'ত। মরতে যখন চাও তখন দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। যাও।

না যাব না।

তবে এসো।

এগিয়ে চলে খুদে মিয়া। অন্ধকার গলিপথ। সার সার একের পর এক বাড়িগুলো দিনের বেলাতেও প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আধো ছায়া আধো আলোয় খুদা মিয়াকে অনুসরণ করে চলে সাহিরা।

উঃ। কাতর আর্তনাদ করে ওঠে সাহিরা।

কি ?

হোঁচট লাগলো।

চলতে না জানলে হোঁচট লাগবে না তো কি। নাও হাত ধর। কি হাত ধরতে বিবির সরম লাগছে নাকি ?

হাত ধরে সাহিরা। সাহিরাকে টেনে নিয়ে চলে খুদা মিরা।

এক সময় একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অনেক দিনের পুরানো বাড়ি।

দরজায় ধাক্কা দেয় খুদা মিয়া। দরজা খোলে না।

কিরে সব মরে গেলি না কি ? চিৎকার করে ওঠে খুদা মিয়া।

দরজা খোলে। সামনে এসে দাঁড়ায় এক বৃদ্ধা।

কিরে বাতাসী মরে গেসলি না কি ?

তুই মর। শুনতে পাবো তবে তো আসবো।

তোর মা কি করছে ?

শুয়ে আছে।

বেগম সাহেবা এই দিনের বেলাতেই শুয়ে আছেন। বলিহারি।

সাহিরাকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে খুদা মিয়া।

এ কে ? জিজ্ঞাসা করে বাতাসী।

তোর দরকার কি তাতে। যা ভাগ্।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে খুদা মিয়া। গিয়ে দাঁড়ায় একটা ঘরের সামনে। মৃদু কণ্ঠে ডাকে।

মণি।

কে?

আমি খুদা।

এসো।

ভেতরে ঢোকে খুদা মিয়া। বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে যায় সাহিরাকে।

কেমন আছ মণি?

ভাল।

শুনলুম তোমার অসুখ বেড়েছে?

বাতাসী বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ।

না না, আমি বেশ ভালই আছি। কদিন কোথায় ছিলে? মাঝে মাঝে কোথায় যাও বলতো?

একটা কাজে গিয়েছিলুম মণি।

তোমার কাজ তো পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। ও সব ছেড়ে দাও তুমি। আমার তো কম কিছু নেই। দুজনের বেশ চলে যাবে বাকী জীবনটা।

একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে মণি।

কি কথা?

আমি একজনকে সঙ্গে এনেছি তাকে রাখতে হবে।

কাকে এনেছ?

দেখই না।

সাহিরাকে ডাকে খুদা মিয়া। ভয়ে ভয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সাহিরা।

কে এ?

তা তো জানি না।

কোথায় পেলে?

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল নিয়ে এলুম।

আস্তেআস্তে। উঠে বসে মণিবাঈ। খুদা মিয়া পরম যত্নে বসিয়ে দেয়। দেখে সাহিরা। দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত নারীটিকে। বিগত যৌবনা। কিন্তু পুরানো দিনের অসামান্য রূপ এখনো রয়েছে।

তোমার নাম কি?

সাহিরা। মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয় সাহিরা।

কোথা থেকে আসছো?

মাদুরা থেকে।

কেন?

উত্তর দেয় না সাহিরা। চুপ করে থাকে।

এধারে এসো। ডাকে মণিবাঈ।

কাছে এগিয়ে যায় সাহিরা।

বসো।

সাহিরা বসে। মুখের বোরখা সরিয়ে দেয়। চমকে ওঠে মণিবাঈ। চোখের দৃষ্টি কেঁপে ওঠে।

কে, কে তুমি?

মণিবাঈয়ের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে সাহিরা। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মণিবাঈয়ের দিকে।

নিজেকে সংযত করে নেয় মণিবাঈ। বলে, এখানে যে এসেছ তুমি থাকবার কোন জায়গা আছে?

না।

তবে কোন্ সাহসে তুমি এই অচেনা জায়গায় এসেছ। জান না একা নারীর কত বিপদ?

জানি।

তবু এসেছ?

হ্যাঁ।

ওঃ।

চুপ করে যায় মণিবাঈ। চোখ বোজে।

মণি। ডাকে খুদা মিয়া।

বল।
এ থাকবে ?
থাক।
নিরাপদ আশ্রয় প্রাপ্তির আনন্দে চোখে জল ভরে ওঠে সাহিরার।
পরে কাঁদলে চলবে। এসো। বিদ্রূপ করে ওঠে যেন খুদা মিয়া।
চলুন।
চলুন নয়, আগের মতো চলই বল।
বেশ তাই বলবো। হেসে ফেলে সাহিরা।

॥ আট ॥

চুপ করে বসেছিল মেহেরুন্নিসা।
বসে বসে ভাবছিল নিজের বিচিত্র জীবনটার কথা। বাদশাহ আলমগীর কন্যা আজ সামান্য এক পার্বতীয় দস্যুর হাতে বন্দিনী। লজ্জায় ঘৃণায় ক্ষোভে মন ক্ষত বিক্ষত হয় মেহেরুন্নিসার।
প্রথম কদিন ভেবেছিল পিতা তার অপহরণের সংবাদ শুনে নিশ্চয় সসৈন্যে ছুটে আসবেন উদ্ধারের জন্যে। কিন্তু আজ পক্ষকাল পার হতে চললো কিছুই দেখতে পেল না মেহেরুন্নিসা।
না কোন ব্যবস্থাই বোধহয় হয় নি। যদি হ'ত তাহলে নিশ্চয় শুনতে পেত সে। একদিন নীরার কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে কিছুই জানতে পারে নি।
সংবাদ পেয়েছিল পরদিন। সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন শিবাজী। এক সময় ডেকেছিলেন।
শাহাজাদী।
বলুন।
শুনলাম আপনার পিতার সংবাদ জানার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছেন আপনি ?

কোন কথা বলতে পারে নি মেহেরুন্নিসা। তাকাতে পারে নি শিবাজীর মুখের দিকে। লজ্জায় মাটির সংগে মিশিয়ে যেতে চেয়েছিল মেহেরুন্নিসা।

শাহাজাদী। আবার ডেকেছিলেন শিবাজী।

শিবাজীর দিকে তাকিয়েছিল মেহেরুন্নিসা।

শুনেছি বাদশাহ দিল্লী যাত্রা করেছেন।

পিতা দিল্লী ফিরে গেছেন?

হ্যাঁ শাহাজাদী।

শিবাজীর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারে নি মেহেরুন্নিসা। মনে হয়েছিল এ শিবাজীর ছলনা ছাড়া আর কিছু নয়।

রাজা।

বলুন।

আপনার সংবাদ সত্য?

সত্য শাহাজাদী।

কিন্তু…

মিথ্যা সংবাদ দিয়ে আমার কোন লাভ নেই শাহাজাদী। আপনার পিতার সংগে আমার যাতে সংগ্রাম বাঁধে সেই উদ্দেশ্যেই আমি আপনাকে হরণ করেছি। এখন আপনার পিতা দিল্লী ফিরে যাওয়ায় আপনি যেমন দুঃখে মর্মাহত হয়েছেন তেমনি আমিও নিরাশ কম হই নি। তবে…

কি?

বাদশাহ শিবাজীকে অল্পে রেহাই দেবেন না। তিনি দিল্লী ফিরে গিয়ে নিশ্চয় পার্বত্য যুদ্ধে কুশলী সৈন্য পাঠাবেন। তাছাড়া মহারাষ্ট্রে বাদশাহের যে সৈন্যরা আছে তারাও দিন রাত শিবাজীর সন্ধানে ফিরছে।

কথা বলে নি মেহেরুন্নিসা। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল দুই চোখ। সবই লক্ষ্য করেছিলেন শিবাজী। মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল মুখে।

শাহাজাদী।

বলুন।

এ সংবাদ সত্য হলে খুশী হন না?

আবার শিবাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল মেহেরুন্নিসা। বিচিত্র চরিত্রের এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী চতুর মানুষটির কাছে বারবার ধরা পড়ে গেছে। অস্বীকার করতে পারে নি।

আমিও খুশী হই শাহাজাদী। মৃদু হেসেছিলেন শিবাজী। বলেছিলেন, তবে, আমার বিশ্বাস হয় না বাদশাহের সৈন্যরা কোনদিন এ দুর্গ অধিকার করতে পারবে।

কেন!

কারণ এ দুর্গ এমনই দুর্গম স্থানে যে আমার কয়েকজন অনুচর ইচ্ছা করলে সহস্র বাদশাহী সৈন্যকে ধ্বংস করতে পারে।

শিবাজীর কথায় কেঁপে উঠেছিল মেহেরুন্নিসা। স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল শিবাজীর মুখের দিকে। বুঝেছিল পিতার সৈন্য এলে কেন খুশী হন শিবাজী।

শাহাজাদী।

এ্যাঁ।

কি হ'ল আপনার?

কিছু না।

বসে বসে ভাবে মেহেরুন্নিসা। ভাবে অদৃষ্টের কথা। চতুর শিবাজীর হাত থেকে কোনদিনই বুঝি মুক্তি পাবে না সে। জীবনের বাকী দিনগুলি বুঝি এই কক্ষের মাঝে কাটাতে হবে। ভোগবিলাস স্বপ্ন হয়েই রয়ে যাবে মনে।

দিল্লী হারেমের শাহাজাদী মেহেরুন্নিসা আজকের বন্দিনী মেহেরুন্নিসার কাছে কল্পনা হয়েই থেকে যাবে। জীবনের একটা বড় সত্য স্মৃতি হয়ে মনের মণিকোঠায় ঘুমিয়ে থাকবে।

হয়তো কোনদিনের অলস মধ্যাহ্নে বন্দিনী মেহেরুন্নিসার মনে পড়ে যাবে অনেকদিন আগের ফেলে আসা দিনগুলিকে। সেদিনের ছলনাময়ী চতুরা শাহাজাদী মেহেরুন্নিসাকে মনে পড়বে। যে ভাল

বাসতে শেখে নি। ভালবাসে নি। শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যে পুরুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। ভাললাগা শেষ হলে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে দূরে।

মনে পড়বে রোশেনারাকে। যে তার অনাগত যৌবনকে কামনার রঙে রাঙিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল অসময়ে।

মনে পড়ে হারেমের কথা। রোশেনারা এখন একা। নিজের ইচ্ছা মতো ভোগবিলাসের মাঝে মনের আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। বাধা দেবার কেউ নেই। কেউ নেই মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেবার।

মনে পড়ে জ্যেষ্ঠা ভগিনী জেব-উন্নিসাকে। শিক্ষিতা বিদুষী ভগিনী। হারেমের হাওয়া তারও গায়ে লেগেছিল। সাবধান হয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন পিতা।

সাহিরাকে মনে পড়ে। সাহিরা এখন কোথায়? বেঁচে আছে কি? সাহিরার জন্যে মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে মেহেরুন্নিসার। বড় ভাল ছিল সাহিরা। বড় সুন্দর ছিল।

একদিন হারেমে বাঁদী হয়ে এসেছিল সাহিরা। বিমাতা নবাববাঈয়ের কাছ থেকে মেয়েটাকে চেয়ে নিয়েছিল মেহেরুন্নিসা।

তোর নাম কি রে?

সাহিরা।

কিছু কাজকর্ম জানিস?

জানি। হেসেছিল সাহিরা।

এর আগে কোথাও কাজ করেছিস্?

না।

তবে?

কথা বলে নি সাহিরা, আবার হেসেছিল।

হাসছিস্ কেন? জিজ্ঞাসা করেছিল মেহেরুন্নিসা।

আমি কেবল হাসি।

কেন?

কি জানি।

কাজে ভুল হলে কিন্তু সাত চাবুক লাগাবো।

হেসে ফেলেছিল সাহিরা। বলেছিল, কাজে আমার ভুল হবে না শাহাজাদী। সত্যিই কোনদিন কাজে ভুল হয় নি সাহিরার। সব কাজে এগিয়ে আসতো সব সময়।

সময়ে সময়ে সাহিরার ওপর কম অত্যাচার করে নি মেহেরুন্নিসা। মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করেছে। কোন প্রতিবাদ কোনদিন করে নি। কিন্তু সাহিরার ওপর যত অত্যাচারই করুক মেহেরুন্নিসা, মনে মনে ভাল চাইতো সাহিরার।

কিন্তু আজ? আজ সাহিরা নেই। হয়তো পিতার কঠিন দণ্ড মাথা পেতে নিয়ে চিরতরে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

মেহেরুন্নিসার শরীরের শিরা-উপশিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত বয়ে যায়। কঠিন হয়ে ওঠে মুখ। শিবাজীর প্রতি ঘৃণায় ভরে যায় অন্তরটা।

কক্ষে প্রবেশ করে নীরা।

শাহাজাদী।

সরাব লে আও।

আঃ, লে আও।

নীরবে মেহেরুন্নিসার আদেশ পালন করে নীরা। নিয়ে আসে সুরার পাত্র।

আরো দাও।

শাহাজাদী।

আঃ চুপ।

চিৎকার করে ওঠে মেহেরুন্নিসা। হিংস্র উল্লাসে কেঁপে ওঠে চোখের তারা।

পাত্রের পর পাত্র ভরে দেয় নীরা।

সুরার পাত্র মুখে তুলতে যায়। তোলা হয় না। দ্বারের কাছে ছায়া পড়ে।

কেঁপে ওঠে মেহেরুন্নিসার হাত। মৃদু হাসিমুখে কক্ষে প্রবেশ করেন শিবাজী। এগিয়ে আসেন মেহেরুন্নিসার দিকে।

স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শিবাজীর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে মেহেরুন্নিসা।

তুমি যাও নীরাবাঈ। নীরাকে বলেন শিবাজী।

ইতস্ততঃ করে নীরা।

এগুলো নিয়ে যাও।

সুরার পাত্রগুলো তুলে নিয়ে চলে যায় নীরা।

কেমন আছেন শাহাজাদী ? মৃদু হাসিমুখে প্রশ্ন করেন শিবাজী।

শিবাজীর মুখের দিকে তেমনি ভাবে তাকিয়ে থাকে মেহেরুন্নিসা। কথা বলতে পারে না। শিবাজীর মুখ প্রসন্নতায় ভরা। সুরা পানরতা মেহেরুন্নিসাকে দেখে সে মুখে কোন ভাব বৈলক্ষণ হয় নি। চোখ দুটি তেমনি শান্ত, উজ্জ্বল।

কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো ? আবার বলেন শিবাজী।

উত্তর দিতে পারে না মেহেরুন্নিসা। মাথা নেড়ে জানায় কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

বাতায়ন পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ান শিবাজী। তাকান সার সার পর্বতগুলির দিকে। গোধূলির আলোয় উজ্জ্বল প্রতিটি পর্বতশিখর।

মেহেরুন্নিসা বসে থাকে। নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মতো। কি এক দুরন্ত আত্মদাহে চেতনাহীন।

শাহাজাদী।

এ্যাঁ। চমকে ওঠে মেহেরুন্নিসা।

কি ভাবছেন ?

কোন উত্তর দিতে পারে না মেহেরুন্নিসা।

আমি দুঃখীত শাহাজাদী। মৃদু কণ্ঠে কতকটা আত্মগত ভাবে বলেন শিবাজী।

কেন ? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শিবাজীর মুখের দিকে তাকায় মেহেরুন্নিসা।

অনেক কষ্ট হয়তো সহ্য করতে হচ্ছে আপনাকে, কিন্তু কি করবো আমি নিরুপায়। আপনার এই অবস্থার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন শাহাজাদী।

শিবাজীর কথায় কেঁপে ওঠে মেহেরুন্নিসার অন্তর। আত্মধিক্কারে পূর্ণ হয়ে ওঠে মন। ভাবে, একি করছে সে, কাকে সে বারবার ছোট করে দেখছে! এই সমব্যথী বিরাট পুরুষকে সে কি করে ছোট ভাবছে!

কিন্তু···

সাহিরা! সাহিরার মৃত্যুর জন্যে শিবাজীই তো দায়ী। তাকে হরণ না করলে মৃত্যু নেমে আসতো না সাহিরার জীবনে। কিন্তু··· বাঁদীর কঠিন অসহ্য জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চেয়েছিল সাহিরা। মৃত্যু মাঝে তার মুক্তি এসেছে। না হলে শত অত্যাচার আর লাঞ্ছনার কালি সারা অঙ্গে মেখে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে হ'ত হারেমে। প্রতিবাদ করবার উপায় ছিল না। পেত না নিষ্কৃতি। দিনের পর দিন তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যেত যৌবন। শূন্য দেহ নিয়ে একদিন বিদায় নিতে হ'ত পথে।

তাই দেখেছে মেহেরুন্নিসা। বহু ভোগ্যা বাঁদীরা কলঙ্কের কালিমা সারা অঙ্গে মেখে যমুনার কালো জলে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে। হারেম থেকে মাঝে মাঝে অন্তর্হিত হতে দেখেছে বাঁদীদের। কোথায় গেল সন্ধান মেলে নি আর।

কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত সেই জীবন থেকে মুক্তি এনে দিয়েছেন শিবাজী। সাহিরাকে বাঁচিয়েছেন।

শাহাজাদী।

বলুন।

কি ভাবছেন?

আচ্ছা—।

বলুন।

আমাকে ঘৃণা করেন তো?

ঘৃণা! আশ্চর্য ভাবে মেহেরুন্নিসার মুখের দিকে তাকান শিবাজী।

হ্যাঁ।

ঘৃণা করব কেন?

আমি নারী। আমি সরাব খাই।
না শাহাজাদী।
কিন্তু সুরাকে আপনি ঘৃণা করেন তো?
করি।
তবে?
একটু চুপ করে থাকেন শিবাজী। মৃদু কণ্ঠে বলেন, সুরাকে আমি এইজন্যে ঘৃণা করি, সুরা মানুষের সমস্ত সৎ প্রকৃতিগুলোকে বিনষ্ট করে বলে। কিন্তু যে সুরা পান করে তাকে আমি ঘৃণা করি না শাহাজাদী।
করেন না!
না। আমি যারা সুরা পান করে তারা সুরার সর্বনাশারূপের কথা চিন্তা না করেই করে জানি। ফলভোগও তাদের করতে হয়। দিনের পর দিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলে তারা। তাদের জন্যে আমার করুণা হয়। তাই বলে তাদের আমি ঘৃণা করতে পারি না। ঘৃণা করার অধিকার আমার নেই। বড় জোর তাদের সাবধান করতে পারি। বলতে পারি তোমরা সুরা খেও না। ভুল করে বন্ধু ভেব না সুরাকে।
ভুল!
হ্যাঁ, ভুল শাহাজাদী।
কেমন করে বিশ্বাস করবো?
নিজের মনের কাছে প্রশ্ন ক'রে।
উত্তর মিলবে?
অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রশ্ন পাঠাতে পারলে উত্তর মিলবে বৈ কী।
আর কোন প্রশ্ন করে না মেহেরুন্নিসা; শিবাজীর কথাগুলো মনের মাঝে ঝড় তোলে। সেই ঝড়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে মেহেরুন্নিসা। নিজের অতীতটাকে মনে পড়ে।
নীরা এসে প্রবেশ করে কক্ষে।
প্রভু।

বল।
নিতাইজী এসেছেন।
যাচ্ছি আমি।
মেহেরুন্নিসার কাছে বিদায় নিয়ে চলে যান শিবাজী।
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মেহেরুন্নিসা।

নিতাইজী শিবাজীর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। দূরে চুপ করে বসে ছিল মাত্র।
শিবাজী এসে কক্ষে প্রবেশ করেন।
কি সংবাদ নিতাইজী?
সংবাদ শুভ। আশা করি ফসলকারের কাছে সব শুনেছেন।
শুনেছি নিতাইজী। এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনাও হয়েছে; আমার মনে হয় বাদশাহ আওরঙজেব এবার মহারাজ জয়সিংকে পাঠাবেন আমাকে দমন করবার জন্যে।
আমারও তাই মনে হয়। এবার আমাদের আরো বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
হ্যাঁ নিতাইজী।
মনে হয় এবার মহারাষ্ট্রে যে সংগ্রাম সুরু হবে তা সহজে মিটবে না। হয়তো বাদশাহী সৈন্যরা নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপরও অত্যাচার সুরু করবে।
কেন?
কারণ বাদশাহ আলমগীর এবার নির্মম হাতে মহারাষ্ট্রের ধ্বংসের সূচনা করবেন। তৈমুরবংশের রক্তধারার চিহ্ন রেখে যাবেন মহারাষ্ট্রে।
শিবাজীর জন্যে নিরীহ গ্রামবাসীরা কেন উৎপীড়িত হবে নিতাইজী।
কারণ আছে প্রভু।
কি কারণ?
ওই দেখুন।
অদূরে দণ্ডায়মান মল্লের দিকে তাকিয়ে আতংকে শিউরে ওঠেন

শিবাজী। মল্লের সমস্ত শরীরে অত্যাচারের অজস্র চিহ্ন।
কে করেছে এ অবস্থা ?
আওরঙজেব স্বয়ং।
কি বলছেন নিতাইজী !
সত্য প্রভু।
কে এ ?
শাহাজাদীর শিবিকা বাহকদের একজন। বাদশাহের সৈন্যরা এদের ধরে নিয়ে যায়। বাদশাহ নিজে একে চাবুকের পর চাবুক মারেন। মৃত বলে সৈন্যরা ফেলে দিয়ে আসে। তুলে নিয়ে আসি আমি।
আর সকলে ?
তারা এ জগতে নেই।
স্তব্ধ হয়ে যান শিবাজী। নিরীহ শিবিকা বাহকদের মৃত্যুতে কেঁদে ওঠে শিবাজীর অন্তর। আক্রোশে জ্বলে ওঠে দুই চোখ। বলেন, এর প্রতিশোধ আমি নেব নিতাইজী।
কক্ষ মাঝে অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ান শিবাজী। বিদায় নিয়ে চলে যায় নিতাইজী। গোধূলির শেষে সন্ধ্যা নামে। রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়। বাতায়ন পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন শিবাজী। মনে পড়ে অতীতকে।
দিল্লীর রাজা তখন পৃথ্বিরাজ ; ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বীর। বলবিক্রমে অপরাজেয় যোদ্ধা। ন্যায়নিষ্ঠ, প্রজাবৎসল রাজা।
দিন কাটে। কাটে রাত্রি। পার হয়ে যায় দিনের পর দিন। পৃথ্বিরাজের শৌর্য বীর্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে দেশ দেশান্তরে।
ক্রোধে কেঁপে ওঠেন জয়চাঁদ। সহ্য করতে পারেন না পৃথ্বিরাজের নাম ; সুযোগ অনুসন্ধান করেন। কি ভাবে পৃথ্বিরাজকে ধ্বংস করা যায়। বড় হয় কন্যা সংযুক্তা। অপূর্ব সুন্দরী লাবণ্যবতী কন্যা। এমন রূপবতী কন্যা বুঝি সারা ভারতবর্ষে নেই।
চিন্তিত হয়ে ওঠেন জয়চাঁদ। এমন রূপবতী গুণবতী কন্যা তিনি কার হাতে তুলে দেবেন ! কোন্ দেশের রাজা সংযুক্তার উপযুক্ত হবে ?

ভেবে কিছুই স্থির করতে পারেন না জয়চাঁদ।

পরামর্শ দেন মন্ত্রী আর পণ্ডিতরা। বলেন, মহারাজ রাজকুমারীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করুন। রাজকুমারী মনোমত পতি নির্বাচন করে নিন।

তাই স্থির হয়। দেশে দেশে দূত ছোটে। আমন্ত্রণের স্রোত বয়ে যায় সারা ভারতে। আমন্ত্রণ যায় না শুধু পৃথ্বিরাজের কাছে।

শোনে সংযুক্তা। ব্যথার অশ্রুতে ভরে যায় তার হরিণ কালো ছুটি নয়ন। যাঁকে সে মনে প্রাণে পূজা করে তাঁর কাছেই যায় না পিতার আমন্ত্রণ। এ অন্যায়।

কিন্তু প্রতিবাদের সাহস হয় না সংযুক্তার। ক্রুদ্ধ হবেন পিতা। হয়তো তিনি…। ভাবতে পারে না সংযুক্তা।

সখীরা পরামর্শ দেয়। তাই করে সংযুক্তা। সংযুক্তার আমন্ত্রণ নিয়ে আকাশে ওড়ে শ্বেত কপোত।

স্বয়ম্বর সভাগৃহ তৈরী হয়। তৈরী হয় অতিথিদের জন্যে নতুন নতুন গৃহ। অতিথিরা একে একে উপস্থিত হন একদিন।

চিন্তায় চিন্তায় কৃশ হয় সংযুক্তার বরতনু। শ্বেত পারাবত ফিরে আসে না। চিন্তায় অধীরা হয়ে ওঠে সংযুক্তা।

এসে পড়ে স্বয়ম্বরের দিন।

সারা রাত্রি জেগে চিন্তা করেছে সংযুক্তা। স্থির করেছে অন্ধের মতো যাকে সামনে পাবে তার গলাতেই বরমাল্য পরিয়ে দেবে। গুণ, ঐশ্বর্য কিছুই বিচার করবে না।

শয্যা ত্যাগ করে সংযুক্তা। সখী আর দাসীরা মিলে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র অলঙ্কারে সাজিয়ে দেয় সংযুক্তাকে।

ছু চোখ ভরে শেষবারের মতো আকাশ পৃথিবী দেখে নেয় সংযুক্তা অশ্রুতে ভরে ওঠে আঁখি ছুটি। আত্মধিক্কারে ভরে যায় মন। নিজের মনের দৈন্য কেন প্রকাশ করল সংযুক্তা। পৃথ্বিরাজ নিশ্চয় শত্রু-কন্যার পত্র পেয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠেছিলেন। ছোট ভেবেছিলেন সংযুক্তাকে।

স্বয়ম্বর সভা থেকে পিতার আহ্বান আসে। সখীপরিবৃতা হয়ে সভাগৃহের দিকে এগিয়ে চলে সংযুক্তা। জীবনের আনন্দ স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটাতে।

নানান দেশের রূপবান গুণবান রাজা আর রাজকুমারেরা জয়চাঁদের আমন্ত্রণে সংযুক্তা লাভের বাসনা নিয়ে এসেছেন। মণি-মাণিক্য খচিত পোষাকে শোভিত হয়ে স্বয়ম্বর সভা আলো করে বসে আছেন। দেখে সংযুক্তা। কোন পরিবর্তন আসে না ভাবলেশহীন মুখে। একের পর এক রাজা আর রাজপুত্রদের পরিচয় ঘোষণা করে ঘোষক। কে কত বড় মহাবীর তারই বর্ণনা। শুনতে শুনতে এগিয়ে চলে সংযুক্তা। কারো পানে বা ক্লান্ত আঁখি মেলে মুহূর্তের জন্যে তাকায়। এগিয়ে চলে সংযুক্তা। এগিয়ে চলে স্বয়ম্বর সভার দ্বারের দিকে। যেখানে পিতা পৃথ্বিরাজের মর্মর মূর্তি তৈরী করিয়ে দ্বার রক্ষকরূপে স্থাপন করেছেন।

তাকায় সংযুক্তা সেই প্রস্তর মূর্তির দিকে। ব্যথায় ভরে ওঠে মন। যে বীরকে সংযুক্তা মনে প্রাণে পতিত্বে বরণ করেছে, যাঁর চরণে নিজেকে উৎসর্গের আশায় অন্তরে ব্যাকুল, জীবনকে ধন্য করতে চায় যাঁর করুণাস্পর্শে, তাঁর এই অবমাননায় অন্তর কেঁদে ওঠে সংযুক্তার। ব্যথার অশ্রু ঝরে পড়ে আঁখি দিয়ে।

মন স্থির করে সংযুক্তা। যাঁকে সে মনে প্রাণে ভালবেসেছে। স্বামীত্বে বরণ করে নিয়ে অনেক স্বপ্ন রচনা করেছে অলস মধ্যাহ্নে, আর নিস্তব্ধ রাত্রির প্রহরে তাকে ভিন্ন আর কারো কণ্ঠে বরমাল্য তুলে দিতে পারবে না সংযুক্তা। নাই বা এলো সে! নাই বা গ্রহণ করলো তাকে। সংযুক্তার সারা জীবনে ব্যথার অশ্রুজল সম্বল হলেও অন্যের কণ্ঠে বরমাল্য দেবে না সে।

পূর্ব রাত্রের প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যায়। দৃঢ় পদক্ষেপে সেই নিশ্চল পাষাণ মূর্তির কাছে এগিয়ে যায় সংযুক্তা। বহুজনের আকাঙ্খিত সেই বরমাল্য পরিয়ে দেয় পাষাণমূর্তির কণ্ঠে।

কুলকলঙ্কিনী কন্যাকে ক্রুদ্ধ পিতা হত্যা করতে ছুটে আসেন। সফল

হয় না উদ্দেশ্য।

সংযুক্তার বিস্মিত দৃষ্টিকে কাঁপিয়ে এগিয়ে আসেন রক্ষাকারী। তুলে নেন নিজ অশ্বে। ঝড়ের বেগে ছুটে চলেন অগণিত জনসমুদ্রের মাঝ দিয়ে।

অপহরণকারীকে বাধা দিতে ছুটে আসে সৈন্যরা। বাধা পায়। রুদ্ধ হয় গতি। অগণিত জনতার মাঝ থেকে তরবারি হাতে এগিয়ে আসে প্রতিরোধকারীর দল।

সংযুক্তাকে নিয়ে দিল্লীর পথে ছুটে চলেন পৃথ্বিরাজ।

দিল্লী রাজপ্রাসাদ উৎসব সজ্জায় সজ্জিত হয়। উৎসবের সাড়া জাগে মানুষের মনে। শুভদিনে সম্পন্ন হয় পৃথ্বিরাজ সংযুক্তার মিলন।

দিন কাটে। নতুন আশা আনন্দে ভরে ওঠে সংযুক্তার মন। সার্থক হয় সংযুক্তার মিলন স্বপ্ন।

ওদিকে অপমানে জর্জরিত জয়চাঁদের মনে শান্তি নেই। দিবানিশি প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হন। পৃথ্বিরাজকে উচিত শাস্তি দেবার আকাঙ্খায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

নিবৃত্ত হতে বলেন মন্ত্রী। রানী। গর্জন করে ওঠেন জয়চাঁদ।

বলেন, সংযুক্তা তাঁর কেউ নয়। যে কন্যা পিতার মুখে কলঙ্ক কালিমা লেপন করে শত্রুর কণ্ঠে বরমাল্য তুলে দেয় সুখের আশায়, সে কন্যা নয়। পৃথ্বিরাজ তাঁর শত্রু।

প্রতিশোধের নেশায় অন্ধ হয়ে পৃথ্বিরাজের রাজ্য আক্রমণের জন্যে আহ্বান জানান মহম্মদ ঘোরীকে। সুযোগ সন্ধানী মহম্মদ ঘোরী কালবিলম্ব না করে এগিয়ে আসে। আক্রমণ করে পৃথ্বিরাজের রাজ্য।

বেজে ওঠে রণ দামামা। সংযুক্তা নিজের হাতে রণ সাজে সজ্জিত করে দেয় স্বামীকে। সংযুক্তার কাছে বিদায় নিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করেন পৃথ্বিরাজ। হাসিমুখে স্বামীকে বিদায় দেয় সংযুক্তা।

প্রাসাদ শীর্ষে দাঁড়িয়ে স্বামীর যাত্রাপথের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে সংযুক্তা। মনটা আকুল কান্নায় কেঁদে উঠতে চায়। অশ্রুতে ভরে উঠতে চায় আঁখিদ্বয়। নিজেকে সংযত করে, স্বামীর

মঙ্গল প্রার্থনা করে সংযুক্তা।

দিন কাটে। ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দিন কাটে সংযুক্তার। নিত্য নতুন যুদ্ধের খবর আসে রাজধানীতে।

সংবাদ আসে একদিন। শেষ হয়েছে যুদ্ধ। তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে মহম্মদ ঘোরী। বিজয়ী পৃথ্বিরাজ ফিরে আসছেন রাজধানীতে।

কোলাহল জাগে পথে পথে। আলোকমালায় সজ্জিত হয় প্রতিটি গৃহ। পত্রপুষ্পে সুশোভিত রূপ ধারণ করে নগরের প্রতিটি পথঘাট। দ্বারে দ্বারে শোভা পায় মঙ্গল কলস।

বিজয়ী বীর ফিরে আসেন রাজধানীতে। পশ্চাতে উল্লাসমুখর সৈন্যদল। মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনিতে মুখর হয় বাতাস। বাদ্যকরদের হাতে নতুন সুর বাজে।

প্রাসাদে প্রবেশ করেন পৃথ্বিরাজ। সংযুক্তাকে খোঁজেন। সংবাদ পান দাসীর কাছে। প্রাসাদ শীর্ষে ওঠেন পৃথ্বিরাজ। দেখেন আকাশের পানে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

পদশব্দে ফিরে চায় সংযুক্তা। সহাস্য মুখে স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে। অজস্র ধারায় ঝরে পড়ে অশ্রু। দুরন্ত ঝর্ণা ধারার বেগে।

সংযুক্তাকে কাঁদতে দেখে বিস্মিত হন পৃথ্বিরাজ।

কি হয়েছে প্রিয়তমা ?

কিছু না মহারাজ।

তোমার আঁখিতে অশ্রু কেন !

বাঁধা মানছে না। আমার আঁখির অশ্রু রোধ করতে পারছি না।

কি দুঃখে তুমি···

দুঃখ নয় প্রিয়তম।

তবে ?

আনন্দে। এ আমার আনন্দাশ্রু।

গভীর আনন্দে সংযুক্তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরেন পৃথ্বিরাজ।

অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দেন সংযুক্তার অশ্রুসিক্ত স্নিগ্ধ শান্ত আনন্দোজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি।

আবার দিন কাটে।

আনন্দভরা দিনগুলি হালকা খুশীর হাওয়ায় ভেসে চলে শ্বেতশুভ্র হংসের মতো। সংযুক্তার মাঝে নতুন এক প্রাণ সঞ্চারের শুভ ঘোষণা জানা যায়। নতুন আনন্দের প্রদীপ জ্বলে সংযুক্তার আঁখিতে।

আশা, আনন্দে উজ্জ্বল সংযুক্তাকে বুকের মাঝে নিয়ে তারই মুখের পানে চেয়ে আনন্দে আত্মহারা প্রহরগুলি কাটান পৃথ্বিরাজ।

বাতাস বয়ে নিয়ে যায় বার্তা। অধীর আগ্রহে শুভদিনের প্রতীক্ষা করে নাগরিকরা। ঝড় ওঠে আনন্দসমুদ্রে। নিভে যায় দীপ। থেমে যায় আনন্দ কোলাহল। স্তব্ধ ব্যথায় মূক হয়ে যায় রাজধানী। এক বছর পরে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে দিল্লীর দিকে দুষ্ট রাহুর মতো আবার ছুটে আসছে মহম্মদ ঘোরী।

সংবাদ শুনে গর্জে ওঠেন পৃথ্বিরাজ।

এবারেও স্বামীকে নিজের হাতে রণসাজে সজ্জিত করে দেয় সংযুক্তা। প্রিয়তমা পত্নীকে বুকের মাঝে নিয়ে অধরে চুম্বন রেখা এঁকে দেন। বলেন—

এবার বিদায় দাও সংযুক্তা।

বিদায়। যেন গভীর নিদ্রা ভেঙে জেগে ওঠে সংযুক্তা।

হ্যাঁ প্রিয়তমা।

না প্রিয়তম বিদায় তোমাকে দিতে পারব না। ওকথা বোল না তুমি।

কেন প্রিয়তমা?

কেন জানি না; বিদায়ের কথায় প্রাণটা কেমন কেঁপে উঠলো আজ।

ও তোমার শরীরের দুর্বলতা।

বোধ হয় তাই। তাই যেন হয়। আর…

বল।

এবার যখন যুদ্ধজয় শেষে ফিরবে তুমি তখন আরো একজন স্বাগত জানাবে তোমাকে। মৃদু হাসেন পৃথ্বিরাজ। বলেন, প্রাসাদশীর্ষে গিয়ে

লুকিয়ে থাকবে না তো ?

না। এবার তাকে নিয়ে তোরণদ্বারে গিয়ে দাঁড়াবো আমি।

সত্যি !

সত্যি প্রিয়তম।

হাসি মুখে যুদ্ধযাত্রা করেন পৃথ্বিরাজ। তুরন্ত প্রতীক্ষা স্থুরু হয় সংযুক্তার।

দিনের পর দিন কাটে।

নিত্য নতুন সংবাদ আসে রাজধানীতে। প্রাসাদশীর্ষে উঠতে কষ্ট হয় সংযুক্তার। কারো নিষেধ না মেনে দাসীদের সাহায্যে প্রাসাদশীর্ষে ওঠে প্রতিদিন। তাকিয়ে থাকে দূরে বহুদূরে, পথের যেদিক থেকে তার বিজয়ী বীর স্বামী যুদ্ধজয়ের জয়মাল্য কণ্ঠে পরে ফিরবেন সংযুক্তার মনের বন্দরে।

সংবাদ আসে। পৃথ্বিরাজ নেই। তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে এবারে বিজয়ীয় সাদৃশ্য বরমাল্য পেয়েছে মহম্মদ ঘোরী। উল্কার বেগে দিল্লীর দিকে ছুটে আসছে সে।

সংবাদ শুনে কঠিন পাষাণে লুটিয়ে পড়েছিল সংযুক্তা। ঘুমিয়ে পড়েছিল চিরতরে। সে ঘুম কোনদিন আর ভাঙে নি।

আর আজ !

ভাবেন শিবাজী। আজ জয়চাঁদ নেই। আছেন জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ। দস্যু লুণ্ঠনকারী মহম্মদ ঘোরী নেই, আছেন বাদশাহ আলমগীর। কঠিন-কঠোর-কুটিল-হিংস্র।

হিন্দুর জাগরণে বাধা দেবার জন্যে আজ একের পর এক প্রস্তুত হয়ে আছে বাধার প্রাচীর। ভাই হয়ে ভাইয়ের মঙ্গল না চেয়ে অমঙ্গল কামনায় প্রস্তুত। বড় যুক্তি, বাদশাহের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জীবন থাকতে হিন্দু হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারবেন না কেউ।

নইলে অসম্ভব ছিল না দিল্লীর বাদশাহকে মসনদ থেকে নামিয়ে আনা। রাজস্থান যদি মোগলের বন্ধুত্বের বন্ধন কামনা না করে চাইতো দেশের স্বাধীনতা, তাহলে রাজপুতের জীবনে নেমে আসতো

না অমানিশার প্রগাঢ় তমসা। তা চায় নি রাজপুত। আকবর শাহ
আত্মীয়তার বন্ধনে রাজপুতকে বেঁধে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেছে।
কিন্তু শিবাজী তো রাজপুত নন। দেশের স্বাধীনতার কাছে কোন
প্রলোভনই তাঁর মনে স্থান পাবে না কোনদিন। ছলে বলে কৌশলে
যেমন ভাবে পারেন স্বাধীনতা তিনি নিয়ে আসবেন।

শিবাজী বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর তেমনি ভাবে বসে থাকে
মেহেরুন্নিসা।
শিবাজীর গম্ভীর দৃঢ়তাপূর্ণ প্রতিটি কথা মেহেরুন্নিসার মনে তরঙ্গ সৃষ্টি
করে। ভালমন্দ ন্যায় বিচারের শক্তি যেন ধীরে ধীরে জাগ্রত হতে
সুরু হয় মেহেরুন্নিসার অন্তরে।
নিজের উচ্ছৃঙ্খল পূর্ব জীবনের কথা মনে পড়ে। তীব্র একটা বিতৃষ্ণায়
ভরে যায় মনটা। নিজের প্রতি নিজের ঘৃণা জন্মে।
মনে পড়ে শিবাজীর প্রতি তার অবিচারের কথা। যাকে সে ছোট
ভেবে এতদিন ঘৃণা করেছে, আজ তাঁর বিরাট মনের পরিচয়ে
নিজের মনের কাছে নিজে অনেক ছোট হয়ে যায়। অন্তরে তার
দৈন্য দেখা দেয়।
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি নামে। মেহেরুন্নিসা বসে থাকে এক ভাবে।
শাহাজাদী। নীরা এসে ডাকে একসময়।
বল।
আহার্য প্রস্তুত।
আহারে আজ আমার ইচ্ছা নেই নীরা।
কিন্তু প্রভু জানতে পারলে দুঃখ পাবেন।
তাঁকে জানিও সত্যিই আজ আমার আহারের ইচ্ছা নেই।
শরীর অসুস্থ নাকি ?
কাছে এগিয়ে আসে নীরা। মেহেরুন্নিসাকে দেখে।
না শরীরতো ভালই। তবে ? তবু প্রশ্ন করে নীরা।
আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

আচ্ছা শাহাজাদী। চলে যাচ্ছিল নীরা।

শোন। মেহেরুন্নিসা ডাকে।

দাঁড়ায় নীরা। তাকায় মেহেরুন্নিসার মুখের পানে।

বলুন শাহাজাদী।

তুমি...

সুরা এনে দেব?

না, তুমি যাও।

চলে যায় নীরা। একটু অবাক হয় সুরার প্রতি শাহাজাদীর এই বৈরাগ্য দেখে। নীরা চলে যেতে উঠে প্রদীপ নিভিয়ে দেয় মেহেরুন্নিসা। অন্ধকারে ভরে যায় কক্ষ। বাতায়নের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকায় সীমা হীন অন্ধকার আকাশের দিকে। অজস্র তারার মালা হীরক খণ্ডের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে।

তাকায় সার সার পর্বতশ্রেণীর দিকে। নীরব কালো দৈত্যের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে পর্বতগুলো।

মনে পড়ে পিতার কথা। দিল্লীর কথা। অজস্র ছোট ছোট ঘটনা। মনে পড়ে রোশেনারাকে। কেন যে রোশেনারাকে হিংসা করতে আজ ভুলে যায় মেহেরুন্নিসা। কেন, বুঝতে পারে না।

॥ নয় ॥

দিল্লী ফিরে আসেন আওরঙজেব।

দরবারে বসেন নিয়মিত। স্থির ধৈর্যে পরিচালনা করেন প্রতিটি কাজ। আমীর ওমরাহদের সঙ্গে নানান বিষয়ে আলোচনা করেন। মতামত শোনেন তাঁদের, কিন্তু প্রতিটি কাজ নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করেন। কারো কোন পরামর্শ কানে তোলেন না।

জয়পুররাজ জয়সিংহকে পত্রযোগে সাক্ষাৎ করতে বলেন। মহারাষ্ট্র

অভিমুখে সসৈন্যে পাঠান সেনাপতি আজম খাঁকে। জয়সিংহ যাত্রা করেন পরে।

তাই হয়। সহস্র বাদশাহী সৈন্য নিয়ে সদম্ভে মহারাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করে সেনাপতি আজম খাঁ। গর্বে স্ফীত বুক আরো স্ফীত হয়ে ওঠে। শাহাজাদী উদ্ধার করে আরো উচ্চপদের আকাঙ্খা জাগে মনে। তাই দিনে রাত্রে বিশ্রাম না নিয়ে সৈন্য নিয়ে এগিয়ে চলে শিবাজীর ধ্বংসের আশায়।

মেহেরুন্নিসা হরণের সংবাদ যথাসাধ্য গোপন রাখতে চেয়েছিলেন আরওঙজেব। কঠিন আদেশ জানিয়েছিলেন সকলকে। কিছু প্রকাশ যেন না হয়।

কিন্তু সম্ভব হয় নি গোপন রাখা। প্রথম এগিয়ে এসেছিল রোশেনারা।

এ কি সত্যি দাদা ?

কি সত্যি ? অবাক হয়েছিলেন আওরঙজেব।

সামান্য একজন মহারাষ্ট্রীয় দস্যু শাহাজাদীকে হরণ করেছে ?

কোথায় শুনলে এ সংবাদ ?

সকলেই জানে।

কি ভাবে ? কঠিন ভাবে জানতে চেয়েছিলেন আওরঙজেব। কে প্রচার করল এ সংবাদ ?

বলতে পারবো না।

তুমি জানলে কোথায় ?

বাতাসে।

রোশেনারা। কঠিন কণ্ঠে ভগিনীর বাচালতায় বাধা দিয়েছিলেন আওরঙজেব।

চমকে উঠেছিল রোশেনারা। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, আমার এই অনাবশ্যক কৌতূহল ক্ষমা করবেন।

মনে থাকে যেন। বলেছিলেন আওরঙজেব।

থাকবে। কারণ আমার উত্তর আমি জেনেছি।

কি জেনেছ ?

সংবাদ মিথ্যা নয়, সত্য।

যদি বলি সংবাদ সত্য নয়, মিথ্যা।

বিশ্বাস করতে পারবো না।

কেন?

কারণ যা সত্য তাকে আপনি লুকোতে পারেন নি।

স্বীকার করলাম সংবাদ সত্য। কিন্তু যদি এই সংবাদ তোমার দ্বারা রটনা হয় তাহলে পরিত্রাণ পাবে না তুমি।

নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার দ্বারা এ সংবাদ রটনা হবে না। আমি শুধু সংবাদের সত্যতা জানতে এসেছিলাম।

তাতে তোমার লাভ?

লোকসানও কিছু নেই।

ভগ্নীর উত্তরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন আওরঙজেব। মৃদু হেসে বিদায় নিয়েছিল রোশেনারা।

নিস্ফল আক্রোশে অস্থিরভাবে পদচারণা সুরু করেছিলেন আওরঙ-জেব। তিনি চান নি শাহাজাদী সম্বন্ধে কোন ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ুক। সাবধানতা অবলম্বন করা সত্বেও সমস্ত ঘটনা প্রকাশ হয়ে গেছে। বোধহয় অতি রঞ্জিত হয়ে ফিরছে মুখে মুখে। তার প্রমাণ তিনি ভগিনীর কাছে পেয়েছেন।

বিচিত্র চরিত্রা তাঁর এই ভগিনী। নাগিনীর মতো ভীষণা। এর কাছ থেকে কন্যাকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন চরিত্রের সংশোধন।

সম্ভব হল না তা। শিবাজী হরণ করল। বুঝি নিদারুণ কষ্টের মাঝে দিন কাটছে মেহেরুন্নিসার। রাজ ঐশ্বর্যের মাঝে যে লালিত পালিত, হয়তো সামান্য আহারে সে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছে। শত অত্যাচার সহ্য করছে কোমল অঙ্গে।

চঞ্চল হয়ে ওঠেন আওরঙজেব। কঠিন প্রতিজ্ঞায় জ্বলে ওঠে দুই চোখ।

পুত্র আকবর আসে সাক্ষাৎ করতে।

পিতা।

এসো পুত্র।

সত্যই কি শিবাজী ভগিনী মেহেরুন্নিসাকে হরণ করেছে?

সত্য পুত্র।

আপনি···

কি পুত্র।

আপনি তার উদ্ধারের উপায় না করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন এতে আমি বিস্মিত হয়েছি। এর কারণ কি পিতা?

কারণ আছে পুত্র।

কি কারণ পিতা?

কারণ মহারাষ্ট্র দেশ পর্বত সঙ্কুল। শিবাজী পার্বতীয় যুদ্ধে দক্ষ। সে কখনও সম্মুখ যুদ্ধে এগিয়ে না এসে, তার মাওলী সেনাদল নিয়ে অতর্কিতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার সঙ্গের পর্বত যুদ্ধে অনভিজ্ঞ সৈন্যদের দ্বারা শিবাজীকে পরাজিত করা সম্ভব হ'ত না। তাই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি আমি।

কিন্তু পিতা···

বল পুত্র।

শিবাজী যদি ভগিনীর কোন···

না পুত্র। শিবাজী হিন্দু। বিধর্মী হলেও কোন হিন্দু নারীর ওপর অত্যাচার করবে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবে তোমার ভগিনী যদি অবিবেচিকার মতো কোন কাজ করে, তাহলে তাকে লাঞ্ছিতা হতে হবে। সে বুদ্ধিমতী, আশা করি তেমন কাজ সে করবে না।

পিতার কথা শুনে সহসা কোন কথা বলতে সাহসী হয় না শাহাজাদা আকবর। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

আওরঙজেব আপন চিন্তায় ডুব দেন।

পিতা! এক সময় আস্তে আস্তে ডাকে আকবর।

বল পুত্র। পুত্রের মুখের পানে তাকান বাদশাহ।

আমি একটি বিষয়ে আপনার অনুমতি চাই।

তোমার কথা বল।

আমি মহারাজ জয়সিংহের সঙ্গে মহারাষ্ট্র যাত্রা করতে চাই।

একটু চুপ করে থাকেন আওরঙজেব। পুত্রের প্রার্থনা শুনে নীরবে চিন্তা করেন।

পিতা।

অনুমতি দিলাম। তবে তোমাকেও একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

বলুন পিতা।

মহারাজ জয়সিংহের সমস্ত আদেশ তুমি পালন করবে।

অন্যায় হলেও?

হ্যাঁ। কারণ মাত্র ক'বছর পূর্বে লক্ষৌতে যে কীর্তি তুমি করে এসেছিলে তা অন্যে ভুললেও আমি ভুলি নি। তাছাড়া তাঁর কাছে যা ন্যায় তোমার কাছে তা অন্যায় বলে মনে হতে পারে।

তাই হবে পিতা। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর দেয় আকবর।

একসময় পিতার কাছে বিদায় নিয়ে চলে যায় আকবর। মনে মনে চিন্তা করে, কি প্রয়োজন ছিল জয়সিংহের সঙ্গে মহারাষ্ট্র যাত্রার কথা পিতাকে বলা।

মাত্র বছর খানেক কি তারও কিছু পূর্বে লক্ষৌতে যে কাজ সে করিয়েছিল তাকি খুব অন্যায় করেছিল। তা ছাড়া সে গোপন সংবাদ অন্যে জানতে পারে নি। জেনেছিল দস্যুরা মেয়েটির পিতাকে হত্যা করে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গেছে। কিছুদিন পরে মেয়েটিকে ছেড়েও দিয়েছিল। তবে?

না পিতার কাছে গোপন থাকে নি এ সংবাদ। তিনি যে কেমন করে এ সংবাদ জেনেছিলেন তিনিই বলতে পারেন। এর জন্যে কম লাঞ্ছনা দেন নি আকবরকে।

বসেছিলেন আওরঙজেব। কক্ষে এসে প্রবেশ করেন গোলাম খাঁ।

কি সংবাদ গোলাম খাঁ?

সংবাদ গুরুতর হুজুর।

কি হয়েছে?

হয় নি কি তাই বলুন হুজুর।

রহস্য রাখ গোলাম খাঁ।

রহস্য নয় হুজুর।

কি হয়েছে কি? বিরক্ত হন বাদশাহ।

আমাকে দিল্লী ছেড়ে চলে যেতে হবে হুজুর।

চলে যাবে তুমি?

হাঁ হুজুর।

কেন?

অজস্র প্রশ্নবাণ রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই হুজুর।

হ্যাঁ হুজুর। যে দেখে সেই প্রশ্ন করে শাহাজাদীর অপহরণের সংবাদ সত্য কিনা।

কি বলছ তুমি?

মৌন ব্রত অবলম্বন করেছি হুজুর।

কোন উত্তর দাও নি কাউকে?

না বললে মিথ্যা বলা হবে। বলছি সত্য মিথ্যা আল্লা জানেন।

শুনে কি বলেছে তারা?

বলেছে শাহাজাদী তাহলে সত্যই হরণ হয়েছেন।

তোমার উত্তরে তাই প্রকাশ পায়। এতক্ষণে বুঝলাম তুমিই এ সংবাদ প্রচার করেছ।

না হুজুর। আমি তা করি নি।

কিন্তু তোমার কথায় তাই প্রমাণ হচ্ছে।

কি করে সম্ভব বলুন। প্রশ্ন করেছে অন্যে আমি উত্তর দিয়েছি, কিন্তু বিনা প্রশ্নে তো আমি কারো কাছে কিছু বলি নি।

তুমি একটি মূর্খ গোলাম খাঁ।

হ্যাঁ হুজুর। আমি একটি হস্তি মুর্খ। তাই বলছি আমাকে বিদায় করুন।

তুমি যে কারণ বললে তাই কি সত্য?

আজ্ঞে···।

স্বীকার করি চতুর তুমি, কিন্তু তোমার চাতুরী আমার কাছে চলে না

তা তো তুমি জান। তবে সত্যই যদি তুমি যেতে চাও তাহলে তোমাকে আমি বাধা দেব না। যাবার আগে একটি কথা বলছি বন্ধু, তোমাকে আমি যত কটু কথাই বলি কিন্তু আমি জানি প্রকৃত বন্ধু তুমি আমার।

শেষের দিকে বাদশাহের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

একটু চুপ করে থাকে গোলাম খাঁ। মৃদু কণ্ঠে বলে, তা হলে যাওয়া এখন স্থগিত থাক হুজুর।

কক্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছিল গোলাম খাঁ।

জ্ঞানী পণ্ডিত গোলাম খাঁর জন্যে আওরঙজেবের দুঃখ হয়। গোলাম খাঁর সব গুণই আছে কিন্তু তা সত্বেও গুণের পুরস্কার সে পায় নি কোনদিন, তার সত্য ভাষণের জন্যে। যে সত্য প্রকাশ করলে নিজের ক্ষতি হতে পারে তা জেনেও প্রকাশ করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করে না। এর জন্যে মাঝে মাঝে কম লাঞ্জনা ভোগ করতে হয় না। তবু গোলাম খাঁর চরিত্রের পরিবর্তন হয় নি।

আওরঙজেব একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

আচ্ছা গোলাম খাঁ। তুমি যা বল চিন্তা করে বল? ভেবে দেখ কি তোমার কোন্ কথা বলা উচিৎ কি উচিৎ নয়।

দেখি হুজুর। উত্তর দিয়েছিল গোলাম খাঁ।

কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি যে কথা বলেছ সে কথাটা না বললে পারতে নাকি?

না হুজুর। সত্য বলেই কথাটি বলেছি।

সত্য হলেও অমন কথা মিথ্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর। অমন রূঢ় সত্যের জন্যে তোমার অনেক ক্ষতি হতে পারে তা কি তুমি ভেবে দেখ নি?

দেখেছি হুজুর।

তবে?

একটু চুপ করেছিল গোলাম খাঁ। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল।

লাভ ক্ষতি নিয়েই জগৎ হুজুর। আমার সত্য ভাষণের জন্যে ভীষণ ক্ষতি হতে পারে এ আমি জানি। কিন্তু হুজুর জীবনে ধর্ম বড় না

অধর্ম বড়? আপনি বলবেন ধর্ম বড়। কারণ আপনি ধর্মকে বড় করে দেখেন। সেই ধর্মকে রক্ষা করবার জন্যে আপনি পিতৃ পিতামহের কথা ভুলে নির্মম হাতে হিন্দুদের শোষণ করছেন। না এর জন্যে কোন দোষ আমি দেখি না কারণ আপনি হিন্দু পীড়ন করলেও করছেন ধর্মের জন্যে। আর আমি? আমি রূঢ় সত্য বলি আমার নিজধর্ম রক্ষার জন্যে। এতে যদি সর্বনাশ কারো হয় তাহলে তা নিজেরই হবে। ধর্ম রক্ষায় শত শত বিধর্মী ক্ষয়ের থেকে নিজের মৃত্যুই কি শ্রেয় নয় হুজুর।

না সেদিন গোলাম খাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি তিনি। উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। পেয়েছিলেন গোলাম খাঁর নতুন পরিচয়। বৃদ্ধ অবুঝ সেজে থাকলেও খাঁটি সোনা।

গোসলখানার শূন্য কক্ষে একাকী বসে থাকেন আওরঙজেব। নানান বিক্ষিপ্ত চিন্তার রাশি একের পর এক আসছে। সামান্য একটু তরঙ্গ সঞ্চার করে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

মেহেরুন্নিসার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তার সুন্দর মুখখানি। শত কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত হলেও মেহেরুন্নিসার মুখখানি শিশির স্নিগ্ধ সদ্য ফোটা ফুলের মতই নির্মল।

মনে পড়ে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা। সুন্দরী বিদুষী কন্যা তাঁর। কলঙ্কের কালিমা তাকেও স্পর্শ না করে পারে নি। জেবুন্নিসাকে তাই তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

শিবাজীর আশ্রয়ে হয়তো পরিবর্তন আসতে পারে মেহেরুন্নিসার মনে। নিজের চিন্তাধারায় চমকে ওঠেন তিনি। একি ভাবছেন তিনি। একি অসম্ভব চিন্তা তাঁর।

না-না এমন পরিবর্তন তিনি চান না। মেহেরুন্নিসার জীবনে কোন পরিবর্তন যেন না আসে শিবাজীর কাছে। উদ্যত ফণা ভুজঙ্গিনীর মতই থাকে যেন তাঁর কন্যা। কোন পরিবর্তন তিনি চান না। না-না-না।

চিৎকার করে ওঠেন আওরঙজেব।

ছুটে আসে গোলাম খাঁ।

হুজুর, হুজুর।

হ্যাঁ।

কি হ'ল হুজুর?

কার কি হল!

আপনার।

কি হয়েছে আমার? অবাক প্রশ্ন করেন বাদশাহ।

দ্বারের কাছে এসেছি হঠাৎ না না বলে চিৎকার করে উঠলেন আপনি।

আমি!

হ্যাঁ হুজুর।

কি জানি ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।

হুজুরের তবিয়ৎ কি ঠিক নেই?

না গোলাম খাঁ আমি ভালই আছি। তবে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শাহাজাদীর জন্যে আমি বড় চিন্তিত গোলাম খাঁ। সেই দস্যু না জানি তাকে কত কষ্ট দিচ্ছে। একটু চুপ করে থাকেন বাদশাহ। বলেন, তা যদি করে সে তাহলে কোনদিনই ক্ষমা পাবে না। সমস্ত মহারাষ্ট্র আমি ধ্বংস করে ফেলবো।

জ্বলে ওঠে বাদশাহের দুই চোখ। বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে গোলাম খাঁ।

রক্ষী এসে সেলাম করে দাঁড়ায়।

মহারাজ জয়সিংহ।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান আওরঙজেব। এগিয়ে যেতে গিয়েও বসে পড়েন।

মহারাজ জয়সিংহ আসেন। সেলাম জানান বাদশাহকে।

বসুন মহারাজ। বলেন বাদশাহ।

কি সংবাদ জাঁহাপনা! হঠাৎ এই অথর্ব বৃদ্ধকে জরুরী তলব? মৃদু হাসি মুখে বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করেন মহারাজ জয়সিংহ।

প্রয়োজন আছে মহারাজ। সৈন্যসহ আগমন করেছেন তো?

বিনা সৈন্যে জাঁহাপনা কোনদিন তলব করেন নি। সৈন্য হীন

জয়সিংহের কানাকড়ি মূল্য নেই জাঁহাপনার কাছে।

এ কথা সত্য নয় মহারাজ। আওরঙজেব সৈন্য হীন মহারাজা জয়সিংহের বন্ধুত্বই কামনা করেন। কিন্তু আওরঙজেবের সংকট সৈন্য হীন জয়সিংহের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয় বলেই বার বার মহারাজকে বিরক্ত করতে আওরঙজেব নিরুপায় হতে বাধ্য হন। অবশ্য এর জন্যে যদি মহারাজের মনে কোন দুঃখ থাকে সে দুঃখ আওরঙজেব নিশ্চয়ই দূর করবেন।

বাদশাহ আলমগীরের কৃপায় জয়সিংহের কোন দুঃখই নেই, সে বিষয়ে আপনি পরম নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন জাঁহাপনা।

তবে গভীর নিদ্রাবশে নয়।

জাঁহাপনার মর্জি। মৃদু হাসেন জয়সিংহ। কি জন্যে আমাকে তলব করেছেন জাঁহাপনা।

শাহাজাদী মেহেরুন্নিসা হরণ হয়েছে মহারাজ।

কার এত দুঃসাহস হ'ল জাঁহাপনা ?

শিবাজীর।

তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

এর অর্থ ?

আওরঙজেবের কথায় তাঁর দিকে তাকান জয়সিংহ। ধীর কণ্ঠে বলেন যে দুরন্ত কিশোর ছেলে খেলার মধ্যে রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্নকে সার্থক করেছে কালে, তার পক্ষে শাহাজাদীকে অপহরণ করা অসম্ভব নয় জাঁহাপনা।

আপনি কি বলছেন মহারাজ।

কেন জাঁহাপনা ?

কি করে একজন দস্যুকে সমর্থন করছেন ?

দস্যু ! শিবাজী যদি দস্যু হয় তার রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে আপনি যদি দস্যুতার চিহ্ন মনে করেন তাহলে আজকের ভারতব্যাপী মোগল সাম্রাজ্যও তো দস্যুতার ফল জাঁহাপনা। শুধু মোগল সাম্রাজ্যই বা কেন অপরের রাজ্য বলে অধিকার করে নেওয়াই তো দস্যুতা।

কিন্তু মহারাজ আপনার মতো জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি শিবাজীর নীতির সমর্থন কি করে করেন আমি ভেবে পাই না।

শিবাজীর নীতি হীন নয় জাঁহাপনা। ধর্ম রক্ষার জন্যে যে বীর সংগ্রাম করছেন তিনি আমার নমস্য। কারণ আমি হিন্দু। হিন্দুর প্রতি হিন্দুর পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক।

তা হলে কি বুঝবো…

না জাঁহাপনা। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি। শিবাজীর কাজের যত সমর্থনই আমি করি না কার্যক্ষেত্রে তার প্রতি আমার কোন দুর্বলতা নেই।

আমি বিশ্বাস করি মহারাজ। একটু চুপ করে কি যেন চিন্তা করেন বাদশাহ। ডাকেন—

মহারাজ।

বলুন জাঁহাপনা।

আপনার কি বিশ্বাস হয় রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হবে শিবাজী ?

না জাঁহাপনা। শিবাজীর যুদ্ধ নীতির সমর্থন আমি করি না। অতর্কিত আক্রমণে দুর্গ জয় সম্ভব হলেও সম্মুখ যুদ্ধে শিবাজী অনভিজ্ঞ। তার সেনারা সম্মুখ যুদ্ধে কোনদিনই জয়লাভ করতে পারবে না। তবে—।

বলুন মহারাজ।

প্রবল শক্তিশালী শিবাজী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বহু অনুচর তার অধীনে। অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলা শিবাজীর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

শাহাজাদীকে উদ্ধারের কি করবেন আপনি ?

কালই আমি মহারাষ্ট্র যাত্রা করবো জাঁহাপনা। যদি সম্ভব হয় ধ্বংস করবো শিবাজীকে।

মহারাজ।

সত্য জাঁহাপনা, জয়সিংহ মিথ্যা দম্ভ করে না। তবে যদি কোন কারণে শিবাজীকে ধৃত করা সম্ভব না হয়ে ওঠে তা হলে অনুমতি দিলে সন্ধি করতে পারি এবং শিবাজীর সহায়তায় বিজাপুর জয় করা

সম্ভব হয়ে উঠবে।

মহারাজ জয়সিংহ যদি তাই মনে করেন করবেন।

বাদশাহের কথায় জয়সিংহ বুঝতে পারেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী কুটিল বাদশাহের মনে তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে। তাঁর শিবাজী প্রীতি তিনি পছন্দ করেন নি।

এই প্রথম নয়। জয়সিংহ জানেন বাদশাহ আলমগীর তাঁকে সন্দেহ করেন। মনে প্রাণে চান তাঁর ধ্বংস। কিন্তু নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ আওরঙজেব জানেন জয়সিংহের রাজপুত সৈন্য ব্যতীত কঠিন যুদ্ধ জয় আলমগীরের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু দিবারাত্র বুকের মাঝে তীক্ষ্ণ বিষের ছুরিকা শানান। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে জয়সিংহের বুকে বসিয়ে দিতে দ্বিধা করবেন না।

সব জানেন জয়সিংহ। তবু এই বাঁধন কাটাতে তিনি পারেন না।

কঠিন প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিনি।

যতদিন জীবিত থাকবেন মোগলের গোলামী করেই কাটাতে হবে তাঁর জীবন। এর থেকে নিষ্কৃতি নেই তাঁর।

নেই মুক্তি।

॥ দশ ॥

মৃদু অনুচ্চকণ্ঠের সঙ্গীতের সুরে ঘুমটা ভেঙে যায়।

শয্যার ওপর উঠে বসে মণিবাঈ।

কান পেতে শোনে মণিবাঈ। ভুল নয়। সত্যি কে যেন গান গাইছে। কে গান গায় এই নীরব নিস্তব্ধ বাড়িতে! গভীর রাত্রির অন্ধকারে অবাক হয় মণিবাঈ। সঙ্গীতের সঙ্গে মৃদু নূপুরের ধ্বনি ভেসে আসে। রিণি-ঝিনি—রিণি-ঝিনি।

বাতাসী ও বাতাসী। দাসীকে ডাকে মণিবাঈ।

কি মা ?

ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে বাতাসী।

কে গান গাইছে বল তো ?

গান !

হ্যাঁরে।

নৃত্য সঙ্গীত ওধারে বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুই শুনতে পায় না বাতাসী।

কই মা কিছু তো শোনা যাচ্ছে না ?

কিন্তু একটু আগে স্পষ্ট আমি নারী কণ্ঠের গান শুনেছি।

তুমি ঠিক শুনেছ তো ?

হ্যাঁরে।

অবাক হয় বাতাসী। মণির কথাগুলো ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না বলে।

তুমি শুয়ে পড় মা।

শুয়ে পড়বো।

হ্যাঁ শুয়ে পড়।

কিন্তু…

কি ?

ওই মেয়েটা।

সাহিরা !

হ্যাঁ। একবার চুপ চাপ দেখে আয় তো।

ওঠে বাতাসী। নিঃশব্দে উঠে পাশের ঘর থেকে ঘুরে আসে।

কি রে ? জিজ্ঞাসা করে মণি।

ঘুমুচ্ছে।

তুই ঠিক দেখেছিস ?

গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি। তুমি শুয়ে পড়। অনেক রাত হ'ল।

শুয়ে পড়ে মণি। বাতাসীও।

কিন্তু ঘুম আসে না মণিবাঈয়ের চোখে। ঘুরে ফিরে সেই একই চিন্তায় ফিরে যায় মন। কে গান গায় ! কে নাচে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে।

গানের সুর মণিবাঈ শুনেছে। নৃত্য ছন্দ মণিবাঈ উপলব্ধি করেছে। বুঝেছে যেই গান গেয়ে থাক নেহাৎ অনভিজ্ঞা এ বিষয়ে। সুর আছে তার কণ্ঠে। ছন্দ আছে তার চরণে।

কিন্তু কে সে ?

অস্থির হয়ে ওঠে মণিবাঈ। বার বার নিজের মনে প্রশ্ন করে। কে সে ? চুপ করে শুয়ে থাকে মণিবাঈ। সে সুর শোনার আশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে অন্তর। কিন্তু গানের সুর আর শোনা যায় না।

অনিদ্রিত চোখে শয্যায় চুপ করে শুয়ে থাকে মণিবাঈ।

তাকিয়ে থাকে অজস্র নক্ষত্রখচিত নীরব নিস্তব্ধ কালো আকাশটার দিকে।

মনে পড়ে অতীতকে। মণিবাঈকে।

রূপ আর রঙে ভরা উজ্জ্বল দিনগুলিকে।

রূপসী নটীর মেয়ে মণি। লক্ষ্ণৌর নাচওয়ালী পিয়ারীবাঈয়ের মেয়ে। যার জন্ম হয়েছিল সুরা আর সঙ্গীতের মাঝে মন দেওয়া নেওয়ায়। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের এক বিশ্বস্ত সেনাপতির ঔরষে।

না পিতৃ পরিচয়ে পরিচিত হয় নি মণি। রঙের ফানুস মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গিয়েছিল মণির জন্মদাতা পিতা। জন্ম হয়েছিল মণির। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে থাকা আর সম্ভব হয় নি পিয়ারীবাঈয়ের। লক্ষ্ণৌতে থাকতেও চায় নি পিয়ারীবাঈ। চলে এসেছিল দিল্লীতে। কণ্ঠ আর রূপের বেসাতি পেতেছিল দিল্লীর এই পল্লীতে। এখানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে বালিকা মণি। যৌবনে রূপে আর সঙ্গীতে প্রকাশ ঘটেছে মণিবাঈয়ের।

একদিন ভালবেসিছিল মণি। উদাসী বাওয়ারা এক তরুণকে। নীড়ের স্বপ্ন জেগেছিল মণির অন্তরে। স্বপ্ন জাগাতে চেয়েছিল তরুণটির মনে। পারে নি। ব্যর্থ হয়েছিল মণি।

তারপর।

না তার পরের কথা চিন্তা করতে পারে না মণি। কাল বৈশাখীর ঝড় উঠলো মণির ভাগ্যাকাশে। সে ঝড় মণির জীবনের গতি দিল

পাল্টে। দুরন্ত শোকের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে। একদিন শয্যা গ্রহণ করলো মণি।

কেন? না মণি এই কেনর উত্তর জানে না। জানে শুধু বাঈজী হলেও সে মা। সন্তান হারা অভাগিনী জননী সে।

সদ্যজাতা শিশুটিকে কারা যেন এসে সে রাত্রে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের কিছুই বলে নি সে। কোন বাধা দেয় নি।

না কিছু বলে নি মণি। বলতে পারে নি। প্রয়োজন হয় নি বলার। অপরাধের শাস্তি সে পেয়েছে তার ব্যাধি বিকৃত শরীরে। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। কোথায় পালিয়ে যায় কেউ সন্ধান পায় না তার।

ফিরে আসে একদিন। অপরাধীর মতো তাকিয়ে থাকে মণির মুখের দিকে। নীরবে।

এইভাবে দিন কাটছে মণির। ব্যর্থতার হাহাকার বুকে নিয়ে দিন গুণে চলেছে মৃত্যুর। অনেক মূল্য দিয়েছে। আর নয়।

শান্তি চায় মণি। চায় চিরনিদ্রার কোলে নিশ্চিন্ত একটু আশ্রয়।

দিনের পর দিন।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে মণি। শুনেছে সেই অনুচ্চ নারী কণ্ঠের সঙ্গীত। নিজ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনে অস্থির হয়ে উঠেছে মণি।

ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে বাতাসীকে। শুনতে বলেছে। অবাক হয়েছে বৃদ্ধা বাতাসী। কিছুই শুনতে পায় নি সে।

ক্রমে সন্দেহটা মনের মধ্যে ঘনীভূত হয়েছে মণির। নিদ্রিতা সাহিরার নিদ্রাকে বিশ্বাস কবতে পারে নি। বলেছে।

তুই ঠিক দেখেছিস বাতাসী?

হ্যাঁ মা।

আমি বলছি ও ঘুমোয় নি।

সে কি করে সম্ভব, আমি দেখে এলুম যে।

বুকে হাত দিয়ে দেখেছিস ?

দেখেছি মা।

কি দেখেছিস ?

মানুষ গভীর ঘুমে অচেতন থাকলে যেমন হয়।

কথা বলে নি মণি। বিশ্বাস করতে পারে নি বাতাসীর কথা। বুড়ি হয়েছে বাতাসী। ভুল করেছে নিশ্চয়ই ও।

জেগে কেটেছে মণির রাত্রির পর রাত্রি। অনিদ্রিত চোখে চুপ করে শুয়ে থেকেছে শয্যায়। শোনা যায় নি গানের সুর। ব্যর্থ হয়েছে শুধু প্রহর গোনা।

সাহিরাকে একদিন কাছে ডেকেছে মণিবাঈ।

বেটী।

কাছে এসেছে সাহিরা। নীরবে তাকিয়ে থেকেছে মুখের দিকে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

কি কথা।

রাত্রে গান শুনেছিস কোন দিন।

গান। চমকে উঠেছে সাহিরা।

হ্যাঁ। গভীর রাতে কে যেন গান গায়!

শুনি নি তো।

সাহিরার কথা বিশ্বাস করতে পারে নি মণি। ও যদি নাই জানে তাহলে তার কথা শুনে কেঁপে উঠলো কেন ওর চোখের পাতা।

বেটী।

কি ?

সত্যিই তুই কোনদিন গান শুনতে পাস নি ?

না তো।

তবু বিশ্বাস করতে পারে নি মণি। মন বলেছে, ও নিশ্চই জানে। নিশ্চই জানে ও।

ফিরেছে খুদা মিয়া। তাকে জানিয়েছে সব কথা।

রাত্রি কেটেছে জেগে। কিছুই শোনা যায় নি।

না কেউ গান গায় না। তুমি ভুল শুনেছ।

ভুল ?

হ্যাঁ ভুল। মনের ভুল তোমার।

চুপ করে থেকেছে মণি। মনে মনে ভেবেছে, হয়তো এ তার মনের ভুল।

কিন্তু আবার একদিন গভীর রাতে শোনা গেছে সেই গান। চঞ্চল হয়ে উঠেছে মণিবাঈ। কাউকে আর কিছু জানায় নি।

রাতের পর রাত শয্যায় শুয়ে সেই অশরীরি কণ্ঠের গান শুনেছে মণিবাঈ।

আজ আবার গানের সুরে ঘুমটা ভেঙে যায় মণিবাঈয়ের।

শয্যার উপর কষ্টে উঠে বসে। কান পেতে শোনে।

নৃত্যের ছন্দে বেজে চলে নূপুর। রিণি ঝিনি—রিণি ঝিনি।

আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে মণিবাঈ। ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। অসুস্থ শরীরটাকে সামলে নেয়। থর থর করে কাঁপে সারা শরীরটা। ঘুরে ওঠে মাথা। তবু জোর করে বাইরে এসে দাঁড়ায় মণি।

নিকষ কালো আঁধারে ভরা আকাশ। অজস্র তারার দেওয়ালী ঝিক্‌মিক্ করছে।

গানের সুর এসে কানে বাজে।

অতিকষ্টে এগিয়ে চলে মণিবাঈ। এক সময় এসে দাঁড়ায় সাহিরার ঘরের সামনে।

চমকে ওঠে মণিবাঈ! সাহিরাই তাহলে গান গায়। জ্বলে ওঠে দুই চোখ। তবে মিথ্যা কথা বলল কেন সাহিরা!

আস্তে আস্তে দ্বারে চাপ দেয় মণি। খুলে যায় দ্বার।

নাচছে সাহিরা।

স্থাণুর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মণি।

রিণি ঝিনি—রিণি ঝিণি। একভাবে নৃত্যের ছন্দে ছন্দে বেজে চলে নূপুর।

হচ্ছে না। তাল ভুল হতেই বলে ওঠে মণি।

থেমে যায় নাচ। থর থর করে কেঁপে ওঠে সাহিরা।
ভুল হচ্ছে। এমনি হবে।
নিজের অবস্থার কথা ভুলে এগিয়ে যায় মণিবাঈ। মৃত্যু আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে।
ছুটে এসে তুলে ধরে সাহিরা।
অসহ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান হারায় মণিবাঈ।
সাহিরার চিৎকারে ছুটে আসে বাতাসী।

এক সময় জ্ঞান ফিরে আসে মণিবাঈয়ের। চোখ মেলে চায়। নীরবে কাকে যেন খোঁজে। পায় না।
কিছু বলবে? জিজ্ঞাসা করে বাতাসী।
সে কোথা?
কে?
সাহিরা।
তাকে দূর হয়ে যেতে বলেছি।
কেন?
কেন কি। ও আপদ বিদেয় না করলে…
বাতাসী। চিৎকার করে উঠতে চায় মণিবাঈ। ডাকে তাকে। আমার কাছে ডেকে আন।
উঠে যায় বাতাসী। বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল সাহিরা।
আকাশের অন্ধকার ফিকে হচ্ছে। আলো ফুটছে আস্তে আস্তে।
এবার তাকে যেতে হবে। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জানে না! তবু তাকে যেতে হবে। এখানে তার দিন শেষ হয়েছে।
অশ্রুতে ভরে ওঠে সাহিরার দুটি চোখ। দোষ তারই। সেই নিজে নিজের সর্বনাশ করেছে। আর নয়। এবার সে আর কারো আশ্রয়ে গিয়ে উঠবে না। পথে নামবে। ভাগ্য যে দিকে নিয়ে যায় সেই দিকেই যাবে সে।
বাতাসী গিয়ে ডাকে। অবাক হয়।

ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢোকে সাহিরা। বুক কাঁপে।
বেটী। মৃদু কণ্ঠে ডাকে মণিবাঈ।
চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সাহিরা। সাড়া দেয় না।
আয়। আমার কাছে আয়।
কাছে যায় সাহিরা। নতমুখে গিয়ে দাঁড়ায়।
আয় বোন, আমার কাছে আয়।
মণিবাঈয়ের স্নেহ মাখা কণ্ঠস্বরে মুখের দিকে তাকায় সাহিরা।
আয় বেটী।
নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না সাহিরা ; মণিবাঈয়ের পাশে বসে দুরন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে।
না না হচ্ছে না। ভুল হচ্ছে বেটী। চিৎকার করে ওঠে মণিবাঈ। রাগ করে। ভুল সংশোধন করে দেয় সাহিরার। ও ভাবে পা ফেললে তাল কেটে যাবে। কিন্তু উঠে দেখিয়ে দেবার সামর্থ হয় না। অসহায় ভাবে শুয়ে শুয়েই নাচের নির্দেশ দেয় সাহিরাকে। নে এ ভাবে পা ফেল। ঠিক। হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে এবার।
যতটা পারে মণিবাঈয়ের কথা মতো নাচে সাহিরা। ভুল হয়। আবার চিৎকার করে ওঠে মণিবাঈ। না না হচ্ছে না।
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সাহিরা। পরিশ্রমে ক্লান্ত।
নে সুরু কর। হ্যাঁ ঠিক। ঠিক আছে। কাঁপা তর্জনী কাঁপা। ভয়ের ভঙ্গী কর বেটী। ভয়ের ভঙ্গীটা ফুটিয়ে তোল। পেছিয়ে যা একটু। হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক হচ্ছে।
মণিবাঈয়ের ভাঙা হাটে আবার বসে নৃত্যের আসর। আতর আর গোলাপের সুগন্ধে উতলা হয় না বাতাস। জ্বলে না ঝাড় বাতি। দিনের সূর্যের আলোয় চলে সাহিরার নৃত্য শিক্ষা। অসুস্থ মণিবাঈ বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার সব শিক্ষা সাহিরার মাঝে ঢেলে দেয়।
সংবাদ পেয়ে বহুদিন পরে সারেঙ্গী হাতে মৃত্যু পুরীটায় এসে প্রবেশ করে মণির মায়ের আমলের সারেঙ্গী বাদক বৃদ্ধ শের খাঁ। অবাক হয়ে প্রশ্ন করে বৃদ্ধ। আবার নাচবে বেটী?

না চাচা।

তবে ?

সাহিরাকে কাছে ডাকে মণি। বলে, এবার এ নাচবে চাচা। আমার বেটী।

অবাক বিস্ময়ে সাহিরার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ।

চাচা।

এঁ্যা!

কি দেখছ ?

কৌন এ ?

কেন ?

নিজেকে সামলে নেয় বৃদ্ধ। বলে, একে কোথায় পেলে বেটী। এ যে আসমানের চাঁদ।

ও আপনি এসেছে চাচা। ও নাচবে।

কেন ?

এই প্রশ্ন মণিও সাহিরাকে করেছিল।

এ ইচ্ছে কেন তোর বেটী। কেন নটী হবি ?

উত্তর দিতে পারে নি সাহিরা।

বেটী। মৃত্থ কণ্ঠে ডেকেছিল মণিবাঈ।

মণিবাঈয়ের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল সাহিরা।

নটীর জীবন বড় দুঃখের বেটী। সাধ করে এই দুঃখ জীবনে তুই ডেকে আনিস নি। কেউ নেই আমার। আমার বেটীর মতো তুই থাক আমার কাছে।

কিন্তু...

বল বেটী। কোন লজ্জা কোন সংকোচ করিস নি। বল আমাকে। তোর সব কথা আমাকে তুই বল বেটী।

বলেছিল সাহিরা। কিছুই গোপন না করে। স্তব্ধ হয়ে শুনেছিল মণিবাঈ। বিশ্বাস করতে পারে নি। মনে হয়েছিল সাহিরা যা বলছে সত্যি নয়। গল্প। মনের কল্পনা মাত্র।

সব সত্যি বেটী।

সাহিরা থামতে ব্যাকুল প্রশ্ন করেছিল মণিবাঈ।

সব সত্যি। আমি এতটুকু মিথ্যে বলি নি।

তবু...

নটীর জীবন কি হারেমের বাঁদীর জীবনের থেকে বেশি দুঃখের, বেশি লজ্জার?

এর উত্তর আমি দিতে পারবো না বেটী। তবু আবার আমি বলছি তুই ভেবে দেখ।

আমি অনেক ভেবেছি। এ ছাড়া অন্য পথ আমার নেই।

কিন্তু ও পথে না গিয়েও তুই বাঁচতে পারিস। তোর জীবনটাকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারিস। ভরিয়ে দিতে পারিস ছোট্ট একটা নীড়।

না পারি না। বাঁচলেও সে বাঁচা মৃত্যুর নামান্তর।

তা হলে?

নটী হব আমি। সুর আর সুরায় তুলবো তুফান। সেই আগুনে দগ্ধ করে দেব আমার পিতৃ হত্যাকারীকে।

মনে মনে হেসে উঠেছিল মণিবাঈ। পারবি না। তোর এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞা কোনদিনই সফল হবে না। যার ওপর প্রতিশোধ নেবার আশায় আজ হচ্ছিস নটী, সে হয়তো কোনদিনই তোর দিকে ফিরে চাইবে না। যদিও কোনদিন তোকে তলব করে, তা হলে তোর রূপ যৌবন বিকিয়ে দিয়ে মাত্র কয়েক মুঠো আসরফি নিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হবি। আর ব্যর্থ প্রতিশোধের যন্ত্রণায় ভরিয়ে তুলবি শুধু জীনটাকে।

মুখে কোন কথা বলে নি মণিবাঈ। পাগল মেয়েটার মনের অসম্ভব ইচ্ছেটার রূপ দিতে চেষ্টা করেছিল বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

একদিন সংবাদ দিয়েছিল সারেঙ্গী বাদক শের খাঁকে। এসেছিল বৃদ্ধ। সাহিরাকে দেখে অবাক হয়েছিল। অবাক প্রশ্ন করেছিল, কেন নটী হতে চায় এই মেয়ে। কেন?

আমার জন্যে।

তোমার জন্যে।

হ্যাঁ চাচা। ঘরাণাকে বাঁচাবার জন্যে।

কথা বলে নি বৃদ্ধ। মণিবাঈয়ের মুখের দিকে অর্থহীন দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে ছিল।

সংবাদ গিয়েছিল তবলচী শান্তাপ্রসাদের কাছে। শান্তাপ্রসাদ আসে নি এসেছিল তার ছেলে। ছন্নছাড়া একটা বাউণ্ডুলে মূর্তি।

কি চাই?

আজ্ঞে···

কোথা থেকে আসছো।

মথুরা থেকে।

কে পাঠিয়েছে?

শান্তাপ্রসাদ আমার বাবা।

পণ্ডিতজী।

হ্যাঁ।

তিনি কোথা?

বাবা মারা গেছেন।

ওঃ। একটু চুপ করেছিল মণিবাঈ। ভালো বাজাতে পারো?

না।

তাহলে এসেছ কেন?

বাবা মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন যদি আপনি কোনদিন সংবাদ দেন তাহলে আমি যেন আসি।

তাই এসেছ তুমি?

হ্যাঁ।

বাজাতে যখন জান না তখন কষ্ট করে না এলেই পারতে।

তা হলে চলে যাই?

হ্যাঁ। তোমাকে আমার কোন কাজে লাগবে না।

সূর্যকে বিদায় দিয়েছিল মণিবাঈ। চলে যাচ্ছিল ছেলেটা।

বেটা। ডেকেছিল শের খাঁ।

চাচা।

একবার দেখলে হতো না?

শুনলে তো ও নিজেই বললে ভালো বাজাতে জানে না।

তবু একবার দেখি।

ছেলেটাকে ডেকেছিল মণিবাঈ।

নাচের সঙ্গে বাজাতে পারবে?

বাজাই নি কোনদিন।

তবে?

উত্তর দেয় নি সূর্য। চুপ করে ছিল।

শের খাঁর পরামর্শে ডাকা হয়েছিল সাহিরাকে।

বলেছিল মণিবাঈ, বেটী এ নতুন তবলচী। একটা সহজ নাচ নাচ তো। দেখি বাজাতে জানে কি না।

সূর্যপ্রসাদের দিকে তাকিয়েছিল সাহিরা। নোংরা মূর্তিটিকে দেখে কেন যেন একটা অবজ্ঞার ভাব জেগেছিল সাহিরার মনে।

সারেঙ্গীতে সুর তুলেছিল বৃদ্ধ শের খাঁ। বেজেছিল সাহিরার পায়ের নূপুর। রিণি-ঝিনি—রিণি-ঝিনি। রিণিকি-ঝিনিকি-ঝিনি-ঝিনি।

না। ছেলেটাকে জব্দ করবার জন্যে সহজ নাচ নাচে নি।

তবলায় বোল তুলেছিল ছেলেটা। ঝড়ের গতিতে সাহিরার নাচের তালে তাল দিয়েছিল।

অস্থির হয়ে উঠেছিল সাহিরা। ক্লান্ত হয়ে থেমেছিল একসময়।

সাবাস বেটা, সাবাস। আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল বৃদ্ধ।

মণিবাঈও অবাক হয়েছিল। বড় সুন্দর খাসা হাত। কিন্তু কেন যে বলেছিল ভাল বাজাতে পারে না এতক্ষণে বুঝেছিল মণিবাঈ।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল সাহিরার মুখ। পরাজয়ের গ্লানিতে ভরে গিয়েছিল মনটা। বাউণ্ডুলে মূর্তিটার ওপর রাগ হয়েছিল।

কি নাম তোমার?

সূর্যপ্রসাদ।

তুমি থাকো।

এর থেকে ভাল বাজাতে পারি না কিন্তু।

পারবে। আরো ভাল বাজাতে পারবে। হেসেছিল মণিবাঈ। বাতাসীকে ডেকে সূর্যর থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিল। ডেকেছিল সাহিরাকে।

বেটী।

বলুন।

আরো খাটতে হবে তোকে। দম বড় অল্প তোর। অত সহজে হাঁফিয়ে উঠলে তো চলবে না।

মাথা নীচু করে মণিবাঈয়ের কথাগুলো মেনে নিয়েছিল সাহিরা।

দিনের পর দিন চলে অনুশীলন। ঝড়ের গতিতে নৃত্যের তালে বেজে চলে সূর্যের হাতে তবলা। অবাক হয় বৃদ্ধ শের খাঁ। পরাজিত হয় সাহিরা। প্রতিদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ছুটে গিয়ে ঘরে বিছানায় লুটিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সাহিরা।

প্রতিজ্ঞা করে মনে মনে। আর নয়। আর হার মানবে না সে। কিন্তু প্রতিদিনই তার ভাগ্যে ঘটে পরাজয়।

অবাক হয়ে বসে থাকে সূর্য। সাহিরার মতি গতি বুঝতে পারে না। বোঝে তাকে ঘৃণা করে সাহিরা। করুক। দুঃখ নেই তার। সাহিরা আরো ভাল নাচুক। মনে মনে প্রার্থনা করে সূর্য।

॥ এগারো ॥

দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল মেহেরুন্নিসা। আজ প্রায় তিন মাস কাল গত হয়েছে। শিবাজীর হাতে বন্দিনী মেহেরুন্নিসা। সংবাদে জেনেছে, তার উদ্ধারের জন্যে পিতা সৈন্য প্রেরণ করেছে। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও এই দুর্গের কোন সন্ধান করতে পারে নি বাদশাহী সৈন্যরা। তাই বাধ্য হয়ে মহারাজ জয়সিংহের

প্রতীক্ষায় শিবির স্থাপন করে অপেক্ষা করছে সেনাপতি আজম খাঁ। এ সংবাদ দিয়েছেন স্বয়ং শিবাজী।

তা হলে আমি কোনদিনই মুক্তি পাব না রাজা। বলে ফেলেছিল মেহেরুন্নিসা।

পাবেন শাহাজাদী। মৃদু হাসিমুখে বলেছিলেন শিবাজী।

কবে ?

আজ এই মুহূর্তে সত্যই যদি আপনি মুক্তি চান, আমি আপনাকে মুক্ত করে দিতে পারি শাহাজাদী। তবে, আমার বিনীত অনুরোধ আপনি আর কিছুদিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। একটু চুপ করেছিলেন শিবাজী। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, মহারাষ্ট্রের মুক্তি চাই আমি শাহাজাদী। বাদশাহের অকারণ অত্যাচার রোধ করতে চাই মহারাষ্ট্রের বুক থেকে। আমাকে আপনি আপনার এই ক্লেশের জন্যে ক্ষমা করবেন।

সেদিন কোন উত্তর দিতে পারে নি মেহেরুন্নিসা। বুঝেছিল শিবাজীর অন্তরের বেদনা। মনে মনে শিবাজীর হৃদয়ের স্বপ্নকে সমর্থন করেছিল মেহেরুন্নিসা।

মুগ্ধ হয়েছিল শিবাজীর অকপট সারল্যে। প্রতিদিনকার প্রতিটি ঘটনার কথা শিবাজী মেহেরুন্নিসাকে বলেন। মতামত জানতে চান। কর্ম পন্থা সঠিক কি না জিজ্ঞাসা করেন। রাজনীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞা মেহেরুন্নিসা নিজের মতামত জানায়। কখনও কখনও মেহেরুন্নিসার মতামত কার্যক্ষেত্রে গ্রহণ করেন শিবাজী।

শিবাজীর কথাই নীরবে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছিল মেহেরুন্নিসা। মনের মাঝে মৃদু অনুচ্চ সুর-ঝঙ্কার কাঁপন তোলে বিস্মিত হয়। ভাবে, একি হ'ল তার! বার বার শিবাজীর আগমন প্রতীক্ষায় কেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে অন্তর। পরিচিত পদশব্দ শোনার আশায় কেন উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে মন।

এ কি প্রেম! এর নাম কি ভালবাসা?

নিজের মনেই বার বার প্রশ্ন করে মেহেরুন্নিসা। উত্তর পায় না।

এ যদি প্রেম হয় তাহলে মন ব্যাকুল হলেও, দেহ কেন উন্মুখ হয়ে ওঠে না তৃষ্ণায়। বার বার শিবাজীর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে নিজেকে অনেক—অনেক ছোট মনে হয় কেন তার ?

এতদিন শুধু দেহের ক্ষুধাই মনে প্রাণে উপলব্ধি করে এসেছে মেহেরুন্নিসা। চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বুক জোড়া তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কোথায় গেল সেই আকণ্ঠ তৃষ্ণা। দেহ ক্ষুধার কথা মনে হলে আজ কেন মন কলুষিত হয়ে ওঠে? শিবাজীর সুন্দর বলিষ্ঠ দেহটা কেন আজ একবারও মনে ছায়া ফেলে না! চিন্তা করতে গেলেই মনের ভেতর থেকে কে যেন চাপা কণ্ঠে ছিঃ ছিঃ করে ওঠে তাকে, তাই শিবাজীকে কামনা করবার দুঃসাহস জাগে না মনে।

পদশব্দে সচকিত হয়ে ওঠে মেহেরুন্নিসা। নীরা বুঝি আসছে। হয়তো বলতে আসছে প্রভু এসেছেন।

শাহাজাদী।

কণ্ঠস্বরে ফিরে চায় মেহেরুন্নিসা। চন্দ্ররাও!

রাওজী আপনি!

হ্যাঁ শাহাজাদী। মৃদু হাসে চন্দ্ররাও।

কি সংবাদ রাওজী!

কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে শাহাজাদী।

কি কথা ?

মুক্তি চান আপনি ?

মুক্তি!

হ্যাঁ। আমি মুক্তি দেব আপনাকে।

কিন্তু···

কোন চিন্তা নেই আপনার। কেউ জানবে না।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব ?

গোপন পথ আমি জানি শাহাজাদী। সেই পথে·

তারপর···

উত্তর দেয় না চন্দ্ররাও। মৃদু হাসে।

এভাবে আমি মুক্তি চাই না রাওজী।

আপনি না চাইলেও আমি চাই।

রাওজী!

হ্যাঁ শাহাজাদী। বলুন, আপনি সম্মত কি না?

জীবন থাকতে নয়।

শাহাজাদী।

আপনি চলে যান রাওজী।

চলে যাবো বলে আসি নি শাহাজাদী।

আমি চিৎকার করবো তাহলে।

কেউ আপনার চিৎকার শুনে আসবে না শাহাজাদী। এখনও বলছি আমার সঙ্গে চলুন।

এই হীন প্রস্তাব করতে আপনার লজ্জা করে না?

লজ্জা হয়তো করতো যদি না আপনার স্বরূপ জানতাম।

রাওজী!

প্রভুকে নিয়ে এ বিলাস খেলা ছেড়ে যেতে মন চাইছে না?

একি বলছেন রাওজী! শিবাজীর নামে এ মিথ্যা অপবাদ দেবেন না।

সত্যকে মিথ্যা রূপে প্রচার করার বাহাদুরী আছে প্রভুর। বাদশাহ নন্দিনী হলেও প্রভুর একা ভোগ করার অধিকার নেই। কারণ আপনাকে হরণ করতে এই দীন চন্দ্ররাওয়ের অবদানও কম নয়। তাই চন্দ্ররাও প্রভুর উচ্ছিষ্ট শাহাজাদীতেই খুশী হতে চায়। বাঁচাতে চায় মহারাষ্ট্রপতিকে।

চন্দ্ররাওয়ের কথায় মেহেরুন্নিসার সমস্ত চিন্তা ওলট পালট হয়ে যায়। শিবাজীর নামে তাঁরই ভৃত্যের মুখে এই কলঙ্কালাপ সহ্য করতে পারে না মেহেরুন্নিসা। চন্দ্ররাওয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে পাষাণ হয়ে যায়।

চলুন শাহাজাদী।

দাঁড়াও।

পাশে যেন বজ্রপাত হয়। মুক্ত তরবারি হাতে শিবাজী কখন এসে

দাঁড়িয়েছেন লক্ষ্য করে নি চন্দ্ররাও।

চন্দ্ররাও।

সেই ভয়ঙ্কর ডাক শুনে কেঁপে ওঠে চন্দ্ররাও। মুখ রক্তহীন পাণ্ডুর হয়ে যায়।

ছিঃ চন্দ্ররাও। এই হীন কাজ করতে তুমি যে কোনদিন সাহসী হবে একথা কোনদিন কল্পনাও করতে পারি নি। দাসীদের বেঁধে রেখে শাহাজাদীকে এমন অপমান করতে উদ্যত হবে এ আমার ধারণারও অতীত ছিল।

একটু চুপ করে থাকেন শিবাজী। চন্দ্ররাওয়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান।

এসো আমার সঙ্গে।

চন্দ্ররাওকে আহ্বান জানিয়ে এগিয়ে চলেন শিবাজী।

নিঃশব্দে শিবাজীকে অনুসরণ করে চন্দ্ররাও।

পাষাণের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেহেরুন্নিসা।

দুর্গ চত্বরে বিচার সভা বসে।

সকলে চন্দ্ররাওয়ের দণ্ড বিধানের অপেক্ষায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

সকলকে সমস্ত ঘটনা জানান শিবাজী।

শিবাজীর মুখের পানে তাকিয়েই মাথা নত করে চন্দ্ররাও।

তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার করছ?

করছি প্রভু।

এই অপরাধের এক মাত্র দণ্ড কি জান, মৃত্যু।

প্রভু। কেঁপে ওঠে চন্দ্ররাও।

হ্যাঁ চন্দ্ররাও তোমার অপরাধের একমাত্র শাস্তি, মৃত্যু।

আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু।

ক্ষমা! না চন্দ্ররাও। বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নেই শিবাজীর কাছে। বিশ্বাসঘাতক শিবাজীর যতই স্নেহভাজন হোক তবু তার ক্ষমা নেই।

একটু চুপ করেন শিবাজী। নীরবে দণ্ডায়মান সহস্র অনুচরদের মুখের

দিকে ক্ষণিক তাকান। ধীর কণ্ঠে বলেন, তুমি বীর। আমার পরম স্নেহের পাত্র তুমি। বীরের মতো মৃত্যুর সুযোগ আমি তোমাকে দেব।

সকলেই অবাক বিস্ময়ে শিবাজীর মুখের দিকে তাকায়। একি বলছেন শিবাজী। যে অপরাধ চন্দ্ররাও করেছে তাতে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করাই উচিত কিন্তু শিবাজী চন্দ্ররাওকে বীরের মতো মরবার সুযোগ দেবেন। কেমন ভাবে ?

চন্দ্ররাও।

প্রভু।

আমি তোমাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করছি।

কেঁপে ওঠে সকলের বুক। একি করতে চলেছেন শিবাজী। ভবানী না করেন যদি কোনরূপে অঘটন ঘটে যায় তাহলে এই দুর্দিনে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না মালশ্রী। বলে।

একি করতে চলেছেন প্রভু। চন্দ্ররাও অপরাধী—তার অপরাধের যোগ্য দণ্ড আপনি দিন, কিন্তু এভাবে…

না মালশ্রী তা হয় না।

কেন প্রভু ?

চন্দ্ররাও যে অপরাধ করেছে তাতে তাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি কিন্তু তাতে তার আক্ষেপ থাকতে পারে। কারণ সে যে কাজে অগ্রসর হয়েছিল আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তা করেই হয়েছিল।

চুপ করে যায় মালশ্রী।

তখন শিবাজী আর চন্দ্ররাও আপন আপন তরবারি নিয়ে উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করে। এক সময় শিবাজীর তরবারি স্পর্শ করে চন্দ্ররাওয়ের কাঁধ। শোণিতধারায় সিক্ত হয়ে ওঠে চন্দ্ররাওয়ের শরীর। এইভাবে বার বার শিবাজীর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয় চন্দ্ররাওয়ের সমস্ত শরীর।

একসময় স্থির হয়ে দাঁড়ায় চন্দ্ররাও। স্থির দৃষ্টিতে শিবাজীর মুখের

পানে তাকায়। শিবাজীও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন চন্দ্ররাওয়ের মুখের দিকে।

অকস্মাৎ শিবাজীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চন্দ্ররাও। আপন তরবারি দিয়ে চন্দ্ররাওয়ের সে আঘাত প্রতিহত করেন শিবাজী কিন্তু চন্দ্ররাওয়ের সেই আঘাতে ভেঙে যায় শিবাজীর তরবারি।

চন্দ্ররাও আবার আক্রমণ করে। অদ্ভুত উপায়ে চন্দ্ররাওয়ের সে আক্রমণ ব্যর্থ করেন শিবাজী। পাশে সরে যান।

এইভাবে কখনও দূরে কখনও কাছে চন্দ্ররাওয়ের চারিপাশে ফিরতে লাগলেন শিবাজী। ক্ষিপ্ত চন্দ্ররাও হিংস্র গর্জন করে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় শিবাজীর ওপর।

অত্যধিক রক্তপাতের দরুণ এক সময় অবসন্ন চন্দ্ররাও স্থির হয়ে দাঁড়ায়। এই সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন শিবাজী। ভগ্ন তরবারি দিয়েই আঘাত করেন। আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চন্দ্ররাও।

মাধোজী। কেল্লাদারকে ডাকেন শিবাজী।

আদেশ করুন প্রভু।

চন্দ্ররাও জীবিত কী মৃত দেখুন।

পরীক্ষা করেন মাধব রাও।

কি দেখলেন ?

জীবিত আছে।

দুর্গের বাইরে দেহটা বার করে দেবার ব্যবস্থা করুন। যদি রক্ষা পায় তাতে শিবাজীর আক্ষেপ নেই।

শিবাজীর আদেশ পালন করেন বৃদ্ধ মাধব রাও। যে যার নিজ নিজ কাজে ফিরে যায়। দাঁড়িয়ে থাকে তন্বজী মালশ্রী।

মালশ্রী। ডাকেন শিবাজী।

প্রভু।

আমাকে একটু ধর। কাঁধের হাড় বোধহয় ভেঙে গেছে।

শিবাজীকে কক্ষে নিয়ে গিয়ে শয্যায় শুইয়ে দেয় মালশ্রী। চিকিৎসার

ব্যবস্থা করে।

মালশ্রী। এক সময় ডাকেন শিবাজী

প্রভু।

কবে ফিরলে তুমি?

গত কাল প্রভাতে।

মেয়েটিকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছ তো?

দিয়েছি প্রভু।

সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করেন শিবাজী। উত্তর দেয় মালশ্রী।

প্রভু। এক সময় ডাকে মালশ্রী।

কি?

কেন এই সর্বনাশা খেলায় মেতেছিলেন। যদি চন্দ্ররাওয়ের আঘাত···

কোন উত্তর দেন না শিবাজী, গভীর ক্লান্তিতে চোখ বোজেন।

শিবাজীর শিয়রে চুপ করে বসে থাকে মালশ্রী।

চন্দ্ররাওকে নিয়ে শিবাজী চলে যাবার পর অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেহেরুন্নিসা। এক সময় সম্বিত ফিরে আসে। নিজ কক্ষে এসে প্রবেশ করে। দেখে নীরা হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। নীরার বন্ধন মুক্ত করে দেয় মেহেরুন্নিসা।

নীরা।

শাহাজাদী। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে নীরা।

নীরাকে কাছে টেনে নেয় মেহেরুন্নিসা। শান্ত করে তার কান্না।

শাহাজাদী।

কি নীরা? সেই শয়তানটা কোথায়? তাকে তোমার প্রভু নিয়ে গেছেন। নীরাকে সমস্ত কথা বলে মেহেরুন্নিসা।

ভবানী আপনাকে রক্ষা করেছেন শাহাজাদী। প্রভুর মুখ রক্ষা করেছেন।

সত্যি নীরা। তোমার প্রভু যদি না আসতেন তাহলে আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকতো না। আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি নীরা এমন মহৎ প্রাণ যাদের প্রভুর তাদের অত নীচ মনোবৃত্তি হয় কেমন করে!

আমিও তাই ভাবি শাহাজাদী। আমাদের প্রভু মানুষ নন দেবতা

সত্যি নীরা।

একসময় কোলাহল শোনা যায় দুর্গের অপর পার্শ্বে। কিন্তু কেন এই কোলাহল তা জানবার কোন উপায়ই নেই।

নীরা।

শাহাজাদী।

ওধারে অত কোলাহল কেন, তুমি দেখে এসো।

চলে যায় নীরা। শূন্য কক্ষে একাকিনী বসে থাকে মেহেরুন্নিসা। ক্রমশঃ কোলাহল বাড়ে।

একসময় কোলাহল থেমে যায়। ফিরে আসে নীরা।

কি হয়েছিল নীরা? ব্যাকুল প্রশ্ন করে মেহেরুন্নিসা।

সমস্ত ঘটনার কথা মেহেরুন্নিসাকে বলে নীরা।

নীরা। রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকে মেহেরুন্নিসা।

বলুন শাহাজাদী।

ধন্য তোমার প্রভু নীরা। ধন্য তাঁর বিচার।

উত্তরে কিছু বলতে পারে না নীরা। আঁখি দুটি তার ছল ছল করে ওঠে অশ্রুতে। নীরা আর মেহেরুন্নিসা মুখোমুখি বসে থাকে দুজনে।

শিবাজী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চন্দ্ররাওয়ের অস্ত্রের আঘাতে তাঁর কাঁধের অস্থি চূর্ণ হয়ে গেছে। এই সংবাদ আসে একসময়।

এ সংবাদে মেহেরুন্নিসার মন ব্যথায় ভরে যায়। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। শিবাজীর এই বিপদের কারণ সে। তার জন্যেই শিবাজীর আজ এই অবস্থা।

নীরা।

শাহাজাদী।

আমাকে তোমার প্রভুর কাছে নিয়ে চল নীরা।

তা হয় না শাহাজাদী।

হয় না!

না ওধারে পুরুষরা থাকেন কোন নারীর প্রবেশাধিকার নেই ওধারে। কিন্তু আমি···। বলতে পারে না মেহেরুন্নিসা। রুদ্ধ হয় কণ্ঠ। অশ্রু ঝরে আঁখি বেয়ে।

শাহাজাদী।

নীরা।

আমি আসছি। চলে যায় নীরা। ফিরে আসে অল্পক্ষণ পরে।

শাহাজাদী।

বল।

আসুন।

কোথায়?

প্রভুকে দেখতে।

নীরার সঙ্গে শিবাজী যে কক্ষে আছেন প্রবেশ করে মেহেরুন্নিসা। শয্যায় শায়িত শিবাজী। ক্লান্ত আঁখি দুটি মুদ্রিত। পাশে গিয়ে দাঁড়ায় মেহেরুন্নিসা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শিবাজীর দিকে। অশ্রুতে ভরে যায় আঁখি।

কার করস্পর্শে তন্দ্রা ভাঙে শিবাজীর। চোখ মেলেন। দেখতে পান শাহাজাদীকে।

শাহাজাদী! মৃদু হাসিতে ভরে ওঠে শিবাজীর মুখ।

কথা বলতে পারে না মেহেরুন্নিসা।

নিজেকে অপরাধা ভেবে বৃথা কষ্ট পাবেন না শাহাজাদী।

মহারাজ!

হ্যাঁ শাহাজাদী। বসুন।

বসে মেহেরুন্নিসা। সব লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করে তাকিয়ে থাকে শিবাজীর মুখের পানে। মুহূর্ত তাকিয়ে চোখ বোজেন শিবাজী।

মহারাজ। মৃদু কণ্ঠে ডাকে মেহেরুন্নিসা।

বলুন।

আমার একটা প্রার্থনা আছে।

প্রার্থনা!

হ্যাঁ মহারাজ।

কিন্তু…

সেদিন আপনিইতো বলেছিলেন ইচ্ছা করলে মুক্তি আপনি দেবেন আমাকে।

দেব শাহাজাদী। কালই আপনাকে আপনার পিতার কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আমি করবো।

মুক্তি আমি চাই না মহারাজ।

শাহাজাদী। অবাক বিস্ময়ে মেহেরুন্নিসার দিকে তাকিয়ে থাকেন শিবাজী।

হ্যাঁ মহারাজ।

তবে ?

চাই আপনার শুশ্রূষা করতে।

তা হয় না শাহাজাদী। দিল্লীশ্বরের কন্যা সামান্য একজন পার্বতীয় দস্যুর সেবা করবে, এ হতে পারে না।

আমি অনুতপ্ত মহারাজ। আপনার সংস্পর্শে এসে মানুষ সম্বন্ধে আমার ভুল ভেঙে গেছে। মানুষকে চিনতে শিখেছি আমি। আমার এই প্রার্থনায় বাধা দেবেন না মহারাজ।

মেহেরুন্নিসার কাতর কণ্ঠস্বরে তার মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন শিবাজী। ভুলেও কথা বলতে পারেন না।

॥ বারো ॥

দিন কাটে। অলক্ষ্যে বসে বুঝি মৃদু হাসেন ভাগ্য বিধাতা। হেমন্তের বাতাসে বসন্তের ইসারা। পাপড়ি মেলে শতদল। ভ্রমরের গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে অন্তরের অন্তঃস্থলে।

মেহেরুন্নিসার জীবনে আসে খুশীর ছন্দ। এত সুখ কোনদিন মেহেরুন্নিসাকে এমন বিহ্বল করে তোলে নি। কেন? কারণ

অনুসন্ধানের শক্তি আজ হারিয়ে ফেলেছে মন।

অকারণ কলকল ছল ছল শব্দে হেসে ওঠে মেহেরুন্নিসা। অস্থির করে তোলে নীরাকে। খুশীর জোয়ারে দিশাহারা হয়ে পড়ে মেহেরুন্নিসা।

ভুলে যায় সব কিছু। কে সে? কার কন্যা? জীবনের সব পরিচয় মিথ্যা মনে হয়। সত্য মনে হয় শুধু নিজেকে।

শাহাজাদী। মৃদু কণ্ঠে ডাকেন শিবাজী।

উত্তর দেয় না মেহেরুন্নিসা।

শাহাজাদী। আবার ডাকেন শিবাজী।

আমি শাহাজাদী নই মহারাজ।

নন!

না। আমি মেহেরুন্নিসা।

তা হয় না শাহাজাদী।

হয় না কেন?

যা সত্য তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে।

কিন্তু বন্দিনীর প্রতি এ সম্মান উপহাসের নামান্তর।

শাহাজাদী!

বলুন মেহেরুন্নিসা। আমি মেহের। পিতা আমার আওরঙজেব সত্য কিন্তু আজকের বাদশাহ আলমগীর নন।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

অসম্ভবকে সম্ভব করে নিতে পারলেই সম্ভব মহারাজ।

উত্তর দেন না শিবাজী। মেহেরুন্নিসার দিকে তাকান। বিচিত্র চরিত্রা এই বাদশাহ কন্যা। জীবনে হয়তো কোনদিন পীড়িত কারো শিয়রে বসে নি কিন্তু আজ কয়েকদিন তাঁর শিয়রে বসে সেবা করছে। একবারও মনে হয় নি যে, সে অনভিজ্ঞা এ বিষয়ে।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন শিবাজী। কাছাকাছি এসেছেন মেহেরুন্নিসার। দূরে সরে যেতে গেছেন, পারেন নি। অস্থির হৃদয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন। যুক্তি তর্কে মনকে সরিয়ে নিয়ে

যেতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রবল আকর্ষণে বার বার আকর্ষিত হয়েছে মন।

ঘুমুতে পারেন নি রাত্রে। ছট্‌ফট্ করেছেন শয্যায়।

প্রভু। কাছে এসে মৃদু কণ্ঠে ডেকেছে মালশ্রী।

উঁ।

কি হ'ল ?

ঘুম আসছে না মালশ্রী। অসহ্য যন্ত্রণা।

ভুল বুঝেছে মালশ্রী। সেই রাত্রে সংবাদ দিয়েছে মেহেরুন্নিসাকে। মালশ্রীর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। অন্ধ না কি। কি হয়েছে মালশ্রীর। কিছুই কি বুঝতে পারে না সে।

দেখতে পায় না পরিবর্তন।

এসেছে মেহেরুন্নিসা।

মহারাজ।

কে!

আমি মেহেরুন্নিসা।

এই গভীর রাত্রে ?

তন্নজী সংবাদ দিলেন আপনি অসুস্থতা বোধ করছেন।

মালশ্রী কোথা ?

তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন।

অনুগ্রহ করে একবার তাকে ডাকুন।

ডেকেছে মেহেরুন্নিসা। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মালশ্রী।

মালশ্রী।

বলুন প্রভু।

কি প্রয়োজন ছিল এই রাত্রে শাহাজাদীকে কষ্ট দেবার। চিকিৎসককে সংবাদ দিলেই পারতে।

তন্নজী। ডেকেছে মেহেরুন্নিসা।

বলুন শাহাজাদী।

কি হয়েছে আপনার প্রভুর ?

অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে বুকে।

আমার যন্ত্রণা হয় নি। বিরক্ত কণ্ঠে বলেছেন শিবাজী।

কিন্তু...

আমি দেখছি তন্নজী।

বলেছে মেহেরুন্নিসা। ইঙ্গিতে মালশ্রীকে কক্ষ ত্যাগ করতে বলেছে।

শিবাজীর ক্ষুব্ধ ব্যবহারে আশ্চর্য হয়ে কক্ষ ত্যাগ করেছে মালশ্রী।

বুকে হাত রেখেছে মেহেরুন্নিসা।

যন্ত্রণা কোথা হচ্ছে মহারাজ, এখানে ?

না।

তবে ?

যন্ত্রণা আমার হয় নি শাহাজাদী।

মিথ্যা বলবেন না মহারাজ। যন্ত্রণা আপনার হচ্ছে।

না।

হ্যাঁ। আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হচ্ছেন আপনি। যবনীর স্পর্শে ঘৃণায় ভরে উঠছে আপনার মন। তাই না মহারাজ ?

হাতখানা সরিয়ে নিয়েছে মেহেরুন্নিসা। শিবাজীর চোখে চোখ রেখেছে।

এ কি বলছেন আপনি! আশ্চর্য হয়েছেন শিবাজী।

যা সত্য তাই।

সত্য নয় শাহাজাদী। আপনার ধারণা ভুল।

তবে ?

সব কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি।

জানি মহারাজ। আমারও একটা অনুরোধ, আপনিও আমাকে ভুল বুঝবেন না। শাহাজাদী মেহেরুন্নিসা আপনার শত অত্যাচার হাসি মুখে সহ্য করতে পারে কিন্তু আপনার বিন্দুমাত্র ঘৃণা তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

কথা বলেন নি চুপ করে ছিলেন শিবাজী।

ধীরে ধীরে উঠে চলে গিয়েছিল মেহেরুন্নিসা।
দেখেছিলেন তার চোখে জল। মনটা ব্যথায় ভরে গিয়েছিল। কিন্তু কাছে ডেকে ব্যথার অশ্রু মুছিয়ে দিতে পারেন নি। এ বিষয়ে তিনি নিরুপায়। অসহায়।

॥ তেরো ॥

ব্যর্থ হন সেনাপতি আজম খাঁ। বহু অনুসন্ধান করেও সন্ধান পান না শিবাজীর।
কোন দুর্গে যে শাহাজাদীকে বন্দিনী করে রাখা হয়েছে সে সন্ধান নিয়ে আসতে পারে না গুপ্তচরেরা। স্থানীয় কেউই কোন সন্ধান দিতে পারে না। শাহাজাদী হরণের ঘটনা সকলেই অস্বীকার করে। প্রথমে সাধারণ মানুষের কথা বিশ্বাস করতে পারে নি আজম খাঁ। মনে হয়েছিল এই প্রভুভক্ত চতুর মারাঠারা মিথ্যা বলছে কিন্তু বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে জেনেছে সাধারণ মানুষদের কথা মিথ্যা নয়। সত্যই কোন খবর কেউ জানে না।
সন্দেহ জাগে মনে। তবে কি বাদশাহ মিথ্যা প্রচার করেছেন। শিবাজীকে দমন করবার জন্যে নতুন চাল চেলেছেন তিনি। কিছুই অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। শিবাজীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করে দেশবাসীর মনে বিরূপ ধারণা জন্মাতে চান। যাতে দেশবাসীর সমর্থন তিনি হারান।
শিবাজী আর তাঁর অনুচরেরা দিনের পর দিন যে কাজ সুরু করেছেন তাতে বাদশাহ আলমগীরের মসনদ নিরাপদ নয়।
কিন্তু তাই বা সম্ভব কেমন করে। বাদশাহ কন্যা হরণের সংবাদ দিল্লীতে সম্পূর্ণ গোপন করেছেন। প্রচার করেছেন শাহাজাদী মাতুরাতে অবস্থান করছেন। তবুও বাতাসে যে সত্য সংবাদ ছড়িয়েছে তা তিনি রোধ করতে পারেন নি।

নিজ শিবিরে বসে গভীর চিন্তামগ্ন ছিল আজম খাঁ। প্রহরী প্রবেশ করে।

হুজুর।

কি চাও?

একজন মারাঠা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কেন?

বলছে জরুরী প্রয়োজন।

আগামী কাল দেখা করতে বল।

বলেছিলুম হুজুর। বললে, দেখা করলে আপনারই মঙ্গল হবে।

কে সে?

তা জানি না হুজুর।

নিয়ে এসো তাকে।

রক্ষী চন্দ্ররাওকে নিয়ে আসে। কঠিন দৃষ্টিতে চন্দ্ররাওয়ের মুখের দিকে তাকায় আজম খাঁ।

শিবাজীর অনুচর বলেই মনে হয়। আশ্চর্য হয় আজম খাঁ। শিবাজীর অনুচর কি উদ্দেশ্যে তার কাছে এসেছে।

চন্দ্ররাও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আজম খাঁর মুখের পানে। বারেক কেঁপে ওঠে বুকের ভেতরটা। এ কি করছে সে। জন্মভূমির স্বাধীনতার স্বপ্ন বিপন্ন করতে কেন সে ছুটে এল শত্রুর শিবিরে। তখনই নিজের মনকে কঠিন করে চন্দ্ররাও। না অন্যায় সে করে নি। শিবাজীকে সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। শিবাজীর ধ্বংস চাই।

কদিনের কথা মনে পড়ে চন্দ্ররাওয়ের। দুর্গের বাহিরে সেই রাত্রে বার করে দেবার পর কিভাবে যে জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে ভাবতে পারে না চন্দ্ররাও।

সারারাত্রি ঠাণ্ডায় অন্ধকারে পড়ে থেকেছে অজ্ঞান অচেতন হয়ে। জ্ঞান ফিরে এসেছে ভোরের বেলা। কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকেছে। যদি কারো নজরে পড়ে যেত আজ তাহলে তাকে মোগল সেনা শিবিরে আসতে হ'ত না।

কদিন বনের ফল মূল খেয়ে থেকেছে। ক্ষতগুলোতে বনজ ঔষধী পাতার রস দিয়েছে। কিন্তু রাত্রের দুরন্ত ঠাণ্ডা বাতাসে ঘা হয়েছে ক্ষতগুলো।

শিবাজীর প্রতি ক্রোধে পূর্ণ হয়েছে মন। প্রতিশোধের আকাঙ্খা জেগেছে মনে। পাগলের মতো কদিন কেবল ঐ চিন্তা করেছে। কি করবে সে? কি করে প্রতিশোধ নেবে?

একদিন সন্ধান পেয়েছে মোগল সৈন্য শিবিরের। শিবাজীর ওপর প্রতিশোধ নিতে হলে মোগলের সহায়তা ভিন্ন চন্দ্ররাওয়ের একলার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

বসো। চন্দ্ররাওকে উদ্দেশ্য করে বলে আজম খাঁ।

বসে চন্দ্ররাও। নিরুত্তরে বসে থাকে।

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তাহলে তুমি শিবাজীর অনুচর।

হ্যাঁ। মৃদুস্বরে বলে চন্দ্ররাও।

কিন্তু কি উদ্দেশ্যে মোগল শিবিরে এসেছ?

শিবাজীর বিনাশের জন্যে।

কেন?

শিবাজী অন্যায়ভাবে আমাকে আহত করেছে। আমার মৃত্যুই তার কাম্য ছিল কিন্তু ভবানীর কৃপায় রক্ষা পেয়েছি আমি। আমাকে অন্যায়ভাবে যে শাস্তি সে দিয়েছে তার প্রতিশোধ চাই আমি।

তোমার কোন অপরাধ ছিল না?

ছিল।

কি অপরাধ?

অপরাধ শাহাজাদীর সঙ্গে তার গোপন ব্যভিচারে বাধা দান।

চন্দ্ররাও। গর্জে ওঠে আজম খাঁ।

যা সত্য তাই বললাম।

কিন্তু যে সত্য তুমি উচ্চারণ করলে তার শাস্তি কি জান?

জানি। মৃদু হাসে চন্দ্ররাও। সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয়ে শিবাজী করেছে ক্ষত বিক্ষত। আপনি পাঠিয়ে দেবেন মৃত্যুর পরপারে কিন্তু

আমার মৃত্যু যদি হয় তাহলে কোনদিন শাহাজাদীকে উদ্ধার করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

শাহাজাদী কোথায় আছেন জান তুমি?

জানি।

কোথায়?

বলব না।

বলবে না?

না। কারণ আমি অসুস্থ। যতদিন সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে উঠি ততদিন কোন কথাই প্রকাশ করবো না আমি। সুস্থ হয়ে আমি নিজে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। আমি বিনা অন্যের সাধ্য নেই সে দুর্গে প্রবেশ করে।

কিন্তু তোমার কৃপায় কি করে বিশ্বাস করবো যে তুমি সুস্থ হয়ে শিবাজীকে দমন করতে আমাকে সাহায্য করবে?

আমি হিন্দু। হিন্দু মুখে যে সত্য করে প্রাণ দিতেও সে সত্য পালন করে। আপনি মুসলমান হিন্দুর এই সত্য পালনের প্রতিজ্ঞা হয়তো বিশ্বাস করতে না-ও পারেন কারণ ইতিপূর্বে বহু মুসলমান প্রতিজ্ঞা করে সময়ে সে সত্য পালন করে নি।

চন্দ্ররাও। গর্জে ওঠে আজম খাঁ। যে কথা তুমি বললে দ্বিতীয়বার ও কথা উচ্চারণ করলে রক্ষা নেই তোমার।

বেশ আমাকে তবে বিদায় দিন আমি অন্য কোন সেনাপতির কাছে যাই।

আজম খাঁ বুঝতে পারে চন্দ্ররাও শুধু ধূর্ত নয় একটি পাকা শয়তান। যদি চন্দ্ররাওকে বিদায় করে দেয় তাহলে চন্দ্ররাও অন্য কোন সেনাপতির সঙ্গে যোগ দিয়ে শিবাজীকে ধৃত করবে। সেই সেনাপতিই শাহাজাদী উদ্ধারের যশ লাভ করবে। কিন্তু আজম খাঁর মন চন্দ্ররাওকে সমর্থন করে না তবুও স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে চন্দ্ররাওকে গ্রহণ করতে হবে।

সব দিক বিবেচনা করে বলে, তোমাকে হিতৈষী বলে স্বীকার

করলাম। যদি শিবাজীকে আমার হস্তগত করাতে পার তাহলে তোমার কাজের উপযুক্ত পুরস্কার তুমি পাবে।

আজম খাঁর কথার উত্তরে চন্দ্ররাও বলে, খাঁ সাহেব পুরস্কারের লোভে জন্মভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন করতে আমি আসি নি। আমি এসেছি শিবাজীর লাম্পট্যের শাস্তি দেবার জন্যে। শিবাজীর মৃত্যুই হবে আমার কাজের পুরস্কার, অন্য পুরস্কার আমি আশা করি না।

বেশ যা তোমার অভিরুচি তাই করবে। কিন্তু কি ভাবে শিবাজীকে তুমি দমন করবে ?

আমি আগেই বলেছি খাঁ সাহেব আমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই প্রকাশ করব না।

বেশ।

মুখ কালো হয়ে ওঠে আজম খাঁর।

আজম খাঁর আশ্রমে থাকে চন্দ্ররাও। দিনে দিনে সুস্থ হয়ে ওঠে।

চন্দ্ররাও।

খাঁ সাহেব।

আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে ?

সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।

আর কত দিন ?

সময় হলেই জানাবো খাঁ সাহেব। ব্যস্ত হবেন না।

আজম খাঁর মনে সন্দেহ জাগে। চন্দ্ররাও সত্যই শিবাজীকে ধরিয়ে দেবে তো ?

সংবাদ আসে মহারাজ জয়সিংহ দিল্লী থেকে যাত্রা করেছেন। শীঘ্রই তিনি এসে পৌছাবেন।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে আজম খাঁ। জয়সিংহ এসে পৌছাবার আগেই শিবাজীকে আক্রমণ করতে হবে। নিজের উদ্দেশ্যর কথা চন্দ্ররাওকে বলে আজম খাঁ।

আপনি কি করতে চান ? জিজ্ঞাসা করে চন্দ্ররাও।

আমার চাওয়া না চাওয়া সব তোমার ওপর নির্ভর করছে। এখন

যদি অযথা বিলম্ব কর তা হলে আমার করবার কিছু থাকবে না।
বেশ, মহারাজ জয়সিংহ এসে পৌছাবার আগেই আমি শিবাজীকে ধরিয়ে দেব।
সত্য।
মারাঠার কথার অন্যথা হয় না খাঁ সাহেব।
বেশ তোমার সেদিনের আশায় রইলাম আমি।
আবার দিন কাটে। চন্দ্ররাও নির্বিকার।
সুস্থ হয়ে চন্দ্ররাও প্রতিদিন নিজের শক্তি পরীক্ষা করে। আজম খাঁকে অনুরোধ করে সেনাদের কাছ থেকে অসি বিদ্যা আয়ত্ত করতে। প্রভাতে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ে চন্দ্ররাও। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাবার আগে শিবিরে ফিরে আসে। প্রথম দিকে চন্দ্ররাওয়ের এই শিবির ত্যাগে সন্দেহ জেগেছিল আজম খাঁর মনে। চন্দ্ররাওকে অনুসরণ করবার জন্যে চর পাঠিয়েছিল। চর প্রতিদিনই ফিরে এসে সংবাদ দেয় চন্দ্ররাও ইতঃস্তত ঘুরে বেড়ায়।
কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না?
না হুজুর।
তুমি ঠিক লক্ষ্য রাখ তো?
হ্যাঁ হুজুর।
হুঁ।
চিন্তিত হয়েছিল আজম খাঁ। অনেক চিন্তা করেও স্থির করতে পারে নি চন্দ্ররাওয়ের উদ্দেশ্য। শিবাজীর এই বিশ্বাসঘাতক অনুচরটিকে বিচিত্র চরিত্রের মানুষ বলে ধারণা হয়েছিল আজম খাঁর। একবার ভেবেছিল চন্দ্ররাওকে জিজ্ঞাসা করবে কোথায় যায় সে কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে পাছে ধরা পড়ে যায় সেই ভয়ে জিজ্ঞাসা করে নি। শুধু চন্দ্ররাওয়ের ওপর আরো তীক্ষ্ণ নজর রাখবার আদেশ দিয়েছিল আজম খাঁ।
কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলা শিবিরে ফিরে আজম খাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল চন্দ্ররাও।

খাঁ সাহেব।
বল।
আমাকে বিশ্বাস করতে পারেননি না?
এ কথার অর্থ?
অর্থ আমার থেকে আপনিই ভাল জানেন

আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে চর লাগিয়েছেন আপনি। কিন্তু আমি…।
থাক খাঁ সাহেব। একটা কথা, আমার উদ্দেশ্য যে কি জানতে পেরেছেন আপনি?
চুপ করে থাকে আজম খাঁ।
আগামী কাল থেকে চরেদের আর বৃথা কষ্ট করতে হবে না। আমি কাল সমস্ত দিন শিবিরে থাকবো। কারণ আমার যা জানার জেনে এসেছি।
কি জেনেছ?
শিবাজী ফিরে এসেছেন।

সত্য খাঁ সাহেব। শিবাজীকে দুর্গ ত্যাগ করতে দেখেছিলুম একদিন। আজ দেখলুম ফিরে এসেছে। আগামী কালই দুর্গ আক্রমণ করা হবে।
আগামীকাল!
হ্যাঁ।
তাহলে সৈন্যদের প্রস্তুত হবার আদেশ দিই?
কোন প্রয়োজন নেই। মাত্র দুশো সৈন্য হলেই হবে।
মাত্র দুশো সৈন্য নিয়ে কি করে দুর্গ জয় করবো?
জয় আপনি করবেন না করবো আমি। শুধু কিছু দড়ি সংগ্রহ করে রাখবেন।
দড়ি!

হ্যাঁ।

বেশ তাই হবে।

কাল দুপুরে শিবির ত্যাগ করবো আমি। কাল আর যেন আমার পিছনে চর পাঠাবেন না। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর যেমন নির্দেশ দেব সেই মতো কাজ করবেন। কোথায় যেতে হবে শিবির ত্যাগের পূর্বে জানিয়ে যাব।

হুঁ।

গম্ভীর হয়ে ওঠে আজম খাঁর মুখ। উদ্ধত স্বভাব চন্দ্ররাওয়ের কথায় সর্বাঙ্গ জ্বালা করে আজম খাঁর। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে দিন পেলে এর শোধ চন্দ্ররাওকে কড়ায় গণ্ডায় ফিরিয়ে দেবে।

॥ চৌদ্দ ॥

পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরেন জীজাবাঈ। আনন্দাশ্রুতে ভেসে যায় বুক। মায়ের স্নেহ কোমল বক্ষে মাথা রেখে মাতৃ স্নেহের আস্বাদে ভরে যায় শিবাজীর বুক। মায়ের চোখে অশ্রু দেখে নিজের চোখ দুটিও ছল ছল করে ওঠে অশ্রুতে।

মা, মাগো। শিশুর মতো আনন্দে ডেকে ওঠেন শিবাজী।

পুত্র আমার।

পুত্রের চোখের অশ্রু মুছিয়ে দেন জীজাবাঈ।

মাতা পুত্রে বসে থাকেন চুপ করে। একান্ত নীরবতায়।

আকাশের সূর্য সোনালী কিরণধারায় প্লাবিত করে বিশ্ব প্রকৃতি। পাখীদের কাকলীধ্বনিতে মুখর বাতাস স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে সিক্ত করে দিয়ে যায় দেহ। সার সার পর্বত শিখরগুলিও মাতা পুত্রের এই মিলন আনন্দ দেখে নীরব প্রশান্ত হাস্যে মুখর হয়ে ওঠে।

পুত্র। একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে ডাকেন জীজাবাঈ।

মাগো।

ভবানীর কৃপা ভিন্ন তোমাকে ফিরে পেতুম না পুত্র কিন্তু শাহাজাদীর সেবাই তোমাকে নতুন জীবন এনে দিয়েছে। তাই···

বল মা।

আমার অনুরোধ তার দুঃখের কারণ যেন কোনদিন হয়ো না।

তোমার আদেশ আমি পালন করব মা। তাঁকে আমি মুক্তি দিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু···

কি ?

মুক্তি তিনি চান না মা।

কেন পুত্র ?

কারণ আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি মা। আমার মনে হয়···

কি মনে হয় পুত্র ?

আমার ধারণা সত্য নাও হতে পারে মা। তাই···

শিবাজীর এই কথায় পুত্রের মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান জীজাবাঈ। কিছুই দৃষ্টি এড়ায় নি তাঁর। শাহাজাদীর প্রসঙ্গ ওঠা মাত্র পুত্রের মুখে যে পরিবর্তন তিনি দেখেছেন তাতে মনের সন্দেহটা আরো দৃঢ় হয়েছে।

শাহাজাদী সম্বন্ধে মালশ্রীর কাছেও অনেক কথা জেনেছে জীজাবাঈ। মনে হয়েছে তাঁর পুত্রকে ভালবাসে শাহাজাদী। এই প্রেম শাহাজাদীর মনে একদিনে সঞ্চারিত হয় নি, দিনে দিনে বিকাশ লাভ করেছে তার অন্তরের ভালবাসা।

অশ্রান্ত হৃদয়ে দিনের পর দিন ভেবেছেন জীজাবাঈ। অসহ্য যন্ত্রণা জেগেছে জীজাবাঈয়ের মনে। পুত্রের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে কেঁপে উঠেছে অন্তর। সর্বনাশা ভয়াবহ বিপদশঙ্কায় রাতের পর রাত শয্যায় চুপ করে শুয়ে থেকেছেন। অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন। একি করতে চলেছে শিবাজী! দেশ, জাতি, ধর্মের কথা ভুলে সত্যই যদি শাহাজাদীর প্রেমে লিপ্ত হয় তাহলে সর্বনাশের শেষ থাকবে না। মারাঠার জীবনদাপ চিরতরে নিভে যাবে অমানিশার অন্ধকারে। জাতি ধর্ম দেশের কথা ভুলে যবনীর প্রেমে নিমজ্জিত হলে কলঙ্কে

ছেয়ে যাবে দেশ। শেষ হবে আশা, আকাঙ্খা, ভবিষ্যৎ। কলঙ্ককালিমা লিপ্ত হবে বংশ গৌরব। পিতৃ পিতামহের নাম।

মালশ্রীকে কঠিন দৃষ্টি রাখতে বললেন শাহাজাদী আর পুত্রের উপর। নিয়মিত সংবাদ নিতে লাগলেন গোপনে। কিন্তু হঠাৎ মতের পরিবর্তন করলেন জীজাবাঈ। আত্মধিক্কারে ভরে গেল মন। এ কি করছেন তিনি! যার সেবায় পুত্র তাঁর মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে পেল জীবন। তার প্রতি এ কি অবিচার করছেন তিনি।

সত্যই যদি পুত্রের সঙ্গে শাহাজাদীর প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। যদি পুত্র গ্রহণ করে শাহাজাদীকে তিনি তাতে বাধা দেবেন না আর। ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ। তার অন্তরের বাসনা কামনা, স্নেহ ভালবাসা তাঁরই অদৃশ্য ইঙ্গিতে এগিয়ে চলে জীবনের গতিপথে। যদি মানুষের সৃষ্ট জাতি ধর্ম ভুলে পুত্র গ্রহণ করে শাহাজাদীকে তাহলে সমাজ সংসার পুত্রকে ছিঃ ছিঃ করলে তিনি তা আর করবেন না।

পুত্র। ডাকেন জীজাবাঈ।

মা।

এ কি সত্য পুত্র?

কি সত্য মা? আশ্চর্য হন শিবাজী।

শাহাজাদী তোমাকে স্নেহ করেন?

আমারও তাই বোধ হয়। একটু চুপ করে থাকেন শিবাজী। বলেন, এ তাঁর দুর্বলতা মা।

না পুত্র।

কিন্তু...

সে নারী। নারীর অন্তর স্নেহ-কোমল। সেই কোমল অন্তরে যদি তোমার ছায়া পড়ে তাতে আমি তাকে দোষ দিতে পারি না পুত্র।

এ তুমি সমর্থন কর মা?

করি পুত্র।

কথা বলেন না শিবাজী। চিন্তিত হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল।

মালশ্রী শম্ভুকে নিয়ে আসে। বালক ছুটে এসে পিতার বুকে

ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চলে যায় মালশ্রী। মায়ের কাছে থাকেন শিবাজী। অলস ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে দিন কাটান।

শাহাজাদী মেহেরুন্নিসার চিন্তায় বার বার মনটা ভরে উঠতে চায়। সে ইচ্ছা কঠিনভাবে দমন করতে যান। পারেন না। বার বার ব্যর্থ হন।

কাছে যখন ছিলেন তখন নিজেকে এভাবে পীড়িত বোধ করেননি শিবাজী। কিন্তু দূরে এসে বার বার মনটা ভরে উঠতে চাইছে তারই চিন্তায়।

এ চিন্তা দূর করতে ব্যর্থ হন। একাকী থাকলে এ চিন্তার হাত থেকে রেহাই নেই জেনে সব সময় মাতা পুত্রের কাছে থাকতে চেষ্টা করেন। কথায় কথায় ভুলিয়ে রাখতে চান নিজেকে। পারেন না। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। পালিয়ে আসেন নির্জনে। মনের অসম্ভব দুরাশাকে দমন করেন। জাতি ধর্ম দেশের কথা ভেবে অস্থির হয়ে ওঠেন। চিন্তায় চিন্তায় দিন রাত ক্ষত বিক্ষত হন অন্তরে। মনের এই অসম্ভব বোঝাটাকে নামিয়ে দিতে চান। কিন্তু কার কাছে যাবেন ? চাইবেন মতামত ? গুরুদেব রামদাস স্বামীরও আজ বহুদিন কোন সংবাদ নেই। জীবিত আছেন কি না কে জানে।

মুক্ত পুরুষ তিনি। পথের ডাক শুনলেই সব বাঁধন কাটিয়ে পথে নামেন। কারো কোন নিষেধ শোনেন না। ঘুরে বেড়ান তীর্থে তীর্থে। দিন মাস বছর কাটিয়ে ফিরে আসেন একদিন।

দিন কয়েক পরেই ছুটে আসে মালশ্রী।

কি সংবাদ মালশ্রী ?

সংবাদ শুভ প্রভু।

কি জন্যে আবার ছুটে এলে ?

আপনার সংবাদ নিতে।

আমার সংবাদ নিতে! আশ্চর্য হন শিবাজী। এই তো পক্ষকাল কাটিয়ে বিদায় নিয়ে গেলে। আবার···

আমার জন্যে সংবাদ নিতে ছুটে আসিনি প্রভু।

তবে ?

নীরাবাঈয়ের অনুরোধ আমাকে ছুটে আসতে বাধ্য করেছে।

কেন ?

নীরাবাঈয়ের কাছে জানলাম আপনি চলে আসবার পর শাহাজাদী বড় অধীরা হয়ে উঠেছিলেন।

এ তাঁর অন্যায় মালশ্রী।

হ্যাঁ প্রভু। তাছাড়া আপনার সংস্পর্শে, যে পরিবর্তন তাঁর মাঝে এসেছিল, তা তিনি রাখতে পারেন নি। নীরাবাঈয়ের কাছে শুনলাম···

কি শুনলে মালশ্রী ? ব্যাকুলতা আসে শিবাজীর কণ্ঠে।

তিনি আবার সুরা স্পর্শ করতে সুরু করেছেন।

কি বলছ মালশ্রী !

সত্য প্রভু।

চিন্তায় ভরে যায় শিবাজীর মন। শাহাজাদী মেহেরুন্নিসাকে নতুন করে মনে পড়ে। মোগল হারেমের বিলাসিনী মূর্তিখানিকে। শত বিলাস দ্রব্য আর অজস্র অন্যায়ের মাঝে যে নিমজ্জিত ছিল কিন্তু শিবাজীর হাতে বন্দিনী হয়ে পাল্‌টে গেল যার রূপ। জীবনে এল এক অদ্ভুত পরিবর্তনের স্রোত। এক আত্যাশ্চর্য পরিচয় স্থাপন করল সেই বিলাসের মূর্তিখানি। ভালোবাসা কি যে জানতো না সেই ভালবাসতে শিখল। কিন্তু প্রতিদানে কিছুই পেল না। না সমর্থন না প্রতিদান। দূরে সরে এলেন তিনি। বুঝি ভালোবাসার অনুশোচনার ধিক্কার এলো তার জীবনে যে সুরা সে ত্যাগ করেছিল গরল বলে তাই আবার তুলে নিলো। কিন্তু কেন ?

প্রভু। ডাকে মালশ্রী।

বল।

আপনি ফিরে চলুন।

মালশ্রী।

প্রভু।

জাতি ধর্ম দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করে শুধু মাত্র এক নারীর মনের অসম্ভব বাসনাকে চরিতার্থ করতে আমায় তুমি একি অনুরোধ করছ মালশ্রী ?

অসম্ভব নয় বলেই আমরা এ অনুরোধ করছি প্রভু।

অসম্ভব নয় !

না প্রভু। আমি জানি আমি বিশ্বাস করি আপনিও শাহাজাদীকে ভালোবাসেন। এ ভালোবাসা আমি অন্যায় মনে করি না প্রভু।

দেশের স্বাধীনতা যদি এর জন্যে বিপন্ন হয় ?

দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে না প্রভু।

হবে না।

না।

এ বিশ্বাস তুমি কোথায় পেলে ?

শাহাজাদীর মাঝে।

মালশ্রীর কথায় চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে শিবাজীর মন। একি বলছে মালশ্রী। এ বিশ্বাস কোথা থেকে এল মালশ্রীর মনে !

প্রভু।

কি ?

আপনি চলুন।

যাবো মালশ্রী।

সব কথা বলে মায়ের কাছে বিদায় নেয় শিবাজী। আবার মাতা পুত্রের আঁখি অশ্রুতে সজল হয়ে ওঠে।

মঙ্গলগড় দুর্গ উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন শিবাজী আর তন্নজী মালশ্রী।

দুর্গ-প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে পুত্রের যাত্রা পথের দিকে অশ্রু-সজল নেত্রে তাকিয়ে থাকেন জীজাবাঈ শম্ভুর হাত ধরে !

কি এক অশুভ আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে জীজাবাঈয়ের মন। মনে হয় পুত্রের এই যাত্রা নিবৃত্ত করে ধরে রাখেন নিজের কাছে।

দীদা।

বল বাবা।

তুমি কাঁদছ কেন দীদা ?

কাঁদিনি বাবা।

তবে তোমার চোখে জল কেন ?

এ জল যে আমার জীবনের সম্বল দাদু। যেদিন তোর দাদুর কাছ থেকে দূরে সরে এসেছিলুম সেদিন থেকে আমার চোখের জল জীবনের সম্বল হয়েছে দাদু।

অতীতকে মনে পড়ে বৃদ্ধা জীজার।

স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করলেন। অভিমানে দূরে সরে এলেন জীজা। বালক শিবাজীকে নিয়ে দাদাজী কানাই দেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করতে লাগলেন জীজাবাঈ। সেদিন স্বপ্ন দেখতেন বালক শিবাজী বড় হয়ে তাঁর সব দুঃখ দূর করবে।

বড় হয়ে উঠতে লাগলো শিবাজী। হয়ে উঠলো দুরন্ত কিশোর। মাওলী বন্ধুদের নিয়ে সারাদিন বনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ভয় হতো জীজার। অনুযোগ করতো বৃদ্ধ দাদাজীর কাছে। সব শুনে রেগে উঠতেন বৃদ্ধ। বলতেন আজ শিবাজী ফিরে এলে তাকে তিনি কঠিন দণ্ড দেবেন।

এক সময় ফিরতো শিবাজী। পরিশ্রান্ত অবসন্ন ক্লান্ত একটি কিশোর সারাদিনের দুরন্তপনার পরিশ্রমে ক্লান্ত মূর্তি নিয়ে অপরাধীর মত এসে দাঁড়াতো দাদাজীর সামনে। শিবাজীকে দেখে সব ভুলে যেতেন বৃদ্ধ। মৃদু তিরস্কার করতেন তার দুরন্তপনার জন্যে। জীজাকে উদ্দেশ্য করে শিবাজীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে বলতেন।

হাসি পেত জীজার। যেমন পুত্র তেমনি দাদাজী। অবাধ্যতার শাস্তি না দিয়ে ক্লান্ত কিশোরের বিশ্রামের ব্যবস্থার আদেশ দিতেন। অনুযোগ করতো জীজা।

পণ্ডিতজী এই কি আপনার শাস্তি দেওয়া ?

হাসতেন বৃদ্ধ। বলতেন, মা যেদিন সত্যিই শাস্তির প্রয়োজন বোধ করব সেদিন আমার শাস্তির রূপ দেখে শিউরে উঠবি মা। কিন্তু বিনা অপরাধে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিই কেমন করে বলতো মা ?

ওর দুরন্তপনা যে দিন দিন বেড়ে উঠছে পণ্ডিতজী ?

তা উঠুক মা। কিশোর যদি দুরন্তপনাই না করলো তবে তার কিশোর নামের সার্থকতা কোথায় ? কিশোরের দুরন্তপনা তো অন্যায় নয় মা। আমি কি করে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়ে ওর কিশোর মনকে ভেঙে দিই বল ?

কিন্তু লেখা পড়া যে কিছুই শিখল না ও।

প্রয়োজন কি ? ও যা শিখেছে তাতেই ওর মুখোজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কিন্তু লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন নেই কি ?

আছে মা। জীবনে লেখাপড়া শেখার মূল্য অনেক। কিন্তু ও শিখবে কখন বল। ভোরের আলো ফুটতে যাকে বাইরে টেনে নিয়ে যায় ঘরের পড়া সে করবে কখন।

চুপ করে থাকতেন জীজাবাঈ।

দাদাজী অনেক চেষ্টা করেছিলেন লেখাপড়া শেখাতে কিন্তু কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারেন নি।

নিজে না পড়ে দাদাজীকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প করতে বলতো। নানান প্রশ্নে অস্থির করে তুলতো বৃদ্ধকে। হাসি মুখে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেন বৃদ্ধ।

কিছুদিন পরে, মাত্র অল্প কয়েকজন মাওলী বন্ধু নিয়ে চাকন দুর্গ অধিকার করল শিবাজী। চাতুরী করে কেল্লাদারকে বশীভূত করে হস্তগত করল দুর্গ। পরের বছর নিজেই নতুন দুর্গ তৈরী করল বন্ধুদের সহায়তায়। নাম রাখল রায়গড়।

কিন্তু বিজাপুরের সুলতান শাহজীকে শিবাজীর এই উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করে শাস্তির ভয় দেখালেন। ঘুরে এলেন শাহজী। সাক্ষাৎ হল না পুত্রের সঙ্গে। শিবাজীকে নিরস্ত করবেন বলে সান্ত্বনা দিয়ে শাহজীকে বিজাপুর পাঠিয়ে দিলেন দাদাজী।

শিবাজীকে কাছে ডেকে পিতার সর্বনাশের কথা জানালেন। নিরস্ত হতে বললেন।

এর কিছুদিন পরে মৃত্যু হ'ল দাদাজীর।

দাদাজীর মৃত্যু শয্যার পাশে ছুটে এসেছিল পুত্র।
শিবাজী।
দাদাজী।
মনে প্রাণে বিশ্বাস রেখে পথ চলবে পুত্র। যত কঠিন বাধা বিপত্তিই আসুক শান্ত হয়ে কাজ করবে। দেখবে পরাজয় কোনদিন আসবে না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যে ব্রত তুমি নিয়েছ এর থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই আর জীবনে। আর্তের রক্ষা জীবনের মূলমন্ত্র কর পুত্র।
অদ্ভুত স্নিগ্ধতায় ভরে গিয়েছিল বৃদ্ধের মুখ।
দিনে দিনে একের পর এক দুর্গ জয় করেছিল শিবাজী। দেশের স্বাধীনতার জন্যে জীবন পণ করেছিল। গর্বে জীজাবাঈয়ের বুক ভরে গিয়েছিল। কিন্তু চোখের অশ্রু কোন দিন শুকোয় নি।

॥ পনেরো ॥

মালশ্রীর সঙ্গে মঙ্গলগড় দুর্গে ফিরে আসেন শিবাজী।
নীরাবাঈ এসে নতমুখে কাছে দাঁড়ায়।
শাহাজাদী কেমন আছেন নীরাবাঈ? জিজ্ঞাসা করেন শিবাজী। ম্লানমুখী নীরা প্রভুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। শুধু বারেকের তরে কেঁপে ওঠে ঠোঁট দুটি।
বহিন।
প্রভু।
কেমন আছেন তিনি?
ভাল আছেন। কিন্তু……
কি?
যে সুরা তিনি ত্যাগ করেছিলেন এখন দিবারাত্র সেই সুরাতেই তিনি অচেতন হয়ে থাকেন। অনেক অনুরোধ করেছি। বলেন, সুরা না খেলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

বহিন!

সত্য প্রভু। তাই নীরবে বার বার পূর্ণ করে দিই শূন্য পাত্র।

ওঃ। গম্ভীর হয়ে যান শিবাজী।

ব্যর্থ প্রেমের দাহ সহ্য করতে না পেরে সুরার নেশাতে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছে মেহেরুন্নিসা। কিন্তু এ তার জীবনে শিবাজীকে নিয়ে ক্ষণিক মোহও তো হতে পারে! ভাবেন শিবাজী।

মেহেরুন্নিসার সাহচর্যে এসে তাঁর মনেও স্নেহ সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তিনি কর্তব্য বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে পারেন নি। মেহেরুন্নিসার নীরব আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন নি দেশ জাতি স্বাধীনতার কথা বিস্মৃত হয়ে।

এর জন্যে মনে মনে কষ্ট তিনিও কম ভোগ করেন নি। দিবা রাত্র কি এক মর্ম জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কি করবেন তিনি? কি করতে পারেন?

না তিনি কিছু করতে পারেন না। নিরুপায় তিনি।

এই কৌন হ্যায়—সিরাজী লাও।

মেহেরুন্নিসার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে কক্ষ থেকে।

শাহাজাদী ডাকছেন আমি যাই। বলে নীরা।

দাঁড়াও।

প্রভু।

আমি যাচ্ছি।

দৃঢ় পদক্ষেপে কক্ষের দিকে এগিয়ে যান শিবাজী। দুরন্ত এক প্রতিজ্ঞা ফুটে ওঠে মুখে।

কক্ষে প্রবেশ করেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান শিবাজী। নিজের চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। মনে হয় নিষ্ঠুর এক স্বপ্নের মাঝে এসে পড়েছেন তিনি।

এই কি সেই শাহাজাদী মেহেরুন্নিসা? মাত্র কদিনে সেই সদ্য ফোটা ফুলের মতো কোমল স্নিগ্ধ মূর্তিটির এ কি পরিবর্তন হয়েছে!

শিথিল বসন। বিশৃঙ্খল কেশপাশ। চোখের কোলে কালিমা।

সর্বহারা রিক্তা মূর্তি। শাহাজাদীর ছায়া মাত্র।

চোখ বুজে শুয়েছিল মেহেরুন্নিসা। পদশব্দে চিৎকার করে ওঠে।

এই বাঁদী কোথা গিয়েছিলি ?

উত্তর দেন না শিবাজী। ধীর পদে এগিয়ে যান।

সরাব লাও। জলদী লে আও সরাব।

এগিয়ে গিয়ে শয্যার পাশে দাঁড়ান শিবাজী। মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকেন।

শাহাজাদী।

কে ? চমকে চোখ মেলে মেহেরুন্নিসা।

আমি মেহের।

তড়িৎ হতের মতো শয্যার ওপর থেকে নীচে নেমে আসে মেহেরুন্নিসা। সারা শরীর থর থর করে কেঁপে ওঠে। চোখ মুখ রক্ত বর্ণ ধারণ করে।

কি হ'ল ?

বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা···। আর বলতে পারে না মেহেরুন্নিসা। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে শিবাজীর দুই বাহু বন্ধনের মাঝে।

সারা রাত্রির পর চোখ খোলে মেহেরুন্নিসা আকাশে তখন প্রথম ভোরের রক্ত লেখা।

মেহের। ডাকেন শিবাজী।

উঁ।

কেমন বোধ করছ ?

ভাল।

সত্যি ?

সত্যি মহারাজ।

উঁহু।

কি ?

মহারাজ নয়।

তবে ?

তুমি বল।

রাজা। তুমি আমার রাজা। আমি……

তুমি কি ?

আমি তোমার জীবনের অভিশাপ।

না মেহের তুমি আমার জীবনের সত্য। মহা সত্য তুমি। তুমি প্রেম।

মেহেরুন্নিসার কপালের অবাধ্য চূর্ণ কুন্তলগুলি পরমযত্নে সরিয়ে দেন শিবাজী। গবাক্ষ পথে দুরন্ত বাতাস বারবার এলো মেলো করে দেয়।

রাজা।

বল।

বড় দুঃখ দিলাম তোমায়। কলঙ্কিত করলুম তোমার জীবনটাকে।

এ কথা কেন ?

যবনী আমি। আমি বিধর্মী।

প্রেম তো ধর্মাধর্মের বিচার করে না।

তবে ?

আমি আমার দেশের কথা বড় করে ভাবি মেহের। তাই…

আমিও ভাববো।

সত্য।

সত্য প্রিয়তম।

মেহেরুন্নিসার একখানি হাত চেপে ধরেন শিবাজী। মৃদু হাসির রেখা খেলা করে মেহেরুন্নিসার চোখে মুখে। দুজনে দুজনার পানে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

রাজা। একসময় ডাকে মেহেরুন্নিসা।

বল।

এবার বিশ্রাম করগে যাও।

যাই।

মেহেরুন্নিসার কাছ থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে এমনি ভাবে পাশে বসে মুখের পানে চেয়ে কাটিয়ে দেয় প্রহরের পর প্রহর। কিন্তু উঠতে হয়।

নীরাকে কাছে ডাকে মেহেরুন্নিসা।

নীরা।

শাহাজাদী।

আমার কাছে আয় নীরা।

নীরাকে নিজের কাছে বসায় মেহেরুন্নিসা।

আমার ওপর রাগ করেছিস না রে ?

রাগ !

হ্যাঁরে।

না শাহাজাদী।

অনেক কষ্ট তোকে দিয়েছি নীরা। আমাকে ক্ষমা করিস তুই।

ও কথা বলবেন না শাহাজাদী।

একটু চুপ করে থাকে মেহেরুন্নিসা। নীরার মুখের দিকে তাকায়। বলে।

আচ্ছা নীরা।

বলুন শাহাজাদী।

আমাকে তোর কেমন মনে হয় ?

কেন ?

শুনতে বড় ইচ্ছে করছে। বড় নীচ মনে হয় না রে ?

ছিঃ শাহাজাদী ওকথা বলবেন না। একটু চুপ করে থাকে নীরা। বলে, আমি সামান্যা দাসী যদি কিছু মনে না করেন আজ একটা কথা বলব আপনাকে।

কি কথা নীরা ?

আপনাকে আমার বোনের মতো মনে হয়।

বোনের মতো !

হ্যাঁ শাহাজাদী। আজ নয় যেদিন রাত্রে প্রথম আপনাকে দেখি সেদিন-ই ওই কথা মনে হয়েছিল। আপনার মতই জেদী আমার বোন।

সে কোথায় ?

জানি না শাহাজাদী। সে আজ আছে কি নেই ভগবান জানেন।
কি হয়েছিল তার ?
শুধু তার নয় শাহাজাদী, বাদশাহের সৈন্যরা আমাদের ভাগ্যে সেদিন দুঃখের আগুন জ্বেলে দিয়েছিল।
কেন ?
আমার আর আমার বোনের জন্যে। সেদিন প্রভু যদি সেই পশুদের হাত থেকে উদ্ধার না করতেন মৃত্যু ছাড়া গতি ছিল না আমার।
এ তুই কি বলছিস নীরা ?
এই সত্যি শাহাজাদী।
আমাকে তোর সব কথা বল নীরা।
নাইবা সে দুঃখের কথা শুনলেন শাহাজাদী।
না আমি শুনবো তুই বল।
বলে নীরা। তাদের সুখ শান্তি ভরা ছোট্ট সংসারটার কথা। চাষীর ঘর। দুই বোন, বাবা আর ছোট্ট একটি ভাই। অভাব অনটন থাকলেও শান্তিতে ভরা ছিল তাদের ছোট্ট সংসারটা।
কিন্তু সে শান্তি রইল না। কাল বৈশাখীর ঝড়ের মতো একদিন রাত্রে তাদের ছোট্ট সংসারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দস্যুর দল। তছনচ করে দিল সব কিছু। বাবা আর ছোট ভাইকে চোখের সামনে হত্যা করল। ছোট বোন আর তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল সেই দস্যুরা।
রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর।
সেই তৃতীয় প্রহর রাত্রে নরখাদক দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এক তরুণ যোদ্ধা। আহত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল কয়েকজন দস্যু। নিয়ে গিয়েছিল বোনকে।
বহিন। কাছে এসে মৃদুস্বরে ডেকেছিলেন তরুণ।
চোখ তুলে তাকিয়েছিল নীরা। কান্নার বেগে কথা বলতে পারে নি।
তোমার যে সর্বনাশ হ'ল তার সান্ত্বনা নেই বহিন তবু বলছি সংসারে সুখ দুঃখ আছে। তোমার এই বিপদে তোমার পাশে দাঁড়ানই আমার কর্তব্য কিন্তু আমি নিরুপায়, দিনের আলো ফোটবার আগেই আমাকে

নিরাপদ আশ্রয় নিতে হবে। আমাকে বিদায় দাও বহিন।

কে আপনি ?

আমি শিবাজী।

চমকে উঠেছিলুম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি। মনে হয়েছিল আমি স্বপ্ন দেখছি। সে সময় শিবাজী লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিজাপুর নবাবের সৈন্যরা খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন শিবাজীকে।

বলেছিলুম, জগতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। বিপদ থেকে যখন রক্ষা করলেন তখন নিরাপদ আশ্রয় একটু দিন।

আশ্রয় !

হ্যাঁ।

সুখহীন কঠিন জীবন যাপন করতে পারবে তুমি ?

পারবো। বলেছিলুম আমি।

নিয়ে এসেছিলেন আমাকে। প্রভুর মায়ের কাছে তিন বছর আছি। তারপর এখানে আমার ডাক এলো একদিন। এলুম এখানে।

এলেন আপনি। আপনার পরিচর্যার ভার দিলেন আমায়। বললেন, জাতি ধর্ম সব ভুলে যেতে হবে তোমাকে। সব ভুলে সেবা করবে। দেখলুম আপনাকে। মনে হল আমার সেই অনেকদিন আগে হারিয়ে যাওয়া বোনই আপনি। তেমনি জেদি।

চুপ করে নীরা।

নীরাকে কাছে টেনে নেয় মেহেরুন্নিসা বলে, আমি তোমার হারিয়ে যাওয়া বোন। তুমি আমার দিদি।

শাহাজাদী।

শাহাজাদী নয় মেহের বল।

অবাক বিস্ময়ে শাহাজাদীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নীরা। কথা বলতে পারে না।

মেহেরুন্নিসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুর্গ প্রাচীরের উপর এসে দাঁড়ান শিবাজী।

একসময় কাছে এসে দাঁড়ায় মালশ্রী।

প্রভু।

মালশ্রী।

এবার একটু বিশ্রাম করবেন চলুন।

বিশ্রাম।

হ্যাঁ প্রভু।

চলো মালশ্রী।

হঠাৎ দূরে রিক্ত প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি যায় শিবাজীর। একটু যেন চমকে ওঠেন। কে যেন দুর্গের পথেই এগিয়ে আসছে।

মালশ্রী।

প্রভু।

দেখ তো কে যেন এই দিকেই এগিয়ে আসছে। পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।

দেখে মালশ্রী। আগন্তুককে দেখা যায় না। তবু মালশ্রীর পরিচিত বলে মনে হয়।

প্রভু।

চিনতে পারলে?

না। তবে আমারও পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।

আমার ধারণা যদি মিথ্যা না হয় চন্দ্ররাও যদি বেঁচে থাকে তাহলে চন্দ্ররাও ভিন্ন আর কেউ নয়।

রাওজী!

হ্যাঁ মালশ্রী।

মালশ্রী আর শিবাজী আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে আগন্তুকের অস্পষ্ট মূর্তি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়। একসময় দুর্গ দ্বারের কাছে এসে দাঁড়ায় আগন্তুক। দ্বার রক্ষী বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে।

রাওজী!

হ্যাঁ ভাই। প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই আমি

কেন ?

প্রয়োজন আছে।

দ্বার রক্ষী কেল্লাদ্দারের অনুমতি নিয়ে চন্দ্ররাওকে প্রবেশ করতে দেয় ভিতরে। নিয়ে আসা হয় শিবাজীর কাছে।

শিবাজীকে প্রণাম করে চন্দ্ররাও।

চন্দ্ররাও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্ররাওয়ের দিকে তাকান শিবাজী।

প্রভু।

কি উদ্দেশ্যে তুমি আবার এসেছ ?

আমি আমার সেদিনের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

কিন্তু তুমি যে কাজ করেছিলে তার ক্ষমা নেই চন্দ্ররাও।

শিবাজীর পা দুটি জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে চন্দ্ররাও। নিজেকে বিব্রত বোধ করেন শিবাজী। কি করবেন সহসা কিছুই স্থির করতে পারেন না।

চন্দ্ররাও।

প্রভু।

তোমার সম্বন্ধে এখুনি কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্ষমা তোমাকে আমি করলেও আমার অনুচরদের মাঝে তোমার স্থান হবে কি না সেটা বিচার সাপেক্ষ। সকলের মতামত না নিয়ে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

তাহ'লে ?

আজ তুমি যাও কাল সাক্ষাৎ কোর।

কোথায় যাবো প্রভু। আমার থাকবার কোন জায়গা নেই।

বেশ তাহলে আজ থাকো। তোমার জন্যে কি করা যায় দেখবো।

শিবাজীকে প্রণাম করে কেল্লাদারের সঙ্গে বিদায় নেয় চন্দ্ররাও।

কিন্তু শিবাজী যদি একবার চিন্তা করতেন ভবিষ্যৎ তাহলে বুঝি অত বড় সর্বনাশ সে রাত্রে সংঘটিত হ'ত না কিন্তু সরল প্রাণে স্নেহের বশে তিনি চন্দ্ররাওকে আশ্রয় দিলেন।

প্রভু। ডাকে মালশ্রী।

বল ?

চন্দ্ররাও যদি…

না মালশ্রী। চন্দ্ররাও সত্যিই অনুতপ্ত। যে ভুল সে করেছিল সে ভুল তার ভেঙে গেছে। আমি যদি সেই ভুলের জের টেনে আজ তাকে দূরে সরিয়ে দিই আবার হয়তো সে ভুল করবে। তাছাড়া চন্দ্ররাও একজন প্রকৃত যোদ্ধা। আমি তাকে ঘৃণা করলেও তার বীরত্বকে শ্রদ্ধা করি মালশ্রী।

মালশ্রী নিরুত্তর।

॥ ষোলো ॥

কে ?

পদশব্দে সচকিত হয়ে ওঠে প্রহরী।

কোন সাড়া নেই। অমাবস্যার অন্ধকারটা প্রহরীর কণ্ঠস্বরে বারেক কেঁপে ওঠে মাত্র।

আবার পদশব্দ শোনা যায় দুর্গ প্রাচীরে। কে যেন নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে।

তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে প্রহরীর দৃষ্টি।

কে ?

আবার প্রশ্ন করে প্রহরী।

আমি।

ফিস ফিস করে উত্তর আসে।

কে তুমি ?

আমি চন্দ্ররাও।

রাওজী !

হ্যাঁ।

এত রাত্রে দুর্গ প্রাচীরে এসেছেন কেন রাওজী ?

ঘুম আসছে না ভাই। আমার সেদিনের অপরাধের কথা যত চিন্তা করছি ততই কান্না পাচ্ছে। তাই শয্যা ছেড়ে পালিয়ে এসেছি ভাই।

কিন্তু...

অবিশ্বাস হচ্ছে ?

অবিশ্বাস নয় রাওজী।

তবে ?

কি যেন বলতে যাচ্ছিল প্রহরী কিন্তু সে সুযোগ দেয় না চন্দ্ররাও। অতর্কিতে প্রহরীকে আক্রমণ করে। ছিন্ন শির প্রহরীর মৃত দেহ লুটিয়ে পড়ে দুর্গ প্রাচীরে।

একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্ররাও। না কেউ জানতে পারে নি। সঙ্কেত করে চন্দ্ররাও। দূর থেকে উত্তর ভেসে আসে। দুর্গ প্রাচীরের নীচে ঝুলিয়ে দেয় দড়ি।

দেখতে দেখতে মোগল সৈন্যে ভরে যায় দুর্গ প্রাচীর।

রাওজী। ডাকে আজম খাঁ।

এঁ্যা। চমকে ওঠে চন্দ্ররাও।

এবার আক্রমণ করা যাক।

হ্যাঁ খাঁ সাহেব।

সেনাদের আক্রমণ করবার আদেশ দেয় আজম খাঁ।

'আল্লা-হো-আকবর' শব্দে চিৎকার করে ওঠে মোগল সৈন্যরা।

চন্দ্ররাও দাঁড়িয়ে থাকে স্থির নির্বাক স্থাণুর মতো।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যায় শিবাজীর। বাইরে বেরিয়ে আসেন। দুর্গ প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে দেখেন অসংখ্য যোদ্ধা।

কে এরা! অবাক হন শিবাজী।

নিজের অনুচররা কি ? এত রাত্রে কি করছে সবাই দুর্গ প্রাচীরে ?

ঘুম ভেঙে নিতাইজী আর মল্ল ছুটে আসে।

প্রভু।

নিতাইজী।

দুর্গ প্রাচীরে ওরা সব কারা ?

বুঝতে পারছি না নিতাইজী।

আমার মনে হয় চন্দ্ররাও মোগল সৈন্যদের নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করবে।

চন্দ্ররাও !

হ্যাঁ। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যেতে চন্দ্ররাওয়ের খোঁজ করেছিলুম, পেলুম না। আপনি সংবাদ দিন সকলকে। এসো মল্ল।

মল্লকে নিয়ে দুর্গ প্রাচীরের দিকে ছুটে যান নিতাইজী।

নিতাইজী—নিতাইজী।

কোন সাড়া আসে না। নিতাইজী আর মল্ল ছুটে গেছে ততক্ষণে।

হঠাৎ আল্লা-হো আকবর শব্দে কেঁপে ওঠে দুর্গ।

ঘুম ভেঙে ছুটে আসে সকলে।

প্রভু। ছুটে আসে মালশ্রী।

মোগলরা দুর্গ আক্রমণ করেছে মালশ্রী। তুমি গোপন পথ মুক্ত করে রাখ, আর যদি দেখ যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব তাহলে সকলকে নিয়ে পালিয়ে যেও।

আপনি ?

আমার কথা চিন্তা কোর না। এসো তোমরা।

অনুচরদের নিয়ে আক্রমণকারীদের বাধা দিতে ছুটে যান শিবাজী।

নীরা—নীরা। হঠৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে নীরাকে জাগায় মেহেরুন্নিসা। এত চিৎকার কেন নীরা ?

সংবাদ জানবার জন্যে ছুটে যায় নীরা। ফিরে আসে একটু পরেই।

সর্বনাশ হয়েছে শাহাজাদী।

কি হয়েছে কি ?

দুর্গ আক্রমণ করেছে শত্রুরা।

কেন ?

বোধহয় আপনাকে উদ্ধার করবার জন্যে।

কথা বলতে পারে না মেহেরুন্নিসা। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

ক্রমশঃ বাইরে কোলাহল বাড়ে।

আল্লা-হো আকবর।

জয় মা ভবানী।

দু'পক্ষের চিৎকারে মুহুর্মুহু কেঁপে ওঠে বাতাস।

কি হবে নীরা? ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে মেহেরুন্নিসা।

ভবানী জানেন শাহাজাদী।

তোমার প্রভু কোথা?

বোধহয় যুদ্ধ করছেন।

কথা বলতে পারে না আর মেহেরুন্নিসা।

নীরাও নীরব থাকে।

অসির ঝন্‌ঝনা আর আর্তের চিৎকারে বারে বারে কেঁপে ওঠে বাতাস। আজম খাঁ ভেবেছিল অতর্কিত আক্রমণে নিহত করবে শিবাজী আর তার অনুচরদের কিন্তু কার্যকালে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। মারাঠার অসির আঘাতে একের পর এক প্রাণ হারাতে থাকে আজম খাঁর সৈন্যরা।

আগুন লাগিয়ে দাও। গর্জে ওঠে আজম খাঁ।

সৈন্যরা দুর্গের পর্ণ কুটিরগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে আগুনের স্পর্শে কুটিরগুলি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

বিপদ বোঝেন শিবাজী। বোঝেন জ্বলন্ত দুর্গর মাঝে যুদ্ধে বিজয় সম্ভাবনা নেই।

শিবীজী গোপনে সৈন্যদের দুর্গ পরিত্যাগের আদেশ জানান মালশ্রীকে। নীরা আর অন্যান্য দাসীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে বলেন।

তবু অপেক্ষা করেন মালশ্রী।

কিছু বলবে মালশ্রী—?

হ্যাঁ—প্রভু।

বল?

শাহাজাদীকে…

তিনি তাঁর ইচ্ছা মতো কাজ করবেন।

চলে যায় মালশ্রী—। শাহাজাদীর কক্ষদ্বারের কাছে গিয়ে নীরাকে ডাকে। জানায় শিবাজীর আদেশ।

সমস্ত কথা মেহেরুন্নিসাকে জানায় নীরা।

শাহাজাদী। ডাকে নীরা—।

এ্যাঁ।

চলুন।

না নীরা।

শাহাজাদী।

আমি থাকবো নীরা—।

থাকবেন।

হ্যাঁ।

প্রভু কিন্তু···

তোমার প্রভুকে আমার বহুৎ সেলাম জানিও।

আমার উদ্ধারের জন্যে। যদি দুর্গ জয়ের পর আমাকে পাওয়া না যায় তাহলে তোমাদের অনেক ক্ষতি হবে। তোমরা যাও নীরা—।

শাহাজাদী।

আর বিলম্ব কোর না। তোমরা যাও।

মালশ্রী ছুটে আসে।

নীরব অশ্রুসজল চোখে বিদায় নেয় নীরা। কথা বলতে পারে না। বুক ভাসে জলে।

মেহেরুন্নিসা বসে থাকে পাষাণ প্রতিমার মতো।

স্বপ্ন বোনা শেষ হয়েছে তাঁর। রূঢ় কঠিন বাস্তব তার জীবনের স্বপ্নে অন্ধকারের যবনিকা টেনে দিয়েছে নিষ্ঠুর ভাবে।

যুদ্ধ রত শিবাজীর কাছে ছুটে আসেন নিতাইজী।

প্রভু।

নিতাইজী আপনি আর বিলম্ব করবেন না। চলে যান।

তা হয় না—নিতাইজী। আপনারা চলে যান।

প্রভু, এ কি বলছেন আপনি।

ঠিকই বলছি নিতাইজী। শাহাজাদী গেছে ?

না প্রভু।

যান নি ?

না।

আর কথা বলেন না শিবাজী। দ্রুত মেহেরুন্নিসার কক্ষের দিকে ছুটে যান।

বাতায়ন পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মেহেরুন্নিসা। বাদশাহী পক্ষ আর শিবাজী পক্ষের যোদ্ধাদের রণহুঙ্কার বারবার কানে এসে বাজছিল। পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে ভেসে আসছিল অসির ঝন ঝনা। আহতের আর্তনাদ। নিহতের শেষ মৃত্যুধ্বনি।

মেহেরুন্নিসা স্তব্ধ বিস্ময়ে যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করছিল। এই যুদ্ধ! এই হিংস্র নির্মম মৃত্যু খেলার নাম যুদ্ধ। এরই জয়লাভে হয় আনন্দোৎসব। যুদ্ধ জয়ের উল্লাস ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে কণ্ঠ। গর্বে স্ফীত হয় বুক। উন্নতির সূচনা হয় এরই মাধ্যমে। হঠাৎ দ্রুত পদশব্দে সচকিত হয়ে ওঠে মেহেরুন্নিসা।

অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

মহারাজ !

মেহের।

তুমি যাওনি ?

না মাহরাজ।

তুমি পালিয়ে যাও। হয়তো এখুনি সৈন্যরা ছুটে আসবে।

আসুক।

ছেলেমানুষী কোর না প্রিয়তম। নিজের সর্ব্বনাশ তুমি এভাবে ডেকে এনো না। তোমার পায়ে ধরি তুমি পালিয়ে যাও।

তুমি যাওনি কেন ?

আমি গেলে তোমার বিপদ বাড়তো। সৈন্যরা আমাকে না পেয়ে অত্যাচার সুরু করতো নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর। সর্ব্বনাশ হত

তাহলে।

কিন্তু…

কোন কিন্তু নয় প্রিয়তম, তুমি যাও।

মেহের…

প্রিয়তম।

কাছে এগিয়ে আসে মেহেরুন্নিসা। একেবারে বুকের কাছটিতে। মেহেরুন্নিসাকে বুকের মাঝে টেনে নেন শিবাজী।

মেহের।

প্রিয়তম।

তুমি।

শিবাজীর মুখে হাত চাপা দেয় মেহেরুন্নিসা। অশ্রুসজল কণ্ঠে বলে, আমি যেখানেই থাকি তোমারই রইলাম প্রিয়তম।

শিবাজীর মুখের পানে মুখ তোলে মেহেরুন্নিসা। অধরে নেমে আসে অধর। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে মেহেরুন্নিসার সমস্ত শরীর। এ স্পর্শ জীবনে এই প্রথম। এ তার জীবনে প্রথম প্রেমের স্পর্শ।

আল্লা হো আকবর। মোগল সৈন্যরা উল্লাস ধ্বনিতে এগিয়ে আসে।

প্রিয়তম।

যাই মেহের।

আর বিলম্ব করেন না শিবাজী। দুর্গের পিছন দিকে উপস্থিত হন। নীচে বেগবতী নীরা।

ধীরে ধীরে দুর্গ প্রাচীর বেয়ে নামেন শিবাজী।

হঠাৎ পা পিছলে যায়। নিজেকে সামলাতে পারেন না। দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে ঠাণ্ডা কনকনে জলে সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যায় শিবাজীর।

জলের মধ্যেই জ্ঞান হারান।

॥ সতেরো ॥

দ্রুত কক্ষে এসে প্রবেশ করে আজম খাঁ।

শাহাজাদী।

আজম খাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় মেহেরুন্নিসা।

আমি বাদশাহের আদেশে আপনাকে উদ্ধার করবার জন্য দুর্গ আক্রমণ করেছিলুম, দুর্গ জয় সম্পূর্ণ হয়েছে শাহাজাদী।

ধন্যবাদ খাঁ সাহেব। মৃদু নিরস কণ্ঠে বলে মেহেরুন্নিসা।

কিন্তু···। কুণ্ঠিত ভাবে মেহেরুন্নিসার দিকে তাকায় আজম খাঁ—।

বলুন খাঁ সাহেব।

শিবাজী কোথায় জানেন?

না।

আমি জানি খাঁ সাহেব।

কক্ষে এসে প্রবেশ করে চন্দ্ররাও।

রাওজী।

হ্যাঁ খাঁ সাহেব। সেই শয়তানকে হত্যা করবো বলেই ছুটে গিয়ে ছিলুম কিন্তু পারলুম না।

কি হল?

পালিয়ে গেল শয়তান।

কোথায়?

যমালয়ে।

সে কি!

এই সত্যি। দুর্গ প্রাচীর থেকে নদীর জলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে শিবাজীর। যদি···

বাঁচা সম্ভব নয় খাঁ সাহেব। মৃত্যুই হয়েছে শিবাজীর।

হা হা করে উল্লাসে হেসে উঠে চন্দ্ররাও।

চন্দ্ররাওয়ের হিংস্র কুটিল মুখের পানে তাকিয়ে পাষাণের মতো স্থির

হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেহেরুন্নিসা।

তারপর দিল্লীর পথে।

শিবিকা বাহকরা শিবিকা নিয়ে সৈন্যদের মাঝে এগিয়ে চলে। চারি পাশে মুক্ত তরবারি হাতে এগিয়ে চলে বাদশাহী সৈন্যের দল।

এমনি আদেশ দিয়েছে আজম খাঁ।

শিবাজীর আশ্রয়ে বন্দিনী মেহেরুন্নিসার নিজেকে একদিনের জন্যেও বন্দিনী মনে হয় নি কিন্তু বাদশাহী সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে দিল্লী যাত্রায় মেহেরুন্নিসার নিজেকে আজ বন্দিনী বলেই মনে হয়। মনে হয় সে যেন বন্য পশু। শিকারীর দল তাকে খাঁচায় বন্ধ করে শিকারের আনন্দ উল্লাসে মত্ত হয়ে ফিরে চলেছে সগৌরবে।

শিবাজীর কথা মনে পড়ে মেহেরুন্নিসার। মনে পড়ে নীরার কথা আর পাহাড়বেষ্টিত সেই দুর্গম দুর্গের পরিচিত কক্ষটিকে যেখানে বন্দিনী মেহেরুন্নিসা ইচ্ছামতো কাটিয়ে এসেছে কটি মাসের প্রতিটি দিন রাত্রি। সেখানের প্রতিটি দ্রব্য এই ক'মাসে মেহেরুন্নিসার অতি পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

বেলোয়ারী ঝাড়ের আলো ছিল না সেখানে। ছিল না হারেমের বিবিধ বিলাস উপকরণ যার মাঝে বড় হয়ে উঠে তার শৈশবের দিন থেকে আজকের যৌবনদীপ্তা মেহেরুন্নিসার দিন কেটেছে। তবু যা ছিল তার মধ্যে দেখেছে সুরুচির প্রকাশ।

নীরাকে আজ বড় বেশি করে মনে পড়ে। বড় দুঃখী মেয়েটী। তবু যেন ওর মাঝে কি এক সুখের আশ্বাস বেঁচে আছে।

মনে পড়ে সাহিরাকে। ব্যথা জাগে মনে। বাঁদীর দুঃখ ভরা জীবন থেকে চিরমুক্তির দেশে চলে গেছে সাহিরা।

চলে গেছেন শিবাজী।

মেহেরুন্নিসার জন্যেই শেষ হয়ে গেছেন তিনি।

তার জন্যেই মৃত্যু হয়েছে শিবাজীর।

আর কিছু ভাবতে পারে না মেহেরুন্নিসা। সমস্ত ভাবনা চিন্তাগুলো

শিথিল হয়ে যায়। কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে আসে। দুরন্ত কান্নায় শিবিকা মধ্যে লুটিয়ে পড়ে মেহেরুন্নিসা।

শাহাজাদী।

মৃদুকণ্ঠে ডাকেন মহারাজ জয়সিংহ।

নির্বাক মেহেরুন্নিসা বৃদ্ধ জয়সিংহের মুখের পানে তাকায়।

একথা সত্য শাহাজাদী ?

আবার জিজ্ঞাসা করেন জয়সিংহ। এবারও কোন উত্তর দিতে পারে না মেহেরুন্নিসা।

শাহাজাদী।

বলুন।

এ কথা কি সত্য ?

সেনাপতির পত্রে সব তো জেনেছেন মহারাজ।

সত্য। তবু…

কি ?

বিশ্বাস করতে মন চাইছে না শাহাজাদী।

যা সত্য তা বিশ্বাস না করা ছাড়া উপায় কি মহারাজ।

সত্য শাহাজাদী। তবু মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা মস্ত ভুল থেকে গেছে। শিবাজীর মৃত্যু এত সহজে সম্ভব নয় শাহাজাদী।

এ আপনার মনের দুর্বলতা।

হবে। বৃদ্ধ হয়েছি, দুর্বলতা আসা স্বাভাবিক। তবু শিবাজীর মৃত্যু সংবাদ আমি বিশ্বাস করি না শাহাজাদী।

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মেহেরুন্নিসার দুটি চোখ।

আর কথা বলেন না জয়সিংহ। ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসেন। শিবাজীকে দমন করবার জন্যে আওরঙজেবের আদেশে দিল্লী থেকে মহারাষ্ট্র যাত্রা করেছিলেন জয়সিংহ। পথে হঠাৎ শরীর অসুস্থ হওয়াতে শিবির স্থাপন করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, এমন সময় সেনাপতি আজম খাঁর সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে উপস্থিত হ'ল শাহাজাদী। পেলেন আজম খাঁর পত্র। পত্র পড়ে বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে গেলেন জয়সিংহ।

শিবাজীর মৃত্যু সংবাদে এত বিচলিত হয়ে পড়লেন যে সহসা কি করবেন কিছুই স্থির করে উঠতে পারলেন না। পারলেন না শিবাজীর এই মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করতে।

শাহাজাদা আকবর কাছেই ছিল। জয়সিংহের বিচলিত ভাব দেখে এগিয়ে এসেছিল।

পত্রে কি কোন দুঃসংবাদ লেখা আছে মহারাজ?

না শাহাজাদা।

তবে?

কথা বলেন নি জয়সিংহ। আজম খাঁর পত্রখানি নীরবে এগিয়ে দিয়েছিল শাহাজাদা আকবরকে।

পত্র পাঠ করে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আকবরের মুখ।

মহারাজ।

নীরবে তাকিয়ে ছিলেন শাহাজাদার মুখের দিকে।

এ তো আনন্দ সংবাদ।

হ্যাঁ শাহাজাদা।

তবে?

শাহাজাদা আকবরের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন জয়সিংহ। দেখে ছিলেন আকবরের চোখে অবিশ্বাসের ছায়া। কথা বলেন নি জয়সিংহ বলতে পারেন নি। কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কর্তব্যের কঠিন নাগপাশে বাঁধা তিনি। শিবাজীকে দমন করার জন্যে রাজপুত সৈন্য নিয়ে ছুটে এসেছেন মহারাষ্ট্রে। সমরক্ষেত্রে শিবাজীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে তাঁকে। হয়তো শেষ করতে হবে শিবাজীর স্বাধীনতার স্বপ্নকে। তবু শিবাজীকে তিনি মনে মনে সমর্থন করেন। শ্রদ্ধা করেন অসীম সাহসী মারাঠা বীরের শক্তিকে। তাই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি।

মহারাজ।

বলুন শাহাজাদা।

শিবাজীর মৃত্যু সংবাদ আপনাকে আঘাত দিয়েছে না?
দিয়েছে শাহাজাদা।
হয়তো শিবাজীর মৃত্যু কাম্য ছিল না আপনার?
সত্য শাহাজাদা।
তাহলে? তীক্ষ্ণ শোনায় শাহাজাদা আকবরের কণ্ঠ।
বলুন।
শিবাজীকে আপনি সমর্থন করেন?
করি।
করেন? রূঢ় শোনায় আকবরের কণ্ঠ।
করি শাহাজাদা। জীবন পণ করে যে বীর জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেন তিনি আমার নমস্য।
তাহলে এ কপটতার কি প্রয়োজন ছিল মহারাজ?
কপটতা!
হ্যাঁ, ভাই। পিতা আপনাকে বিশ্বাস করে শিবাজীকে দমন করবার জন্যে পাঠিয়েছেন কিন্তু শিবাজীর মৃত্যু সংবাদে যে পরিচয় আপনার প্রকাশ হয়ে পড়লো তা যদি পিতা ঘুণাক্ষরে জানতে পারতেন তাহলে এমন গুরুদায়িত্ব তিনি কিছুতেই আপনাকে দিতেন না বলেই আমার বিশ্বাস।
স্থির দৃষ্টিতে শাহাজাদা আকবরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন জয়সিংহ। আকবরের ভ্রূকুটি কুটিল মুখের পানে তাকিয়ে পেয়েছিলেন তার নীচ মনের পরিচয়। বলেছিলেন, আপনার ধারণা সত্য নয় শাহাজাদা।
সত্য নয়!
না। গম্ভীর হয়েছিলেন জয়সিংহ। বাদশাহ আলমগীর মহারাজ জয়সিংহের মনের খবর ভাল করেই জানেন। একটা কথা বলছি, মহারাজ জয়সিংহ বিশ্বাসঘাতক নয়।
কথা বলে নি শাহাজাদা আকবর। নীরবে স্থান ত্যাগ করেছিল।
শাহাজাদী মেহেরুন্নিসার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন জয়সিংহ সংবাদের সত্যতা জানবার জন্যে। নিরাশ হয়েছেন জয়সিংহ। প্রমাণ হয়েছে

পত্রের লিপিই সত্য।

তবু মন মানতে চায় না। বিশ্বাস করতে পারেন না সত্যই শিবাজী মৃত। দূরে মহারাষ্ট্রের পর্বত শ্রেণীর দিকে তাকান জয়সিংহ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে পর্বতের অন্তরালে। কেঁপে ওঠেন। এ কি দেখলেন তিনি!

একদিন রাজপুতনায় সূর্যাস্তের পর রাজপুতের জীবনে অমানিশার দুঃস্বপ্ন ভরা যে সন্ধ্যা নেমেছিল এওকি তাই! মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাতের শুভলগ্নে মারাঠার ভাগ্যাকাশেও কি নেমে এল ধূসর সন্ধ্যা।

না-না-না। কখনই না। মহারাষ্ট্রের জীবনে অন্ধকারের যবনিকা নেমে আসতে পারে না। তাহলে জয়সিংহের মনের গোপন স্বপ্ন যে মিথ্যা হয়ে যাবে।

শিবাজী বেঁচে আছেন। নিশ্চয় বেঁচে আছেন শিবাজী। যদি বেঁচে থাকেন জয়সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা না করে মারাঠার জীবনকে শান্তিময় করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। বিফল হতে দেবেন না শিবাজীর স্বপ্নকে।

মহারাজ।

বলুন শাহাজাদা।

বৃথা সময় নষ্ট না করে দিল্লী ফিরে গেলেই তো হয়।

সত্য শাহাজাদা।

তাহলে যাত্রার আয়োজন করি?

করুন শাহাজাদা।

সৈন্যদের তাহলে সেইমতো আদেশ দিন।

আপনার সৈন্যদের আদেশ দেওয়া আমার তো শোভা পায় না শাহাজাদা।

আপনি তাহলে দিল্লী ফিরবেন না?

বাদশাহকে সেই রকমই সংবাদ পাঠিয়েছি। মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে জয়সিংহের মুখে।

মহারাজ।

ক্রুদ্ধ হয় শাহাজাদা আকবর।

বলুন শাহাজাদা।

আপনাকেও আমার সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করতে হবে।

আমার পক্ষে দিল্লী যাত্রা করা সম্ভব নয় শাহাজাদা আকবর।

সম্ভব না হলেও যাত্রা করতে হবে।

এ আপনার অনুরোধ না আদেশ?

যদি বলি আদেশ।

তাহলে সবিনয়ে শাহাজাদা আকবরকে মহারাজ জয়সিংহ জানাচ্ছে যে, এ অন্যায় আদেশ পালন করতে বাধ্য নয়।

তাহলে কি করবেন আপনি?

সে কথাও বাদশাহকে সবিস্তারে জানিয়েছি।

আমি শুনতে পারি না?

না শাহাজাদা। সব বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আপনি শাহাজাদীকে নিয়ে দিল্লী ফিরে যান।

যদি না যাই।

তাহলে শাহাজাদীকে দিল্লী পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। আর আপনাকে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান করতে হবে।

জয়সিংহের কথায় অপমানে কালো হয়ে ওঠে আকবরের মুখ। লজ্জায় ঘৃণায় স্থান ত্যাগ করে আকবর।

মনে মনে মৃদু হাসেন জয়সিংহ। অপদার্থ শাহাজাদার প্রতি ঘৃণায় ভরে যায় মহারাজ জয়সিংহের মনটা। সাক্ষাৎ করেন মেহেরুন্নিসার সঙ্গে।

শাহাজাদী।

আসুন মহারাজ।

যদি কিছু মনে না করেন একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো?

বলুন।

আচ্ছা, আপনি জানেন শিবাজীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল কি না?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মহারাজ?

প্রয়োজন আছে শাহাজাদী।

কি প্রয়োজন?

আমি বিশ্বাস করি না শিবাজী মৃত।

মহারাজ!

হ্যাঁ শাহাজাদী।

কথা বলতে পারে না মেহেরুন্নিসা। অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে যায় আঁখি দুটি। অবাক বিস্ময়ে জয়সিংহের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শাহাজাদী।

এঁ্যা।

কি হল শাহাজাদী?

মৃতদেহ প্রাপ্তির সংবাদ আমি শুনি নি মহারাজ। তবে···

বলুন শাহাজাদী।

নদীর স্রোতে ভেসে যেতে পারে।

অসম্ভব নয়। তবু আমরা যা অসম্ভব বলে মনে করি চতুর শিবাজী তাই সম্ভব করে তোলেন অদ্ভুত উপায়ে। তাই আমার বিশ্বাস শিবাজীর মৃত্যু হয় নি।

যদি আপনার কথা সত্য হয়···

বলুন শাহাজাদী।

তাঁকে দমন করবার জন্যে যাবেন?

হ্যাঁ শাহাজাদী। আমি বাধ্য। আমি বাদশাহের গোলাম। যদি তাঁর প্রয়োজনে আমার প্রিয়জনের বুকে ছুরি মারতে আদেশ দেন··· মারবেন আপনি?

মারতে আমি বাধ্য শাহাজাদী। কারণ গোলামীর কঠিন শৃঙ্খলে বন্দি আমি, ইহ জীবনে আমার মুক্তি নেই।

কথা বলে না মেহেরুন্নিসা। বৃদ্ধ জয়সিংহের মুখের দিকে অবাক

বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। শিবাজীর প্রতি কি গভীর স্নেহ বৃদ্ধের অন্তরে।

ইচ্ছা করে সব কথা বলে। অনুরোধ করে যদি তিনি জীবিত থাকেন তাহলে মহারাজ জয়সিংহ শাহাজাদীর প্রতি করুণা করে তাঁর কোন ক্ষতি যেন না করেন। কিন্তু কোন কথাই প্রকাশ করতে পারে না মেহেরুন্নিসা।

এক সময় যাত্রা কাল উপস্থিত হয়। দিল্লীর পথে যাত্রা করে মেহেরুন্নিসা।

॥ আঠারো ॥

ধীরে ধীরে এক সময় জ্ঞান ফিরে আসে শিবাজীর। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে পড়ে থাকেন। চোখ মেলতে পারেন না। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হয় নিষ্ঠুর ভাবে দংশন করছে যেন কিসে।

উঃ। কাতর আর্তনাদ করে ওঠেন শিবাজী।

দ্বার খোলার শব্দ হয়। এক ঝলক দিনের আলো এসে পড়ে অন্ধকার ঘরে। চোখ মেলে তাকাতে যান। পারেন না। কষ্ট হয়।

শুনছেন। পাশে নারীকণ্ঠ শোনা যায়।

উঁ।

কেমন বোধ করছেন ?

ভাল—। এবার জোর করে চোখ মেলেন। কষ্ট হয়। মনে হয় বুঝি চোখের পাতা ছিঁড়ে যাবে। স্পষ্ট কিছু দেখতে পান না। অন্ধকার ছায়া ছায়া একখানি মুখ।

শুনছেন ? আবার সেই কণ্ঠ শোনা যায়।

উঁ।

কষ্ট হচ্ছে ?

জল।

জল দেয় নারী। পান করেন।

ঘুম! ঘুম নেমে আসে চোখের পাতায়। জেগে থাকতে চেষ্টা করেন। পারেন না। অজস্র ঘুমের কোলে ঢোলে পড়েন আবার। স্তব্ধ হয়ে শিয়রে বসে থাকে নারী মূর্তি।

একসময় দিন শেষ হয়। পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায় সূর্য। অন্ধকারে ঢেকে যায় বিশ্ব প্রকৃতি। চুপ করে বসে থাকে নারী মূর্তি। মনে পড়ে সব কথা।

প্রভাতের সূর্য তখনও ওঠে নি। আলো আঁধারীতে ভরা আকাশ বাতাস। চঞ্চলা নীরার বুকে ঘুম ভাঙানী সুর।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। দ্বার খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের আলোছায়া ভরা আঁধারের দিকে তাকিয়েছিল।

কি মনে হতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নীরার তীরে। তাকিয়েছিল চঞ্চলা নীরার অশ্রান্ত স্রোতের দিকে। কতক্ষণ তাকিয়েছিল জানে না। একসময় একটি মানুষের দেহকে ভেসে যেতে দেখে মনে হয়েছিল মৃত দেহ। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হয় নি। দেখেছিল প্রাণের স্পন্দন। অসহায় ভাবে বাঁচার আশায় চেষ্টা করছে।

উদ্ধার করেছিল মানুষটাকে। কোন রকমে তীরে তুলেছিল। একসময় চেতনা ফিরে এলে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বাইরে রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়। থেমে যায় দিনের কোলাহল। বন্য প্রাণীর হুঙ্কার আর শিবাধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে রাত্রির নিরবতা।

শেষ রাত্রের দিকে ঘুম ভাঙে শিবাজীর। চোখ মেলে তাকান। দেখতে পান জাগ্রত নারীমূর্তিকে।

এখন কি সুস্থ বোধ করছেন? মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে নারী।

হ্যাঁ।

কি আহার করবেন?

আহারের কথায় ক্ষুধা বোধ করেন শিবাজী।

হ্যাঁ।

শিবাজীকে পরম যত্নে আহার করান নারী। আহারের পর নিজেকে অনেকটা সুস্থ বোধ করেন।

আচ্ছা...

বলুন।

আমাকে কি ভাবে উদ্ধার করলেন।

সব বলে নারী। শুনে বিস্মিত দৃষ্টিতে নারীর মুখের দিকে তাকান।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? কুণ্ঠিত ভাবে বলে নারী।

বলুন।

বাড়ি কোথায় আপনার?

গ্রামের নাম বলেন শিবাজী। জেনে নেন নারীর নাম। পল্লবী।

কি ভাবে অমন হয়েছিল।

কি ভাবে যে নদীতে পড়েছিলুম ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। তবু এইটুকু মনে আছে নদীর ধারে গিয়েছিলুম তখন।

সাঁতার জানেন না?

জানি।

তাহলে...

সাঁতার দিয়েও নিজেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হই নি। যদি আমাকে উদ্ধার না করতে মৃত্যু ছাড়া গতি ছিল না আমার।

ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন তাই। তিনি যদি কৃপা না করতেন আমি শত চেষ্টাতেও আপনাকে উদ্ধার করতে পারতাম না।

অপরিচিতা এই গ্রাম্য নারীর কথায় আশ্চর্য হন শিবাজী। ভগবানের প্রতি অটুট বিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হন।

আচ্ছা বহিন।

বলুন।

আর কারোকে দেখছি না তো। কেউ কি ..

স্বামী আছে।

তিনি বাড়িতে থাকেন না?

না।

কি করেন তিনি ?

শিবাজীর আগ্রহ লক্ষ্য করে শিবাজীর মুখের পানে তাকায় পল্লবী।

থাক বহিন। যদি আপত্তি থাকে বলে কাজ নেই।

না আপত্তি কিছু নেই। আমার স্বামী শিবাজীর অনুচর।

চুপ করে যান শিবাজী। কথা বলেন না। মনে মনে ভাবেন কে এই অভাগিনী নারীর স্বামী ?

আরো ক'দিন কাটে। সুস্থ হয়ে ওঠেন শিবাজী। পল্লবীর সেবা যত্নে শরীরে ফিরে এসেছে বল শক্তি।

একদিন বলেন, এবার আমাকে বিদায় দাও বোন।

চলে যাবেন ?

হ্যাঁ। সকলে হয়তো খুব ভাবছে।

কে, কে আছে আপনার ?

মা আছেন আর এক পুত্র।

স্ত্রী ?

না তিনি স্বর্গে।

ওঃ। ব্যথা পায় পল্লবী। চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে।

বহিন।

বলুন।

এবার আমি…

আগামী কাল সকালে যাবেন।

সেদিন কাছে বসিয়ে ভালভাবে আহার করায় পল্লবী। অনুযোগ করে কম আহার করার জন্যে।

কি হচ্ছে খাওয়া ? এই সামান্য আহার না করলেই কি চলতো না ?

এর বেশি আমি খেতে পারি না বোন।

দিদি থাকলে একথা বলতে পারতেন ?

উত্তর দেন না শিবাজী। হাসি মুখে চুপ করে থাকেন।

দাদা।

বল বোন।

আমি কোন কথা শুনবো না ; সব খেতে হবে

বলছি তো কোন কথা নয়।

অসহায় শিবাজী পল্লবীর মুখের দিকে তাকান। পল্লবীর মাঝে নারীর স্নেহ কোমল অন্তরের পরিচয় পান। ভাই বলে কত সহজে আপন করে নিয়েছে ! কিন্তু যদি পরিচয় পেত তাহলে কত দূরে সরে যেত।

হ্যাঁ, পরিচয় দেবেন শিবাজী। আগামীকাল যাত্রার পূর্বে পরিচয় দিয়ে যাবেন। জেনে যাবেন পল্লবীর স্বামীর নাম।

একসময় রাত্রি প্রভাত হয়।

যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হন শিবাজী। পল্লবীর কাছে বিদায় চান।

দাদা। প্রণাম করে পল্লবী।

বল বোন।

আবার কবে দেখা পাব আপনার ?

যদি বেঁচে থাকি তাহলে নিশ্চই আসবো বোন।

একটা পুঁটলী শিবাজীর হাতে তুলে দেয় পল্লবী।

এতে কি আছে ?

খাবার আছে। পথে খিদে পেলে খাবেন।

কিন্তু তুমি যা দিয়েছ আমার একার পক্ষে এত খাওয়া কি সম্ভব হয়ে উঠবে ?

জানি না। না খেলে কিন্তু দুঃখ পাব।

হাসেন শিবাজী বল্লেন, ভয় নেই সবই খাবো।

হাসি ফোটে পল্লবীর মুখে।

আচ্ছা বোন।

কি দাদা ?

তোমার স্বামীর নাম কি ?

তাঁর নাম, চন্দ্ররাও।

ভীষণভাবে চমকে ওঠেন শিবাজী।

কি হ'ল দাদা!

কিছু না বোন।

আমার স্বামীকে চেনেন নাকি?

এঁ্যা···না তো। একবার এসে আলাপ করে যাবো।

আসবেন তো?

নিশ্চই আসবো।

পরিচয় দেওয়া হয় না পল্লবীর কাছে বিদায় নিয়ে পথে নামেন শিবাজী। পল্লবী দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। চোখ ভরা অশ্রু নিয়ে।

একদিন অপরাহ্ন বেলায় মার কাছে ফিরে আসেন শিবাজী।

মৃত পুত্রকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হ'ন জীজাবাঈ। অশ্রুজলে ভেসে যায় বুক।

সংবাদ পেয়ে একে একে সবাই আসে সাক্ষাৎ করতে। সমস্ত কথা বলেন শিবাজী। শুধু পল্লবীর পরিচয়টুকু গোপন রাখেন।

আনন্দের সাড়া জাগে চাকন দুর্গে।

প্রভু। নিতাইজী এসে কাছে দাঁড়ান।

বলুন।

মঙ্গলগড় উদ্ধারের কি উপায় করবেন।

উদ্ধার করতে হবে নিতাইজী।

কেমন করে প্রভু?

আপনারা সকলেই চিন্তা করুন। কাল সকালে আপনাদের কথা জানাবেন। আর শুনুন চন্দ্ররাওয়ের কোন সংবাদ পেয়েছেন?

না।

আচ্ছা।

মায়ের কাছে সব কথা বলেন শিবাজী। কিছুই গোপন করেন না।

পুত্র। একসময় ডাকেন জীজাবাঈ।

মা।

সে জানে তার স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা?

না মা। আমি কিছুই বলি নি তাকে।

ভাল করেছ পুত্র। হয়তো অভাগিনী সে সংবাদ সহ্য করতে পারতো না। নীরা এসে নত মুখে কাছে দাঁড়ায়।

কি মা ?

নীরাকে কাছে টেনে নেন জীজাবাঈ।

আহার্য প্রস্তুত মা।

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন জীজাবাঈ।

চল পুত্র।

চল মা।

এগিয়ে যান জীজাবাঈ। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে নীরা।

কিছু বলবে ? জিজ্ঞাসা করেন শিবাজী।

শাহাজাদী।

তিনি দিল্লী যাত্রা করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর পরিচিত জগতে ফিরে যাবেন।

ওঃ !

একটু চুপ করে থাকে নীরা। শিবাজী নীরবে নতমুখি নীরার মুখের পানে তাকান।

প্রভু।

বল নীরা।

কোন কথা বলতে পারে না নীরা। কিছুই বলা হয় না। কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেয়।

নীরার মুখের পানে অবাক বিস্ময়ে তাকান শিবাজী। সে মুখ ব্যথায় ভরা। আঁখি প্রান্তে দু ফোঁটা মুক্তার মতো অশ্রুবিন্দু।

নীরাবাঈ।

প্রভু।

কিছু বলবে ?

না।

আর দাঁড়ায় না নীরা। দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

অবাক হন শিবাজী। আজ এই প্রথম নয়।
নীরা যেন কি বলতে চায়। পারে না।
কি বলতে চায় নীরা?

॥ উনিশ ॥

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেসে ওঠে রোশেনারা।
হাসির শব্দে কেঁপে ওঠে বেলোয়ারী বাতির মৃদু নীলাভ আলো।
হারেমের বাতাস প্রতিধ্বনি তোলে সে হাসির।
রোশেনারা হাসে আর হাসে।
ভয় পায় মেহেরুন্নিসা। রোশেনারার অট্টহাসিতে কেঁপে ওঠে অন্তর।
কথা বলতে পারে না মেহেরুন্নিসা। রোশেনারার সেই আনন্দে উন্মাদিনী মূর্তির দিকে চেয়ে পাষাণের মতো স্থির হয়ে যায়।
শাহাজাদী। বিদ্রূপ তরল কণ্ঠে ডাকে রোশেনারা।
সাড়া দেয় না মেহেরুন্নিসা। কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেছে।
কি কথা বলবে না? অভিমান হয়েছে।
এগিয়ে আসে রোশেনারা। দাঁড়ায় মেহেরুন্নিসার মুখোমুখি। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। বাঁকা হাসি ফোটে মুখে। হাত বাড়িয়ে বাঁদীর হাত থেকে সুরার পাত্র নিয়ে ধরে মেহেরুন্নিসার মুখে।
মুখ সরিয়ে নেয় মেহেরুন্নিসা।
কি খাবে না?
না।
বাঃ চমৎকার। কথা ফুটেছে দেখছি। ভেবেছিলুম বোবা হয়ে গেছে বুঝি আমাদের পেয়ারের শাহাজাদী মেহেরুন্নিসা বিবি।
রোশেনারা! অসহ্য রাগে চিৎকার করে ওঠে মেহেরুন্নিসা।
বলো শাহাজাদী।
কি পেয়েছ কি তুমি আমাকে? তোমার এই ব্যবহারের অর্থ কি?

অর্থ! হাসালে শাহাজাদী। অর্থ তুমি তো ভালই জানো।

তবু আমি জানতে চাই আজকে অপমান করছ কোন্ সাহসে?

এ অপমান শাহাজাদী? তোমার এক দিনের অপমানের প্রতিদান।

রোশেনারা।

হ্যাঁ শাহাজাদী। তুমি আমাকে অনেক কাঁদিয়েছ। অনেক নিদ্রাহীন রাতে তুমি আমাকে পাগল করে দিয়েছ। প্রতিশোধ চেয়েছি সেদিন। আজ তোমার অপরাধের সুযোগ পেয়েছি তাই···

অপরাধ!

হ্যাঁ শাহাজাদী। সেই মারাঠা কুকুরটাকে ভালবাসার অপরাধ।

রোশেনারা।

চিৎকার কোর না শাহাজাদী। চোখ রাঙালে আজ রোশেনারা ভয় পাবে না। শিবাজীকে তুমি ভালোবাস নি?

তাতে তোমার কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন আছে শাহাজাদী। সব খবরই পেয়েছি। লজ্জা কি। মারাঠা কুকুরটাকে কেমন লাগলো শাহাজাদী?

সামলে কথা বল রোশেনারা।

কেন কি করবে না হলে?

থাক্। একটা কসবির ক্ষমতা আমার জানা আছে।

কসবি আমি! মেহেরুন্নিসা—!

হ্যাঁ, তাই তুমি। তোমার···

কথা শেষ করতে পারে না মেহেরুন্নিসা, রোশেনারা বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুরু হয় দুজনের চুলো চুলি। বাঁদীরা কোলাহল করে ওঠে। হারেমের সকলে ছুটে আসে।

াৎ সংবাদ আসে বাদশাহ আসছেন।

উঠে দাঁড়ায় দুজনে। তাকিয়ে থাকে পরস্পর পরস্পরের দিকে। দুজনের শরীরই দন্তাঘাতে নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত। পরনের বসন ছিন্ন ভিন্ন। দুই কুমারীর যৌবন ভরা শরীর নগ্নরূপ ধারণ করেছে। বাদশাহের আগমনের সংবাদে বাঁদীরা ঢেকে দেয় দুজনের শরীর।

বাদশাহ আওরঙজেব এসে প্রবেশ করেন কক্ষে। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে রোশেনারা। বিস্মিত হন বাদশাহ। রোশেনারার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

সত্য মিথ্যা বানিয়ে বাদশাহকে অনেক কথা বলে রোশেনারা।

রোশেনারার অভিযোগ সত্য শাহাজাদী ?

নিরুত্তরে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মেহেরুন্নিসা।

সত্য। বলে রোশেনারা।

সত্য ! কিন্তু···। ইতস্ততঃ করেন আওরঙজেব।

বাঁদীর সাক্ষ্য দেবে জাঁহাপনা।

বাঁদীদের দিকে তাকান বাদশাহ। কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়।

রোশেনারা।

সত্য জাহাপনা। এক বর্ণ মিথ্যা বলি নি আমি।

তবু আওরঙজেব কোন কথা বলেন না। কন্যার ব্যথা ভরা ম্লান মুখখানির দিকে তাকান।

শাহাজাদী। আবার ডাকেন আওরঙজেব।

পিতা। মৃদু কণ্ঠে সাড়া দেয় মেহেরুন্নিসা।

রোশেনারার অভিযোগ সত্য ?

সত্য।

সত্য !

সত্য পিতা

তুমি আক্রমণ করেছিলে রোশেনারাকে ?

শুধু আক্রমণ নয় জাঁহাপনা। আমার সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে শয়তানী। শিবাজীর মৃত্যু সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর। দেখুন জাঁহাপনা ; আপনার কন্যার কাজ। আপনি সুবিচার করুন। মুহূর্ত দ্বিধা না করে শরীরের আচ্ছাদন মুক্ত করে রোশেনারা। জ্যেষ্ঠভ্রাতার সামনে নগ্ন দেহ প্রকাশ করতে একটুও কাঁপে না চোখের পাতা।

হা আল্লা। তোবা, তোবা। চোখ ঢাকেন বাদশাহ।

বাঁদীরা এগিয়ে এসে ঢেকে দেয় রোশেনারার শরীর।

জাঁহাপনা।

উঁ। চোখ খোলেন না বাদশাহ।

একটি প্রার্থনা আপনার কাছে। দয়া করে সুবিচার করবেন।

আর দাঁড়ায় না রোশেনারা। কক্ষ ত্যাগ করে চলে যায় অন্যত্র।

স্থির হয়ে বসে থাকেন বাদশাহ। এ কি দেখলেন তিনি। আল্লা এ কি করলেন তাঁর।

এ কি আশ্চর্য পরিণতি। ভ্রাতার কাছে উপযুক্ত ভগ্নী তার নগ্ন দেহ প্রকাশ করতে লজ্জা পেল না! আল্লার এ কি খেলা। ভাবেন আওরঙজেব। মোগল হারেমের নারীদের এ কি বিকৃত পরিণতি।

এর জন্যে রোশেনারার দোষ হয়তো খুব বেশি নয়। দোষ যদি কারো থাকে তা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তৈমুরের। তিনিই এই নিয়ম করে গেছেন। মোগল বংশের রাজকুমারীদের বিবাহ নিষিদ্ধ। এই বিধান করে সাবধানতা অবলম্বন করে মসনদকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি।

একবারও ভেবে দেখেন নি অভিশপ্তা রাজকুমারীদের কথা। যারা সুখ ঐশ্বর্যের মাঝে জন্মগ্রহণ করে দিনে দিনে বড় হয়ে ওঠে। একদিন যৌবনের প্রকাশ ঘটে। দুষ্ট মদন সহস্র ধারে জ্বালিয়ে দেয় দেহকে। মনটা চায় দুরন্ত এক পুরুষ যৌবনের নিবিড় স্পর্শ। চায় সুখী শান্ত একটি নীড়। কিন্তু পায় না তা। তাই দিনে দিনে হয়ে ওঠে তারা ব্যাভিচারিণী। গোপন দেহলীলায় মত্ত হয়ে উঠে। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়।

শাস্তিও এর জন্যে কম ভোগ করতে হয় না। দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয় দিনের পর দিন।

এ প্রথা সমর্থন করেন না তিনি। তবু তিনি এ প্রথা তুলে দিতে পারেন না। সে সাহস তাঁর নেই। মোগল হারেমের এই নিষ্ঠুর প্রথার কাছে তিনি নিরুপায়—অসহায়।

কন্যার দিকে তাকান আওরঙজেব। রোশেনারার কথাগুলো মনে পড়ে তাঁর।

শিবাজীকে ভালবাসে মেহেরুন্নিসা। শিবাজীর সমালোচনায় নির্লজ্জ ভাবে বাঁদীদের সামনে আক্রমণ করতে বাধে নি তার। এর প্রমাণ তিনি পেয়েছেন।

শাহাজাদী। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকেন আওরঙজেব।

পিতার মুখের পানে তাকায় মেহেরুন্নিসা। চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের তরে কেঁপে ওঠে অন্তর। পিতার তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টি স্নেহ মায়া মমতা হীন ও রূঢ় কঠিন।

রোশেনারার অভিযোগ তাহলে সত্য ?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য হন আওরঙজেব। কন্যার এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে থাকেন কন্যার দিকে। কন্যার এ আশ্চর্য পরিবর্তন। জান তোমার এই অপরাধের শাস্তি কি ?

অপরাধ !

হ্যাঁ। বাদশাহ আওরঙজেব কন্যা হয়ে সেই পাহাড়ী কুকুরটাকে ভাল-বাসতে লজ্জা করল না তোমার ?

পিতা ! আর্তনাদ করে ওঠে মেহেরুন্নিসা। একি বলছেন আপনি। শাহাজাদী।

পাহাড়ী কুকুর বলে যাকে আপনি সম্বোধন করছেন তিনি অনেক মহৎ। তাঁর সংস্পর্শ যদি না পেতুম তাহলে মোগল হারেমের এই দুর্গন্ধময় নরক থেকে কোনদিন মুক্তি আসতো না জীবনে। বিলাসিতার মাঝে কাটাতে হ'ত সারা জীবন।

মেহেরুন্নিসা।

সত্য পিতা। তিনি আমার নতুন জীবনের সূচনা করেছেন। চিনিয়েছেন নারীর নারীত্বকে। তাঁর ভালবাসায় আপনার কন্যা ধন্য পিতা। ভালবাসার অপরাধে অপরাধী আমি। এর জন্যে যে কোন দণ্ড আমি হাসিমুখে মেনে নেব। কিন্তু তাঁর মনুষ্যত্বের অবমাননা

আমি সহ্য করব না।
কি করবে তুমি?
হয়তো কিছুই করতে পারবো না। তার প্রমাণ অমি পেয়েছি। তাঁর অবমাননার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ক্ষত বিক্ষত হলুম কিন্তু কন্যা হয়ে সেই নগ্ন দেহ আপনার কাছে নির্লজ্জ ভাবে উন্মুক্ত করতে না পারার অপরাধে অপরাধী হলুম আমি।
একটু চুপ করে থাকে মেহেরুন্নিসা। অশ্রুতে ভরে যায় ছুটি আঁখি। নীরবে পদচারণা করেন আওরঙজেব। গম্ভীর মুখমণ্ডল আরো গম্ভীর হয়।
পিতা। মৃদু কণ্ঠে ডাকে মেহেরুন্নিসা।
বল।
আমাকে আপনি···
দণ্ড তোমাকে নিতেই হবে।
বিনা অপরাধে?
বিচারক তুমি নও।
পিতা।
না, কন্যা বলে ক্ষমা করবো না তোমাকে। তুমি অপরাধিনী। কন্যার মুখের দিকে তাকান না আওরঙজেব। কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।
পিতার অবিচারে পাষাণ করে দেয় মেহেরুন্নিসাকে। রোশেনারার নখরাঘাতের জ্বালা থেকে পিতার এই অবিচার বেদনাময় মনে হয় মেহেরুন্নিসার কাছে। আজ বোঝে পিতার অন্তরে তার প্রতি যে স্নেহ মমতা ছিল তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে।

আগ্রার দুর্গে স্থানান্তরিত হয় মেহেরুন্নিসা।
শূন্য কক্ষে চুপচাপ বসে দিন কাটে।
বাঁদীরা বাদশাহের আদেশ মতো কাজ করে নীরবে। মেহেরুন্নিসার কোন কথা কোন আদেশ পর্যন্ত শোনে না। খোজা প্রহরীর দল সতর্ক ভাবে পাহারা দেয় দিন রাত।

চেয়ে চেয়ে দেখে শুধু মেহেরুন্নিসা। মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়। ইচ্ছা হয় পিতার কাছে ক্ষমা চেয়ে পত্র লিখে ফিরে যায় আবার আগের জীবনে। পারে না মেহেরুন্নিসা। পিতার অন্যায় অবিচার ক্ষুব্ধ করে তোলে মনকে। পিতার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা মনে হতে ঘৃণা বোধ হয়।

যত শূন্য যত নিঃসঙ্গই মনে হোক এই জীবন তবু পিতার কাছে কোন দিন ক্ষমা প্রার্থনা করবে না মেহেরুন্নিসা। রোশেনারা হারেমের সুখ সম্ভোগ একলাই উপভোগ করুক। আজ আর দুঃখ নেই তার।

শিবাজীর কথা মনে পড়ে। কঠিন ইস্পাতের মতো সেই বীরের স্মৃতি মনকে ভরে রাখে। তাঁর দুঃখময় পরিণতি অশ্রু সজল করে তোলে চোখকে। শিবাজীর মৃত্যু সহ্য করতে পারে না মেহেরুন্নিসা।

মনে পড়ে মহারাজ জয়সিংহের কথা।

আল্লা যেন তাই করেন। মৃত্যু যেন না হয় বীরের।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে মেহেরুন্নিসা। শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। অলিন্দে দাঁড়ায় একাকিনী।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা সুন্দরী রহস্যময়ী রাত্রি। চরণে অদৃশ্য নূপুর নিক্কন সুর ছন্দে বেজে চলেছে অপূর্ব শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে। জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিতা মায়াময় বিশ্বপ্রকৃতি এক অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে।

অদূরে পিতামহের স্বপ্নের সৃষ্টি তাজমহল। অপূর্ব রূপলাবণ্যে বিচ্ছুরিতা হয়ে পিতামহী—পিতামহীর কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে! পিতামহের কথা মনে পড়ে মেহেরুন্নিসার। অসুস্থ পঙ্গু পিতামহও পিতার অবিচারে বন্দি জীবন যাপন করছেন এই প্রাসাদে। বন্দিনী আজ জাঁহানারা। পিতা প্রচার করেছিলেন পিতার সেবার জন্যে স্বেচ্ছায় তিনি আগ্রার দুর্গে দিন কাটাচ্ছেন।

এগিয়ে চলে মেহেরুন্নিসা। দুরন্ত এক কৌতূহল জাগে মনে। বহুদিন পিতামহকে দেখে নি মেহেরুন্নিসা।

একসময় স্থির হয়ে দাঁড়ায় মেহেরুন্নিসা।

দেখে জরাজীর্ণ এক অথর্ব পঙ্গু ছায়ামুর্তি অলিন্দে দেহভার ন্যস্ত

করে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছেন তাজমহলের দিকে।
কাছে এগিয়ে যেতে ইচ্ছা করে মেহেরুন্নিসার। পারে না।
বৃদ্ধের তন্ময়তা ভাঙাতে ইচ্ছা করে না তার।

॥ কুড়ি ॥

মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি। আপন আপন কৃষি কাজ করেই জীবিকানির্বাহ করে। ব্যবসা বাণিজ্যের খুব বেশি উন্নতি হয় নি তখন। এর প্রধান কারণ সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহের আতঙ্কে আতঙ্কিত মারাঠারা সেদিন বাণিজ্য প্রসারের সাহস করত না। এ জন্যে মুদ্রার প্রচলন মহারাষ্ট্রে খুব বেশি ছিল না। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আদানপ্রদান করতো।

অর্থের যেখানে প্রচলন কম সেখানে রাজস্ব আদায় যদি অর্থে নেওয়া হয় প্রজাদের তাতে দুর্গতির পরিসীমা থাকে না।

এই সমস্ত বিবেচনা করে শিবাজী রাজস্ব আদায়ের নিয়ম করেছিলেন যে যার উৎপন্ন দ্রব্য রাজস্ব হিসাবে দিতে পারবে। এই নিয়মানুসারে তাঁর পার্বতীয় দুর্গ সন্নিহিত প্রজারা প্রতি বৎসর শস্য ওঠবার পর রাজস্ব দেবার জন্যে মঙ্গলগড় দুর্গে আসতো। সেই সময় পরস্পর পরস্পরের দ্রব্যাদি বিনিময়ের সুবিধার জন্যে দুর্গের মধ্যে তিন দিনের এক বাজার বসাতেন।

এ বছর রাজকর দেবার জন্যে প্রজারা নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে মঙ্গলগড় দুর্গে আসতে সুরু করল। আজম খাঁ শিবাজীর এই বিচিত্র কর গ্রহণের ব্যবস্থা দেখে প্রথমে আশ্চর্য হয়েছিল কিন্তু সব কথা শুনে আজম খাঁও উৎপন্ন দ্রব্য কর হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করল।

সকলকে জানিয়ে দেওয়া হল এ বছর অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ না করে তৃণাদি (খড় জাতিয়) গ্রহণ করা হবে। কারণ, অধিকৃত দুর্গের সকল কুটিরই পুড়ে গেছে। নতুন কুটির তৈরী না হওয়া পর্যন্ত

সৈন্যদের দুর্গে রাখা যাবে না। সেই জন্যে নতুন ঘর তৈরীর আদেশ জানিয়ে শিবিরে ফিরে গেল আজম খাঁ।

আজম খাঁর ঘোষণানুসারে পরদিন প্রায় দুশো কৃষক মাথায় করে গৃহ নির্মাণের নানা উপকরণ নিয়ে হাজির হয়।

দ্বাররক্ষীর কাছে কৃষকদের একজন সেলাম করে দাঁড়ায়।

কি চাই? জিজ্ঞাসা করল দ্বাররক্ষী।

আজ্ঞে আদেশ মতো ঘর তৈরীর সব জিনিষ আমরা নিয়ে এসেছি। এখন কোথায় কোথায় ঘর তৈরী হবে আদেশ করুন।

তোরা সব ভেতরে গিয়ে বস্‌গে যা। সেনাপতি সাহেব এসে আদেশ করবেন।

কখন আসবেন হুজুর?

বলা মুস্কিল। মর্জি হলে সকালে আসবেন না হলে বিকালে।

এখন তাহলে আমরা বসে থাকবো?

হ্যাঁ, বসে থাক্ সব।

সকলে গিয়ে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করে।

খাঁ সাহেব।

কি?

শিবাজী কি সত্যিই মরেছে?

বেটা মরে ভূত হয়ে গেছে।

কি করে জানলেন খাঁ সাহেব?

নদীতে অত স্রোতে পড়লে কেউ বাঁচে নাকি?

লাশ দেখেছেন?

লাশ খোঁজা হয়েছিল পাওয়া যায় নি।

তবে কি করে বলছেন শিবাজী মরেছে?

চন্দ্ররাও বলেছে।

সে এখন কোথায়?

কৃষকের পর পর প্রশ্নে দ্বাররক্ষী একবারও সন্দেহ করে না লোকটা এত কথা জিজ্ঞাসা করছে কেন। হেসে বলে—সে এই দুর্গেই আছে।

দুর্গে আছে।

হ্যাঁ, আমাদের সেনাপতি তাকে জীবন্ত কবর দিয়েছে।

রক্ষীর উত্তরে চমকে ওঠে কৃষক! কথা বলে না।

কিরে বেটা কি ভাবছিস?

কিছু না খাঁ সাহেব।

মিথ্যে কথা বলবি না।

সত্যি বলছি খাঁ সাহেব।

আবার মিথ্যে বলছিস। সত্যি কথা বল না হলে এক কোপে মাথা উড়িয়ে দোব।

ভাবছিলাম হঠাৎ যদি এখানে শিবাজী এসে উপস্থিত হয় তাহলে…

সে তো মরে গেছে।

ধরুন যদি মরে না গিয়ে থাকে?

তাহলে বেটাকে একহাত দেখে নিতুম।

কি করতেন?

যদি পেতুম তাহলে কি করতুম দেখতেই পেতিস।

রক্ষীর কথায় গর্জে ওঠে কৃষক।

দেখ তাহলে, আমিই শিবাজী।

আনীত দ্রব্যের ভেতর থেকে লুকানো তরবারি বার করে রক্ষীর সামনে দাঁড়ান শিবাজী, মোগল রক্ষী কৃষক বেশধারী শিবাজীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আত্মরক্ষার কিছুই করতে পারে না। শিবাজীর তরবারির আঘাতে লুটিয়ে পড়ে দ্বাররক্ষীর প্রাণহীন দেহ।

জয় মহারাজ শিবাজীর জয়। জয় মা ভবানীর জয়।

গর্জে ওঠে রাজস্ব দিতে আসা কৃষকদের দল। আক্রমণ করে দুর্গের মোগল সৈন্যদের।

বাদশাহী সৈন্যরা অনেকে নিরস্ত্র অবস্থায় আপন আপন কাজে নিযুক্ত ছিল। মাওলীদের আক্রমণে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পালাবার পথ খোঁজে। যারা অস্ত্র হাতে এগিয়ে এল তাদের অনেকেই প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

চন্দ্ররাওয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় যে দুর্গ বাদশাহের অধিকারে গিয়েছিল শিবাজী আবার তা উদ্ধার করলেন।

প্রভু। কাছে এসে দাঁড়ায় নিতাইজী।

বলুন নিতাইজী।

সারা দুর্গ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও চন্দ্ররাওয়ের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সে কি পালিয়ে গেল?

না নিতাইজী চন্দ্ররাও দুর্গ থেকে পালাতে পারে নি।

তবে সে কোথায় আছে?

রক্ষী বলছিল তাকে জীবিত কবর দেওয়া হয়েছে।

সে কি!

সেই কথাই বলছিল। দেখুন কোথায় সেই কবর।

সকলে দুর্গের বিভিন্ন দিকে অনুসন্ধান করে। একসময় ছুটে আসে মালশ্রী।

প্রভু।

কি হয়েছে মালশ্রী?

মনে হয় চন্দ্ররাওয়ের সন্ধান পেয়েছি।

কোথায় পেয়েছ?

আসুন।

মালশ্রীর সঙ্গে এগিয়ে চলেন শিবাজী।

দুর্গের শেষ প্রান্তে একটি ছোট্ট ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় মালশ্রী। ঘরটির দরজা জানালা পাথর দিয়ে গাঁথা হয়েছে। শিবাজী দরজার পাথর ভাঙবার আদেশ দেন।

দরজার পাথর সরানো হয়। ঘরের মধ্যে তাকিয়ে চমকে ওঠে সবাই। গোমাংস আর রক্তে পূর্ণ ঘরটি। তার মধ্যে একটি কঙ্কালসার দেহ মৃতের মতো পড়ে আছে।

শিবাজীর আদেশে চন্দ্ররাওয়ের দেহ ঘর থেকে বাইরে আনা হয়। তখনও চন্দ্ররাও জীবিত।

প্রভু!

এ্যাঁ।

যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন শিবাজী। চন্দ্ররাওয়ের এই নিদারুণ পরিণতি তাঁর অন্তর আচ্ছন্ন করেছিল। চন্দ্ররাও তাঁর শত্রু। চন্দ্ররাওয়ের জন্যেই যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন একথা একবারের জন্যেও তাঁর মনে উদয় হয় নি। মালশ্রীর ডাকে তিনি তার মুখের দিকে তাকান।

প্রভু। আবার ডাকে মালশ্রী।

বল।

কি করবো?

এখনও জীবন আছে। সুস্থ করে তোল ওকে।

আর দাঁড়ান না শিবাজী। ধীরে ধীরে তিনি মেহেরুন্নিসা যে কক্ষে থাকতো সেই কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করেন। কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন। প্রতিটি জিনিসই ঠিক আগের মতই আছে। কয়েকদিনের ব্যবহার না করার ফলে স্থানে স্থানে ধূলো জমেছে।

বাতায়ন পাশে গিয়ে দাঁড়ান শিবাজী। দূর আকাশের দিকে তাকান। অসীম শূন্য আকাশের বুকে রিক্ততার মর্মধ্বনি বাজে।

শিবাজীও আজ রিক্ত। একথা মনে হয় নি এতদিন। হারানো দুর্গ উদ্ধারের চিন্তায় চঞ্চল ছিল মন। মাঝে মাঝে মনে হয়েছিল মেহেরুন্নিসার কথা।

আজ মেহেরুন্নিসাকে মনে পড়ে। ব্যথা জাগে আজ। শাহাজাদী মেহেরুন্নিসাও কি তাঁরই মতো তাঁর কথা চিন্তা করছে না মোগল-হারেমের অজস্র বিলাসিতার মাঝে আবার হারিয়ে গেছে আগের মতো।

প্রভু। মালশ্রী এসে কাছে দাঁড়ায়।

চন্দ্ররাও কেমন আছে মালশ্রী?

জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু···

কি মালশ্রী।

সব বুঝতে পেরে কেবলই কাঁদছে।

কাঁদুক মালশ্রী। চোখের জলে মনের সব গ্লানি ধুয়ে যাক।
প্রভু।
হ্যাঁ মালশ্রী। অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হচ্ছে আজ। দগ্ধ হবে ততোদিন যতদিন না ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারছে।
কিন্তু...
না মালশ্রী। আর ভয় নেই। চন্দ্ররাও আর বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ভবানীর কাছে প্রার্থনা করি ও যেন শীঘ্র সুস্থ হয়ে ওঠে।
এ কি বলছেন প্রভু। পাপীর জন্যে আপনার মনে এতো বেদনা?
হ্যাঁ মালশ্রী। একজনের কাছে আমি মহাঋণী। তার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না। তাই তার জন্যে চন্দ্ররাওয়ের সুস্থ জীবন আমি কামনা করছি।
কি এমন ঋণ প্রভু। বিশ্বাসঘাতকের জন্যেও আপনার প্রাণ কাঁদে?
তোমার প্রভুর সে জীবন মালশ্রী।
সে কি প্রভু!
হ্যাঁ মালশ্রী, তার জন্যে আমি এ জীবন ফিরে পেয়েছি। বড় দুঃখী সে মালশ্রী। জীবনের সব আশা আনন্দ তার শেষ হয়ে গেছে। তার সেই মরা হাটে আবার আমি আনন্দের সংবাদ এনে দিতে চাই। তাই পাপীর জন্যে শিবাজী আজ ভবানীর কৃপা প্রার্থনা করছেন।
কথা বলে না মালশ্রী। অবাক বিস্ময়ে শিবাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে মাথা।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা তীর্থ ভ্রমণ শেষে ফিরে আসেন রামদাস স্বামী। ভক্তিভরে গুরুর চরণ বন্দনা করে পদতলে বসেন শিবাজী।
শিষ্যকে আশীর্বাদ করে কুশল জিজ্ঞাসা করেন রামদাস স্বামী। সমস্ত ঘটনার কথা গুরুদেবকে বলেন শিবাজী।
কিছু কি স্থির করেছ বৎস?
কিসের প্রভু।
মোগল বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামের?

না প্রভু। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হচ্ছে যুদ্ধ করি কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে অনভিজ্ঞ অনুচরদের কথা ভেবে সাহস হচ্ছে না। সুশিক্ষিত মোগল সৈন্যদের কাছে যদি পরাজিত হই তাহলে সর্বনাশের শেষ থাকবে না।

কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়া তো নিজের শক্তি পরীক্ষা সম্ভব নয় বৎস।

কিন্তু ফলাফল?

জয় পরাজয় নিয়েই যুদ্ধ। একপক্ষ জয়ী আর একপক্ষ পরাজিত হবেই। যে পক্ষ দক্ষতা পারদর্শিতা সহকারে যুদ্ধ করবে জয়ী হবে সেই পক্ষ। তুমি যদি তোমার অনুচরদের ঠিক মতো পরিচালিত করতে পারো তাহলে শিক্ষিত মোগল সৈন্যদের কাছে জয়লাভ করা অসম্ভব হবে না বৎস। এ ছাড়া গোপন আক্রমণে দুর্গ জয় করা সম্ভব কিন্তু বিপুল বাদশাহী সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় সেদিন আসবার আগে তুমি যদি বাদশাহী সৈন্য আক্রমণ কর তাতে ফলাফল যাই হোক না কেন; অনেক সুবিধা হবে তোমার ভবিষ্যতের।

আপনার আদেশ শিরোধার্য প্রভু।

বেশ, তুমি তোমার সমস্ত অনুচরদের সংবাদ পাঠাও। আর চন্দ্ররাও যদি সুস্থ হয়ে ওঠে আজ রাত্রে তাকে আমার আশ্রমে পাঠিয়ে দিও।

কেন প্রভু?

প্রয়োজন আছে।

তাকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আগামীকাল প্রভাতে তাকে আমি নিয়ে যাবো প্রভু, আমার জীবনের বিরাট ঋণের কিছুটা পরিশোধ করতে।

রামদাস স্বামী শিবাজীর দিকে তাকান। সমস্ত কথাই প্রকাশ করেন শিবাজী।

শুনে আশ্চর্য হন তিনি। বলেন, তুমি উচিৎ কাজই করবে বৎস। যার জন্যে তুমি তোমার অমূল্য জীবন ফিরে পেয়েছ তার আঁখির অশ্রু মোছানোই তোমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

আশীর্বাদ করুন প্রভু চিরজীবন আমি যেন কর্তব্য পালনে ঠিক থাকি।

প্রণাম করেন শিবাজী।

আশীর্বাদ করেন তিনি।

শিবাজী মালশ্রী আর চন্দ্ররাও প্রভাতের কিছু পরেই পল্লবীর কুটীরের সামনে এসে অশ্ব থেকে নামে।
সারা পথ চন্দ্ররাও একটি কথাও বলে নি। কোথায় যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে। তিনজনের কেউই কথা বলে নি কারো সঙ্গে। এখন আর স্থির থাকতে পারে না চন্দ্ররাও।
প্রভু।
কথা বলেন না শিবাজী। চন্দ্ররাওয়ের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকেন।
এ আপনি কোথায় নিয়ে এলেন!
তোমায় ঠিক স্থানেই নিয়ে এসেছি চন্দ্ররাও।
কিন্তু…
কথা বলেন না শিবাজী। এগিয়ে যান কুটীরের দিকে।
পদশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পল্লবী।
দাদা।
পল্লবী।
কাছে এগিয়ে আসে পল্লবী। প্রণাম করে।
পল্লবী।
দাদা।
কাকে নিয়ে এসেছি দেখ বোন।
চন্দ্ররাওকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসে মালশ্রী চন্দ্ররাওয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণভাবে চমকে ওঠে পল্লবী। বিশ্বাস করতে পারে না এ সত্য না স্বপ্ন!
কোন কথা বলতে পারে না পল্লবী। বহুদিন পরে স্বামীকে দেখে দুঃখীনি পল্লবীর আঁখি প্রান্তে দু ফোঁটা অশ্রু টলমল করে ওঠে।
পল্লবী।
শিবাজীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় পল্লবী।
তোমার স্বামী পরিশ্রান্ত, বিশ্রামের ব্যবস্থা কর বোন।

নীরবে নতমুখী পল্লবী গৃহে গিয়ে প্রবেশ করে।

চন্দ্ররাও।

প্রভু।

তুমি যাও।

কিন্তু…

আজ আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোর না সব জানতে পারবে। নিয়তির খেলার পুতুল মানুষ। যা করেছ তার জন্যে মনে কোন দুঃখ পেওনা ভাই এইটুকু আজ আমার অনুরোধ।

প্রভু…

যাও ভাই।

নীরবে শিবাজীর আদেশ পালন করে চন্দ্ররাও।

প্রভু। ডাকে মালশ্রী।

এঁ্যা।

কি হল প্রভু।

জানো মালশ্রী আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।। একটি ব্যর্থ নীড়ের স্বপ্ন এবার সার্থক হয়ে উঠবে।

আসে বিদায়ের ক্ষণ।

আসি বোন। বলেন শিবাজী।

আসুন মহারাজ।

মহারাজ! আশ্চর্য হন শিবাজী।

আমি আপনার সত্য পরিচয় পেয়েছি। অভাগিনী পল্লবী আপনার চরণ স্পর্শে ধন্যা।

না বোন। ধন্য যদি কেউ হয়ে থাকে সে আমি।

ও কথা বলে আমাকে অপরাধিনী করবেন না মহারাজ।

মহারাজ নয় বোন। বল দাদা। প্রথম পরিচয়ের সম্পর্কই সত্য হোক বোন। শিবাজী ধন্য হোক তোমার মতো ভগ্নী লাভে।

দাদা!

হ্যাঁ বোন। আশীর্বাদ করি স্বামী সংসার নিয়ে সুখী হও তুমি।

প্রভু। কাছে এগিয়ে আসে চন্দ্ররাও।

বল ভাই।

আমার অপরাধ...

অনেক পূর্বেই ক্ষমা করেছি ভাই।

তাহলে আদেশ করুন আমি আপনার সহগামী হই।

তা হয় না চন্দ্ররাও।

শিবাজী তোমাকে মুক্তি দিয়েছে। পল্লবীর প্রতি যে অবিচার তুমি করেছ তার সব ক্ষত তুমি মুছিয়ে দাও এই আমার অনুরোধ।

কথা বলে না চন্দ্ররাও। ম্লান মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

যাত্রা করেন শিবাজী আর মালশ্রী।

নীরবে পথ অতিক্রম করে দুজনেই। দুজনেই নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন। একসময় পিছনে অশ্ব ক্ষুরধ্বনি শুনে সচকিত হয়ে আড়ালে সরে দাঁড়ায়।

দূর থেকে দেখা যায় চন্দ্ররাওকে।

প্রভু।

আমিও তাই চিন্তা করছি মালশ্রী।

কাছে এগিয়ে আসে চন্দ্ররাও।

তুমি?

হ্যাঁ প্রভু। আমিও সহযাত্রী হব আপনার, এ অনুমতি করুন।

তা হয় না চন্দ্ররাও।

প্রভু।

না চন্দ্ররাও।

পল্লবীকে আমার সব কথা বলেছি প্রভু। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ আমাকে দিন প্রভু।

কিন্তু...

আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু।

তবে তাই হোক চন্দ্ররাও।

তিন জনে প্রভাতে যে পথে এসেছিল সেই পথেই আবার ফিরে চলে।

সঙ্গে নিয়ে চলে এক ব্যর্থ নারীর কর্তব্যনিষ্ঠ মনের পরিচয়। নিজের সমস্ত সুখস্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে স্বামীকে হাসিমুখে দিয়েছে যে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ।

॥ একুশ ॥

রুণাবাঈ।

সুন্দরী উদ্ভিন্ন যৌবনা রুণাবাঈ। নৃত্যে যার তরঙ্গোচ্ছাস। হাসিতে যার মুক্তা ঝরে। আঁখির কটাক্ষে তুফান তোলে হৃদয় সমুদ্রে। সেই রুণাবাঈয়ের ডাকে আসে আলমগীর পুত্র শাহজাদা আকবরের কাছ থেকে। হাজার আসরফির বায়না নিয়ে আসে রুণাবাঈয়ের দ্বারে। দ্বার খোলেন। ফিরে যায় শাহজাদার লোক। মধুর হেসে রুণাবাঈ জানায়, শাহজাদা যেন নিজ গুণে বাঁদীর বেয়াদপি ক্ষমা করেন। রুণাবাঈ শাহজাদার প্রাসাদে যেতে অক্ষম।

ফিরে আসে বান্দা সরফ খাঁ। প্রভুকে জানায় সব কথা।

অবাক হয় শাহাজাদা আকবর। ক্রোধে ফেটে পড়ে।

লুঠে নিয়ে আসবো তাকে?

কিন্তু হুজুর, জাঁহাপনা যদি জানতে পারেন তা হলে বিপদের সীমা থাকবে না।

পিতা জানবেন কি করে?

শকুনি যত দূর আকাশেই থাকুক না কেন হুজুর ভাগাড় তার লক্ষ্যের বাইরে যায় না।

সরফ খাঁ।

হুজুর।

এমন কথা আর মুখে শুনলে চাবকে পিঠের ছাল তুলে দোব।

বান্দার বেয়াদপি ক্ষমা করবেন হুজুর। একটা উপমা দিচ্ছিলুম।

অমন কথা বলবে না আর।

বলব না হুজুর।

চিন্তা করে শাহজাদা আকবর। রুণাবাঈকে লুঠ করে নিয়ে এলে পিতা জানতে ঠিকই পারবেন। সরফ খাঁ ঠিক কথাই বলেছে। শকুনির নজর পিতার। যদি জানতে পারেন তাহলে লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। এবার হয়তো ক্ষমা নাও করতে পারেন। নারী আর সুরাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন। কিন্তু আকবর চায় জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী দিনগুলিকে রঙে রসে ভরিয়ে তুলতে। নতুন নতুন নারী যৌবনের আস্বাদ নিতে।

কিন্তু উপায় নেই। পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কিছুই করবার উপায় নেই। লক্ষ্ণৌর ঘটনার পরে তার জ্ঞান হয়ে গেছে। গোপনে কেমন করে সঠিক সংবাদ পেয়ে গেছে পিতা। আজ রুণাবাঈয়ের প্রত্যাখ্যানে যতই ক্রোধ জাগুক মনে দিল্লীতে বসে রুণাবাঈয়ের অপমানের যথোচিত উত্তর দেবার সাধ্য শাহজাদা আকবরের নেই। রুণাবাঈকে লুঠ করলে বিপদ বাড়বে ছাড়া কমবে না।

হুজুর।

হুঁ।

কি করবেন হুজুর।

তাই ভাবছি।

আমি বলি কি ওই রুণাবাঈয়ের আশা ত্যাগ করুন আপনি। দিল্লী-ওয়ালী অন্য কোন বাঈজীর সন্ধান করি। আসুক, এসে সুরের নেশায় আপনাকে ভুলিয়ে দিয়ে যাক।

সুরের নেশা!

হ্যাঁ হুজুর।

না।

হুজুর!

সুরের নেশা আমার নেই তা তুমি জানো। চাই সুরা আর সুন্দরী।

রুণাবাঈ ছাড়া?

না রুণাবাঈকেই চাই।

কেমন করে ?

যেমন করে সম্ভব। যে কোন মূল্যে। তার রূপ-যৌবনের অহঙ্কার আমি চূর্ণ করবই।

হুজুর শুনেছি রুণাবাঈ বড়ো সুন্দর গায়। তার নাচে আগুন জ্বলে।

কোথায় শুনলে ?

সবাই বলে হুজুর।

তুমি দেখেছ তাকে ?

হ্যাঁ হুজুর।

কেমন দেখতে

ভালো হুজুর।

কেমন ভালো ?

তা বলতে পারবো না হুজুর।

কেন ?

মুখ আমি দেখতে পাই নি হুজুর শুধু দুখানা পা দেখেছি। যেন ঠিক দুটো ডালিম ফল।

সরফ খাঁ।

হুজুর।

আবার বেয়াদপি করছ।

আমার কি বেয়াদপি দেখলেন হুজুর ?

পা কারো ডালিম ফলের মতো হয় ?

হয় হুজুর ; দেখতে জানলেই হয়।

হয় !

হ্যাঁ হুজুর। মুখ দেখবো আশা নিয়ে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম নিশ্চই ডালিমের মতো দেখতে হবে। তা হুজুর বান্দার কপালে জুটলো পা দর্শন। আমিও হুজুর পা দুটোকে ডালিম ফল মনে করে দেখলুম।

সরফ খাঁ।

তুমি যাও। আমাকে একটু একলা ভাবতে দাও

তাই ভাবুন হুজুর।

কক্ষ ছেড়ে চলে যায় সরফ খাঁ। শাহজাদা আকবরের পেয়ারের বান্দা। তার মন্ত্রণাদাতা।

চুপ করে বসে থাকে শাহজাদা আকবর। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রুণাবাঈয়ের দর্প চূর্ণ করবেই। কিন্তু কেমন করে! কবে সেদিন আসবে।

ভাবে শাহজাদা।

বেটী! শয্যায় শুয়ে সাহিরাকে কাছে ডাকে মণিবাঈ।

বল মা। কাছে এসে বসে সাহিরা নয় দিল্লীর নতুন নাচওয়ালী রুণাবাঈ। মণিবাঈয়ের কপালে হাত রাখে। বলে, তোমার জ্বরটা আবার আজ বেড়েছে।

বাড়ুক।

না না জ্বর বাড়া ঠিক নয়। বাতাসী নিশ্চয়ই ঠিকমতো ওষুধ খাওয়াচ্ছে না বুঝতে পারছি।

আজকাল আর মণিবাঈয়ের কাছে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না সাহিরা। দিল্লীর বাঈজী মহলে বেশ নাম হয়েছে রুণাবাঈয়ের। ডাক আসছে আমীর ওমরাহদের কাছ থেকে। সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায়। সারারাত্রি নাচ গানের শেষে ভোরে ফিরে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দেয় শয্যায়। বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে থাকে সারাদিনের মতো।

মাঝে মাঝে এই নিয়ে অনুযোগ করে মণিবাঈ।

সব ডাকে সাড়া দিস কেন বেটী।

সাড়া না দিয়ে যে উপায় নেই।

কেন?

নিজেকে চেনাতে চাই।

কিন্তু সস্তা হয়ে যাবি যে দুদিনে?

তেমন দিন এলে রুণাবাঈ এখানে থাকবে না।

বেটী! আর্ত চিৎকার করে উঠেছিল মণিবাঈ।

কি হ'ল মা ?

কোথায় যাবি তুই ?

কোথায় যাবো !

বল সেদিন কোথায় যাবি তুই ?

কোথাও যাবো না মা।

না তুই চলে যাবি। আমার মন বলছে চলে যাবি তুই।

সত্যি বলছি কোনদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না মা।

সত্যি বলছিস ?

সত্যি মা।

চোখ বুজেছে মণিবাঈ। বিশ্বাস করেছে সাহিরার কথা।

তাই ভাবে আজ সাহিরা। যে ডাকের প্রতীক্ষা সে নিশিদিন করে এসেছে আজ যখন সেই ডাক এলো সাড়া দিতে পারল না সাহিরা। হিংস্র শয়তানটার কাছে এগিয়ে যাবার সাহস আজ হল না রুণাবাঈয়ের। তাই প্রত্যাখান করল সে ডাক। সহস্র মোহরের প্রলোভন ব্যর্থ হয়ে গেল।

না যাবে না সাহিরা। শাহজাদার প্রাসাদে সে যাবে না। সেখানে গেলে হয়তো ধরা পড়ে যাবে। প্রকাশ হয়ে পড়বে তার সত্য পরিচয়। শাহজাদা আসুক সমস্ত লজ্জা আপমান গায়ে মেখে। দেখে যাক রুণাবাঈয়ের আগুন জ্বালানো রূপ। দেখে যাক তার কমনীয় নারী অঙ্গের নৃত্যের তালেতালে উত্থান পতন। বুকে জাগুক তৃষ্ণা। তৃষ্ণার জ্বালায় পাগল হোক শাহজাদা আকবর। রুণাবাঈয়ের দিকে হাত বাড়াক। তারপর...

বেটী। ডাকে মণিবাঈ।

মণিবাঈয়ের মুখের দিকে তাকায় সাহিরা।

শাহজাদার ডাকে সাড়া না দেওয়া ঠিক হ'ল না বেটী।

কেন মা ?

হয়তো প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে।

প্রতিশোধ !

হ্যাঁ বেটী। হয়তো সৈন্য দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে
সে সাহস হবে না মা।
হবে না!
না। আমি শাহজাদাকে চিনি। শাহজাদা ভীরু কাপুরুষ।
সে কি?
হ্যাঁ মা। প্রাণের ভয় তার যথেষ্ট।
কি জানি বড় ভয় করে বেটী।
মণিবাঈয়ের একখানা হাত চেপে ধরে সাহিরা। বলে, ভয় কি মা আমি তো রয়েছি।

মণিবাঈয়ের নাচঘরে আবার জ্বলে বাতি।
তবলচি সূর্যপ্রসাদের তবলা আর শেরখাঁর সারেঙ্গী আজ বারবার হিমসিম খায় রুণাবাঈয়ের নৃত্যের তালে তাল রেখে চলতে।
নাচে রুণাবাঈ। নাচে রুণাবাঈয়ের আগুনরাঙা ঘাঘরা আর কাঁচুলী বদ্ধ পীনোন্নত পয়োধর। রুণাবাঈয়ের নৃত্যে আজ বাতাসের দোলা।
আশ্চর্য হয় বুড়ো শের খাঁ! বিস্মিত হয় সূর্যপ্রসাদ!
তাকায় বুড়ো শের খাঁ! ভাবে, কি হল আজ ছেলেটার! কেন বারবার আজ তাল কাটে ওর? নিজে সে বুড়ো হয়েছে, যোয়ানীর নাচের সঙ্গে তাল রাখা তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে কিন্তু ছেলেটা আজ বারবার তাল কেটে বেসুরো করে দেয় কেন আসরটা? সারেঙ্গীর ছড় টানে আর ভাবে বুড়ো শের খাঁ।
কোন দিকে খেয়াল নেই আজ রুণাবাঈয়ের। নৃত্যের উন্মাদনায় তাল, লয় জ্ঞান নেই আজ তার। নাচে সে। অগুনের মতো টকটকে ঘাঘরা ঘুরে চলে ঝড়ের গতিতে।
অবাক হয় শাহজাদা আকবর। সুরার নেশা কেটে চোখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়।
কে এই নাচওয়ালী। নাচ নয় আগুনের ফুলকি ছোটাচ্ছে দিল্লীওয়ালী এই নতুন নর্তকী। এমন নাচ সে জীবনে দেখে নি।

সার্থক হয়েছে তার সব ক্রোধ ভুলে নর্তকীর গৃহে ছুটে আসা। সরফ খাঁর পরামর্শ নিয়ে ভালই করেছে সে। আসমানের চাঁদ ধরা বোধহয় কঠিন হবে না।

ভাবে শাহজাদা আকবর। বারবার লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় রুণা-বাঈয়ের বক্ষের দিকে। দুরন্ত এক তৃষ্ণা জাগে মনে।

অসম্ভবকে যে কোন উপায়ে সম্ভব করতে হবে। লাভ করতে হবে রুণাবাঈকে। প্রয়োজন হলে পিতার মুখোমুখি দাঁড়াবে।

হঠাৎ নৃত্যের মাঝে রুণাবাঈয়ের বুক থেকে খসে পড়ে ওড়না। কাঁচুলী বদ্ধ অর্দ্ধনগ্ন বক্ষ প্রকাশ পায়। থেমে যায় নাচ। ক্ষণিক শাহজাদার মুখের পানে তাকিয়ে লজ্জায় বুক ঢেকে পালিয়ে যায় রুণাবাঈ।

হিংস্র শার্দ্দুলের মতো স্থান কাল ভুলে উঠে দাঁড়ায় শাহজাদা আকবর। বাইরে অপেক্ষা রত সরফ খাঁ ছুটে আসে।

হুজুর-হুজুর।

এঁ্যা।

বসুন।

ওঃ। সম্বিত ফিরে আসে আকবরের। বসে।

ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় শের খাঁ, সূর্যপ্রসাদ।

ঘরে এসে প্রবেশ করে রুণাবাঈ।

গোস্তাফী মাপ করবেন শাহজাদা। কুর্ণিশ করে বলে রুণাবাঈ। কথা বলতে পারে না শাহজাদা। তাকিয়ে থাকে রুণাবাঈয়ের মুখের দিকে। শাহজাদার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে মাথা নত করে রুণাবাঈ।

হুজুর। ডাকে সরফ খাঁ।

এঁ্যা, হ্যাঁ। গলার বহু মূল্য রত্নহার খুলে রুণাবাঈয়ের কণ্ঠে পরিয়ে দেয় শাহজাদা।

শাহজাদার সামান্য...

সামান্য নয় শাহজাদা, অসামান্য। মধুর হাস্যে বাধা দেয় রুণাবাঈ আমি আজ ধন্য।

না সুন্দরী। তোমার নৃত্যের যোগ্য পুরস্কার দেবার সাধ্য শাহজাদার

নেই। তাই…

ও কথা বলবেন না হুজুর। আপনার মেহেরবাণীতে রুণাবাঈ আজ ধন্য।

হুজুর। আবার ডাকে সরফ খাঁ।

এঁ্যা!

এবার চলুন হুজুর।

যাবো?

হ্যাঁ হুজুর। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হ'ল।

চল তবে। বিদায় নিয়ে গোপন পথে চলে যায় শাহজাদা আকবর।

দুরন্ত হাসির বেগে ভেঙে পড়ে সাহিরা। মন বলে, আসবে, সেদিন আসবে। আর বিলম্ব নেই সেদিনের।

রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়। ঘুম আসে না সাহিরার চোখে। শয্যার ওপর উঠে বসে সাহিরা। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। জীবনে আজ প্রথম সুরা স্পর্শ করেছে সাহিরা। তাই নির্লজ্জের মতো শাহজাদার চোখে কামনার আগুন দেখে নগ্নতা প্রকাশ করতে বাধে নি এতটুকু।

আগুন জ্বলে উঠেছে শাহজাদার চোখে। সেই সঙ্গে আর একজনের চোখে অপরিসীম ঘৃণা। সে সূর্যপ্রসাদ।

সাহিরার মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয় ওকে। মনটা ঘৃণায় ভরে যায় ওর উদাসীনতা দেখে। এক সঙ্গে এতদিন আছে কিন্তু কোনদিনের জন্যে সাহিরার মুখের দিকে তাকায় নি। যখন যা আদেশ করেছে নীরবে তাই পালন করেছে।

মণিবাঈয়ের কাছে মাঝে মাঝে অকারণ অভিযোগ করেছে সাহিরা। উত্তর দেয় নি মণিবাঈ।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে সাহিরা। কৌতূহল জাগে মনে। বুদ্ধুটা কি করছে এখন দেখতে ইচ্ছে করে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সাহিরা। গিয়ে দাঁড়ায় সূর্যের ঘরের সামনে। ঘর শূন্য। কেউ নেই।

কোথায় গেল! ভাবে সাহিরা।

দেখতে পায়। বাইরে একটু দূরে অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সূর্যপ্রসাদ।

পদশব্দে চোখ তুলে চায়। কথা বলে না। করুণা জাগে মনে। মনে হয় বড় অসহায় ছেলেটা। কি এক দুঃখে ভরে আছে ওর মনটা।

সূর্য। ডাকে সাহিরা।

এঁ্যা।

কি ভাবছো?

কথা বলে না সূর্য। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কি ভাবছো সূর্য।

কিছু না। উত্তর দেয় সূর্যপ্রসাদ।

শোওনি এখনও?

না।

কেন?

সাহিরার মুখের পানে তাকিয়েই চোখ নত করে সূর্য। কথা বলে না।

সূর্য। আবার ডাকে সাহিরা।

সাহিরার দিকে ফিরে তাকায় সূর্য।

তুমি এমন কেন?

কেমন?

মনে হয় তোমার মনে কি এক ব্যথা লুকানো আছে তাই সব সময় ম্লান মুখে তুমি ঘুরে বেড়াও। কেন সূর্য?

জানি না।

বলবে না?

সত্যি বলছি আমি জানি না কিছু।

কেন জান না? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকায় সাহিরা।

বলছি আমি জানি না। রূঢ় শোনায় সূর্যের কণ্ঠ।

চমকে ওঠে সাহিরা। কথা বলে না আর। ধীরে ধীরে চলে আসে। অন্ধকারের মাঝে প্রেতের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সূর্যপ্রসাদ।

সত্যিই ও জানে না ও কেন এমন।
তবু সবাই বলে কেন ও এমন! · কেন?

রাত্রি প্রভাত হতে তখন অল্পই বাকী আছে।
আজম খাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে আক্রমণ করবার জন্য শিবাজী তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাদশাহী শিবিরাভিমুখে এগিয়ে চললেন।
শিবাজী তাঁর সমগ্র অনুচরদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। যেমন ধনুস্ক। এদের গতি এবং কাজ বাঘের মতো। গাছের আড়াল বা কোন লুকানো জায়গা থেকে অব্যর্থ তীর চালনায় এদের জুড়ি নেই। এছাড়া রাত্রির যুদ্ধে এরা নিপুণ। অন্ধকারেই শরসন্ধান এদের প্রায় নির্ভুল। এর পর হিৎকারী। হিৎকারী সৈন্যদের প্রধান অস্ত্র বন্দুক। কোমরে তলোয়ার। মাওলী। মাওলীরা সকলে বলিষ্ঠ আর বিক্রমশালী। প্রধান অস্ত্র তরবারি কিন্তু সাধারণ তরবারি অপেক্ষা দীর্ঘ। এ ছাড়া পর্বতের দুর্গম স্থান অতিক্রম করা যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয় মাওলীরা তা অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে। শিবাজীর বিভিন্ন দুর্গ জয় এদের জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। শিবাজীর প্রিয় সৈন্য এই মাওলীরা, এদের নিয়ে শিবাজী নিজে যুদ্ধ করেন।
বর্গী। বর্গীরা অশ্বারোহী এবং এদের প্রধান অস্ত্র বল্লম। অতর্কিত আক্রমণে এদের জুড়ি নেই। হিংস্র উল্লাসে এরা যখন বিকট চিৎকার করে আক্রমণ করে শত্রুরা ভাববার সময় পায় না কি ভাবে আক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করবে। তাই অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রে হাত দেবার আগেই বর্গীদের বল্লমের খোঁচায় প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়।
শিবাজীর সৈন্যদের পোষাক শিলিদার ভিন্ন সকলেরই এক প্রকার। পায়জামা, জামা, পাগড়ি।
শিবাজী তাঁর বিপুল সৈন্য পর্বতের উপরিভাগে বনের আড়ালে সমাবেশ করলেন। নীচে বাদশাহী শিবির। অজস্র সৈন্য দুরন্ত ঠাণ্ডার মাঝে খোলা মাঠে রাত কাটাচ্ছে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে সূর্য ওঠে। সোনালী আলোর ঝর্ণা

ধারায় প্লাবিত হয় বিশ্বপ্রকৃতি।

চন্দ্ররাওকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন রামদাস স্বামী। ক'দিন তিনি নিজের কাছে রেখে ছিলেন চন্দ্ররাওকে।

হঠাৎ নীচে বাদশাহী সৈন্যদের মাঝে ব্যস্ততা জাগে। সকলেই বুঝতে পারে তাদের উপস্থিতি আর অজানা নেই।

গুরুদেব। কাছে এসে ডাকেন শিবাজী।

এবার আক্রমণ কর বৎস।

হর হর মহাদেও।

জয় মা ভবানী।

জয় মহারাজ শিবাজীর জয়।

শিবাজীর সৈন্যরা বিপুল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাদশাহী সৈন্যের ওপর। তাদের আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে বাদশাহী সৈন্যের দল। প্রাণ হারাতে সুরু করে শত শত বাদশাহী সৈন্য।

হঠাৎ যুদ্ধের গতি পাল্টে যায়। বাদশাহী সৈন্যদের গুলির আঘাতে প্রাণ হারায় শিবাজীর সৈন্যরা। পেছিয়ে আসতে সুরু করে মারাঠা সৈন্যরা। শিবাজী তার মাওলী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করতে পারন না শত চেষ্টাতেও।

শিবাজী বুঝতে পারেন আজ আর রক্ষা নেই। তবু তিনি পেছিয়ে আসবার কথা চিন্তা করতে পারেন না। শত শত অনুচর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া সত্বেও তিনি দ্বিগুণ তেজে আক্রমণ করবার জন্যে নিজ অনুচরদের উৎসাহ দিতে লাগলেন।

ফল কিন্তু পূর্বের মতই রয়ে গেল। বাদশাহী সৈন্যের গুলির আঘাতে প্রাণ হারাতে লাগলো মারাঠারা।

এই ভাবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চললে হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত শিবাজীর সৈন্যরা। হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল। যুদ্ধরত চন্দ্ররাও নিজ অশ্বের মুখ মোগল শিবিরের দিকে ঘুরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর মাঝে। চন্দ্ররাওকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো আজম খাঁ। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না।

শত্রু সৈন্য ভেদ করে চন্দ্ররাও আজমখাঁকে আক্রমণ করে। চন্দ্ররাওয়ের তরবারির আঘাতে আজম খাঁর প্রাণহীন দেহ ঘোড়া থেকে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

সোনাপতি আজম খাঁর মৃত্যুতে স্থির হয়ে যুদ্ধ করবার সাহস হয় না বাদশাহী সৈন্যের, সকলেই প্রাণ ভয়ে পালাতে সুরু করে।

শিলিদার সৈন্যরা এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সময়ে সময়ে কেউ অস্ত্র বা অশ্ব দিয়ে সাহায্য করছিল। আহতদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল নিরাপদ স্থানে। এবার তারা বিপুল বিক্রমে পলায়ন পর বাদশাহী সৈন্যদের আক্রমণ করে!

পর্বতের ওপরে রামদাস স্বামী যেখানে অপেক্ষা করছিলেন শিবাজী দ্রুত সেখানে গিয়ে গুরুর চরণ বন্দনা করেন। আশীর্বাদ করেন রামদাস স্বামী গুরুদেব।

বল বৎস।

আজকের যুদ্ধে চন্দ্ররাও যদি না থাকতো তাহলে কি সর্বনাশ যে মারাঠার হ'ত তা কল্পনা করা যায় না।

সত্য বৎস। আমি সমস্তই দেখেছি। যে অসম্ভব সে সম্ভব করেছে একমাত্র তা তার পক্ষেই সম্ভব। তাছাড়া তোমার অনুচররাও তাদের প্রথম যুদ্ধে প্রমাণ করলো সম্মুখ যুদ্ধে তারাও অক্ষম নয়।

দ্রুত ছুটে আসে মালশ্রী।

প্রভু।

কি হয়েছে মালশ্রী?

রাওজী বোধ হয়...। কথা শেষ করতে পারে না মালশ্রী।

সকলে চন্দ্ররাওয়ের কাছে ছুটে আসে। একজন সেনার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ছিল চন্দ্ররাও। সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত।

শিবাজী কাছে এসে দাঁড়াতে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকে চন্দ্ররাও।

প্রভু।

রাওজী।

যে পাপ জীবনে করেছি তার জন্যে ক্ষমা করবেন। আর...

চন্দ্ররাও।

পল্লবী বড় অভাগিনী। সারা জীবন তাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি। বলবেন, সে যদি পারে আমাকে যেন ক্ষমা করে।

চুপ করে চন্দ্ররাও। উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে ওঠে শরীর। পাণ্ডুমূর্তি ধারণ করে মুখ। মৃত্যুর গাঢ় ছায়া নেমে আসে ধীরে ধীরে।

চন্দ্ররাও।

প্রভু।

তুমি···

কথা বলতে পারে না চন্দ্ররাও। ম্লান একটু হাসে। চন্দ্ররাওয়ের প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করে। মৃত চন্দ্ররাওয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দুরন্ত কান্নায় ভেঙে পড়েন শিবাজী।

বৎস। মৃদু স্বরে একসময় ডাকেন রামদাস স্বামী।

গুরুদেব।

বৃথা শোক তোমার শোভা পায় না বৎস। চন্দ্ররাও তার জীবনের মস্ত ঋণ পরিশোধ করেছে। মারাঠার জীবনে এনে দিয়েছে নতুন জীবনের আশ্বাস। এ মৃত্যু তার গৌরবের।

কিন্তু প্রভু।

বল বৎস।

পল্লবীর কি হবে? বড় দুঃখীনি যে সে?

স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে দিন কাটবে তার। জীবনের তুচ্ছ সুখ শান্তির চেয়ে স্বামীর বীরত্ব তার কাছে অধিক মূল্য পাবে।

একটু চুপ করেন রামদাস স্বামী। চন্দ্ররাওয়ের হস্তধৃত সুদীর্ঘ তরবারি আপন হাতে নিয়ে শিবাজীর হাতে দেন। বলেন, বৎস, এ তরবারি ভবানী প্রদত্ত। এটি গ্রহণ কর। আজ চন্দ্ররাওয়ের হাতে 'ভবানী' যেরূপ শত্রু নিধন করেছে চিরকাল এমনি ভাবেই শত্রু নিধন করবে। রামদাস স্বামী প্রদত্ত ভবানী অস্ত্রের মূর্তি শিবাজী আপন পতাকায় চিত্রিত করেছিলেন এবং আজও সেতারা প্রদেশের ভূপাল বংশীয়রা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে ঐ অস্ত্রের পূজা করে।

নীরার তীরে মৃত সৈন্যদের সৎকারের ব্যবস্থা হয়। চন্দ্ররাওয়ের চিতাও জ্বলে। অশ্রু সজল নেত্রে মৃত অনুচরদের প্রজ্বলিত চিতার দিকে তাকিয়ে থাকেন শিবাজী। এক সময় চিতার আগুন নেভে।
ভারাক্রান্ত মনে মঙ্গলগড়ের পথে যাত্রা করে সকলে।
সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে অস্ত যাচ্ছে।

॥ তেইশ ॥

পিতামহের কাছে এগিয়ে যাবার দুরন্ত ইচ্ছাটা কখন যে বৃদ্ধের কাছে নিজের অজান্তে টেনে নিয়ে গেছে বুঝতে পারে নি মেহেরুন্নিসা। হঠাৎ বৃদ্ধের সগর্জন প্রশ্নে চমকে ওঠে মেহেরুন্নিসা।
কে!
তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন অসহায় বৃদ্ধ পঙ্গু অথর্ব ভারত সম্রাট সাজাহান। কোন উত্তর দেয় না মেহেরুন্নিসা। বৃদ্ধের চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কেঁপে ওঠে বুক।
কে তুই?
আবার জিজ্ঞাসা করেন বৃদ্ধ।
আমি···আমি···
চুপ করলি কেন? কে তুই?
নিজের কোন্ পরিচয় পিতামহকে দেবে তাই ভাবে মেহেরুন্নিসা। পিতার নাম করবে না শুধু নিজের নামটুকু বলবে! পিতার নাম উচ্চারণ করলে হয়তো দূর-দূর করে উঠবে পিতামহ! তাহলে?
শোন।
ডাকেন বৃদ্ধ। কাছে এগিয়ে যায় মেহেরুন্নিসা।
কে তুই?
মেহেরুন্নিসা।
মেহেরুন্নিসা!

এখানে কেন ?

বন্দিনী আমি।

আমার মতো ?

হ্যাঁ।

কে বন্দিনী করেছে ?

পিতা।

আওরঙজেব ?

হ্যাঁ।

চমৎকার। হঠাৎ পাগলের মতো হেসে ওঠেন বৃদ্ধ। বলেন, ধন্য তুমি পুত্র। ধন্য তোমার রাজনীতি। পুত্র মহম্মদকে বন্দি করে রেখেছো গোয়ালিয়র দুর্গে। কন্যাকে বন্দিনী করে পাঠিয়েছো আগ্রায়। তোর অপরাধ ?

অপরাধ !

হ্যাঁ। কি অপরাধ করেছিস তুই ?

জানি না।

বিনা অপরাধে বন্দিনী করেছে তোকে ?

হ্যাঁ।

মিথ্যা কথা।

না সত্য। সত্যই কোন অপরাধ আমি করি নি।

তুই যা করেছিস তোর কাছে তা অপরাধ বলে মনে না হলেও তুই অপরাধিনী নিশ্চয়ই, তাই সে তোকে বন্দিনী করেছে। বিনা অপরাধে আওরঙজেব কাউকে শাস্তি দেয় না। তোর অভিযোগ মিথ্যা।

না সত্য। সত্যই পিতা আমাকে বিনা দোষে বন্দী করেছে। আমি কোন অপরাধ করি নি।

মহম্মদও কোন অপরাধ করে নি। আওরঙজেবের হাতে বন্দী আমি যখন সারা হিন্দুস্থানের বিনিময়ে মুক্তি চেয়েছিলুম প্রত্যাখান করেছিল সে আমাকে। সেই পুত্রকেও আওরঙজেব বন্দী করতে দ্বিধা করে নি।

এত বড় স্বার্থত্যাগী পুত্রও যদি পিতার চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হতে পারে তাহলে তুই তো নিশ্চই অপরাধিনী।

কিন্তু পিতামহ…

আঃ, ও নামে আমাকে ডাকিস নি। আওরঙজেবের পুত্র কন্যাদের আমি কেউ নই। সব শত্রু তোরা। যা দূর হয়ে যা।

অসহ্য রাগে চিৎকার করে ওঠেন সাজাহান।

নীরবে স্থান ত্যাগ করে চলে যায় মেহেরুন্নিসা। অবাক বিস্ময়ে ভাবে হঠাৎ এ কি পরিবর্তন পিতামহের!

মেহেরুন্নিসা চলে যেতে অন্তরটা ব্যথায় ভরে যায় সাজাহানের। তার এই রুঢ় আচরণের জন্যে দুঃখ বোধ করেন। আওরঙজেবের প্রতি তার অন্ধ ক্রোধ মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত করে তোলে তাঁকে। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েন।

মনে পড়ে পূর্ব জীবনটাকে।

শাহজাদা খুরুম একদিন মসনদের জন্যে কম অন্যায় করেন নি। পিতাকে বন্দী করেছেন। মসনদে বসে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন; ভাই বন্ধু আত্মীয় যাকেই মসনদের দাবীদার বলে মনে হয়েছে। কোন দয়া মায়া মমতা তাঁর মনে জাগে নি সেদিন।

তাঁর পুত্রও যে মসনদের জন্যে পিতাকে বন্দী করেছে ভাইয়েদের করেছে হত্যা এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই কিন্তু তিনি নিজে পিতার প্রিয় পুত্র হওয়া সত্বেও মসনদের লোভে যে কাজ করেছিলেন সেকথা ভুলে মহা ভুল করলেন তিনি। বিশ্বাস করলেন পুত্রদের। সেই বিশ্বাসের ফল পেতেও দেরী হল না তাঁর। কিন্তু পুত্র তাঁর সাবধানী তাই মহম্মদকে বন্দী করে পাঠিয়েছে গোয়ালিয়রের দুর্গে।

কিন্তু কন্যাকে বন্দিনী করে পাঠালো কেন আগ্রার দুর্গের এই নিঃসঙ্গ দুঃখ ভরা জীবনের মাঝে?

কারণ!

কারণ নিশ্চই আছে। বিনা কারণে কন্যাকে এই দুঃখের মাঝে নিশ্চই পাঠায় নি আওরঙজেব।

শিবাজী মেহেরুন্নিসাকে হরণ করেছে এ সংবাদ একদিন পেয়েছিলেন সাজাহান। শুনেছিলেন মৃত্যু হয়েছে শিবাজীর। তবু কেন আওরঙজেব কন্যাকে বন্দী করল ? ভাবেন বৃদ্ধ।

মনে পড়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোর কথা।

দারা শিকো। শাহ্-ই-বুলন্দ-ইক্‌বাল্‌। সাজাহানের প্রিয় পুত্র। মানবদরদী পণ্ডিত কবি দারা। হিন্দু মুসলমান কোন ভেদাভেদ ছিল না তার কাছে। ছিল না ধর্মের গোঁড়ামী। সেই পুত্র চলে গেল আওরঙজেবের সিংহাসন লোলুপতার বলিতে।

দেওরাই (আজমীর) রণক্ষেত্রে রাজপুত্র দারা হ'ল পথের ভিখারী। উদভ্রান্ত দারা রুগ্না নাদিরা বানু আর পুত্র সিপাহরকে নিয়ে মুষ্টিমেয় ক'জন অনুচরের সঙ্গে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দেশে দেশে ফিরতে লাগলো। কিন্তু কোথায় নিরাপদ আশ্রয়। চতুর্দিকেই আওরঙজেবের অনুচর। কোথাও এতটুকু বিশ্রামের অবকাশ মিলল না দারার।

বেলুচ প্রদেশের বিদ্রোহী দস্যু জিয়নআলি এক সময় দারার কৃপাতেই প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। জিয়নআলির কাছে আশ্রয়ের প্রার্থনা জানিয়ে পত্র লিখল দারা। জিয়ন সাদর আহ্বান জানিয়ে পথপ্রদর্শক পাঠিয়ে দিলে। একটু আশার আলো দেখা দিল দারার জীবনে। আল্লার এই অসীম করুণায় ভরে উঠল দারার মন।

নিরাশার অন্ধকার নামতেও দেরী হ'ল না। দাদরের পথে নাদিরাবানু চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হ'ল। মাতৃহারা বালক সিপাহরের আকুল কান্নায় পূর্ণ হ'ল আকাশ বাতাস। অকৃতজ্ঞ জিয়নআলি জীবন রক্ষককে দিল যোগ্য আশ্রয়। আওরঙজেবের সেনাপতির সঙ্গে শৃঙ্খলিত দারা আর সিপাহর হাজির হ'ল দিল্লীতে।

বিধর্মী অভিযোগে দারার প্রাণদণ্ড হ'ল। কিছুদিন পরে গোয়ালিয়র কারাগারে বিষ-প্রয়োগে সুলেমান শুকোও চলে গেল চিরদিনের মতো। কিশোর সিপাহর আজ কন্যা জাহানারার কাছে। কে বলতে পারে আওরঙজেব একদিন বন্দিনী ভগ্নীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে কচি প্রাণটাকে।

সুজা আজ কোথায়? আছে কি নেই কে বলতে পারে!

আলী নকীর হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত মুরাদও বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে।

না। ক্ষমা নেই। আওরঙজেবের এই নিষ্ঠুরতা আল্লা ক্ষমা করলেও সাজাহান ক্ষমা করবেন না কোনদিন। আকবরের দিকে তাকান সাজাহান। অসীম উদার আকাশ। খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ স্তরে স্তরে সাজান।

তাকান দূরে তাজমহলের দিকে।

মমতাজ আজ গভীর নিদ্রামগ্ন ওখানে। হয়তো ঘুম ভেঙে গেছে তার। পুত্রের এই নির্মম অত্যাচারে হয়তো চিরনিদ্রা থেকে বিস্ময়াতঙ্কে জেগে উঠেছে সে। পুত্রের এই নির্মম আঘাত হয়তো একদিন তার ওপরও গিয়ে পড়তে পারে। স্বার্থলোভী খেয়ালী নিষ্ঠুর আওরঙজেবের খেয়ালের হুকুম একদিন ভাঙিয়ে দিতে পারে মমতাজের ঘুম।

না। কিছুই করতে পারবেন না তিনি। শুধু দুর্গের এই নির্দিষ্ট কয়েদখানায় বসে চেয়ে চেয়ে দেখবেন পুত্রের অক্ষয় কীর্তি। বাধা দিতে পারবেন না। প্রতিবাদ জানালে তা কেউ শুনবে না। চিৎকার করলে সে চিৎকার দুর্গের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়াবে বাতাসে।

না কোন প্রতিবাদ করবেন না তিনি। শুধু দেখবেন। দূরের বাতায়নের দিকে তাকান সাজাহান। চমকে ওঠেন। দেখেন, একটু আগে কঠিন আঘাতে যাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন সেও নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে তাজমহলের দিকে।

কি দেখছে ও? কি ভাবছে! পিতামহীর কথাই চিন্তা করছে কি? জানতে বড় ইচ্ছা করে। শুনতে ইচ্ছা করে ওর কথা। শোনাতে ইচ্ছা করে অনেক কিছু। কিন্তু তার জন্যে কাছে ডাকতে হয়। যাকে তিনি জীবনে সবচেয়ে ঘৃণা করেন তার কন্যাকে কি করে কাছে ডাকবেন তিনি!

কিন্তু ওর অপরাধ কি? পিতা ওর অপরাধী। ও তো কোন দোষ

করে নি।

তবে!

এই কৌন হ্যায়। বহুদিন পরে গর্জে ওঠেন সাজাহান।

সে ডাকে সন্ত্রস্ত ভৃত্যের দল ছুটে আসে।

ওকে ডাকো। আদেশ করেন সাজাহান। ভারত সম্রাট সাজাহান বহুদিন পরে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন যেন।

যো হুকুম। ছুটে যায় ভৃত্যের দল।

ডেকে নিয়ে আসে মেহেরুন্নিসাকে।

নত নেত্রে ধীর শান্ত পদে কাছে এসে দাঁড়ায় মেহেরুন্নিসা।

আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ। আয় কাছে আয় আমার।

অবাক বিস্ময়ে পিতামহের মুখের দিকে তাকায় মেহেরুন্নিসা। বিশ্বাস করতে পারে না বৃদ্ধের এই আহ্বান।

আয়। আবার ডাকেন সাজাহান।

কাছে যায় মেহেরুন্নিসা। নিজের পাশে তাকে বসায় সাজাহান।

আমার ওপর রাগ করেছিস্ নারে?

রাগ!

হ্যাঁ।

না।

রাগ করিস নি দিদি। বুড়ো হয়েছি! পঙ্গু দেহের ভেতরের মনটা আমার পাগল হয়ে আছে। তাই মাঝে মাঝে কি যে করে ফেলি নিজেই বুঝতে পারি না। তাই বলছি এই বুড়োর কথায় রাগ করিস নি দিদি।

কথা বলে না মেহেরুন্নিসা। বলতে পারে না। চোখ দুটি অশ্রু পূর্ণ হয়ে ওঠে।

হ্যাঁরে...।

এঁ্যা।

একটা সত্যি কথা বলবি?

বলব।

কিছু গোপন করবি না তো?

না।

একটু চুপ করে থাকেন সাজাহান। মেহেরুন্নিসার ম্লান মুখখানির দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। বলেন, শুনেছিলুম শিবাজী হরণ করেছে তোকে। একদিন শুনলুম শিবাজীর মৃত্যু সংবাদ। একথা সত্য?

হ্যাঁ পিতামহ।

তবে।

কি?

তোর পিতা তবে তোকে বন্দী করলে কেন?

চুপ করে থাকে মেহেরুন্নিসা। কোন উত্তর দেয় না।

বলবি না?

বলব পিতামহ।

সব বলে মেহেরুন্নিসা। কিছুই গোপন করে না। সব লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করে সব কথা প্রকাশ করে পিতামহের কাছে।

মেহেরুন্নিসার সব কথা শুনে গভীর মমতায় তাকে কাছে টেনে নেন সাজাহান।

পিতামহের বুকে মুখ লুকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে মেহেরুন্নিসা।

মেহেরুন্নিসার মাথায় হাত রাখেন সাজাহান। ডাকেন।

দিদি।

মুখ তোলে না মেহেরুন্নিসা।

শোন্। মুখ তোল। জোর করে মেহেরুন্নিসার মুখ তুলে ধরেন সাজাহান। তোর দুঃখ আমি বুঝি দিদি। কিন্তু কি করবি বল। জন্ম মৃত্যু তো কারো হাত ধরা নয়।

তবু...

বুঝি দিদি। বীরের মতো যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি তার মৃত্যু হত কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খণ্ডান যে যায় না।

কথা বলে না মেহেরুন্নিসা। বলতে পারে না।

চোখ দিয়ে বিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরে।
বৃদ্ধের চোখ দুটিও ব্যথার অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

॥ চব্বিশ ॥

ঘন কালো অন্ধকার রাত্রি।
যতদূর দৃষ্টি চলে আলোর ইসারা নেই কোথাও। বিরাট হিংস্র দৈত্যের মতো কালো অন্ধকার অজস্র বাহু বিস্তার করে গ্রাস করেছে বিশ্ব প্রকৃতি। আশে পাশে দৃষ্টি চলে না। দৃষ্টি চলে না সামনে।
বিপদসঙ্কুল অন্ধকার পার্বত্য পথে দুজন অশ্বারোহী সাবধানে অশ্ব-চালনা করে এগিয়ে চলেছেন গন্তব্যস্থানের দিকে।
অশ্বারোহীদ্বয় শিবাজী ও তন্নজী মালশ্রী।
পল্লবীর সঙ্গে দেখা করে ফিরে চলেছেন মঙ্গলগড় দুর্গে।
রাত্রে যাত্রা করতে নিষেধ করেছিল পল্লবী কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও পল্লবীর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। দুর্গম পথে ঘন নিশীথে ঘোড়া ছোটাতে বাধ্য হয়েছেন শিবাজী।
স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে স্থির হয়ে বসেছিল পল্লবী। চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপে নি।
বহিন। ডেকেছিলেন শিবাজী।
সাড়া পাওয়া যায় নি পল্লবীর। পল্লবী যেন পাষাণে পরিণত হয়েছিল।
পল্লবী। আবার ডেকেছিলেন শিবাজী।
উঁ। যেন বহুদূর থেকে সেই সাড়া ভেসে এসেছিল পল্লবীর কণ্ঠে।
আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব বহিন।
কোথায়?
আমার কাছে।
না দাদা।
বহিন!

আমি আমার এই ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। ও অনুরোধ আমাকে করবেন না।

না দাদা। আমি একা থাকতে পারবো। চিরটাকাল একলাই তো কাটালাম।

একটু চুপ করেছিলেন শিবাজী। বলেছিলেন সব কথা। সব শুনে পল্লবী বলেছিল।

সত্যি দাদা!

হ্যাঁ বোন।

সত্যিই তার জন্যে জয়ী হয়েছেন?

হ্যাঁ বোন। তার অপরাধে একদিন যেমন ক্ষতি হয়েছিল আমার তেমনি আজ তার জন্যেই মারাঠার নতুন বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হবার আত্মবিশ্বাস জেগেছে। কিন্তু আজ যদি সে থাকতো···

দেশের স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিয়েছে সে, এর জন্যে দুঃখ করবেন না। ভবানীর কাছে প্রার্থনা করি স্বাধীনতার জন্যে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে শত শত বীরের জন্ম হয় যেন মারাঠার ঘরে ঘরে।

তাই কর বোন। তোমার প্রার্থনা যেন সফল করেন ভবানী। সফল হয় যেন মারাঠার মনের স্বাধীনতার স্বপ্ন।

সফল হবে দাদা। আপনার মতো বীরের ডাকে জেগে উঠবে মারাঠা তরুণের দল। একদিন সুখ শান্তি স্বপ্নে ভরে যাবে মারাঠার প্রতিটি গৃহ।

একসময় বিদায় নিয়েছিলেন শিবাজী আর মালশ্রী।

প্রভু।

মালশ্রীর ডাকে চমক ভাঙে শিবাজীর। অন্ধকারে মালশ্রীর দিকে পানে তাকান শিবাজী।

ধন্য পল্লবী বহিন, প্রভু। যত চিন্তা করছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি। মারাঠার ঘরে এখনও নারী আছে।

আছে মালশ্রী। আছে বলেই মারাঠা তরুণরা গৃহের বন্ধন কাটিয়ে

মাতৃভূমির মুক্তি যজ্ঞে জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসতে পারছে।
সত্য প্রভু!
কথা বলেন না শিবাজী। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকান। চন্দ্ররাওয়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে আজকের নিহত অনুচরদের কথা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন সকলের আত্মা যেন সুখী হয়।
প্রভাতের পূর্বেই দুর্গে ফিরে আসেন শিবাজী।
সাক্ষাৎ হয় গুরুদেব রামদাস স্বামীর সঙ্গে।
সব কথা বলেন গুরুদেবকে। শুনে বিস্মিত হন তিনি।
বলেন, বৎস মহারাষ্ট্রের মুক্তির দিন সমাগত।
সত্য প্রভু!
হ্যাঁ বৎস। যে দেশের নারীরা এমন ত্যাগ স্বীকার হাসিমুখে করতে পারে সে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা যায় না বৎস।
শিবাজীও তাই ভাবেন। ভাবে শিবাজীর প্রতিটি অনুচর। আশার আলো জাগে সকলের মনে।
নব অরুণের প্রসন্ন রক্তরাগের মাঝে মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের নতুন শপথ গ্রহণ করে সকলে।

॥ পঁচিশ ॥

শিবাজীর মৃত্যু সংবাদে একটা বাধার প্রাচীর সরে গেল ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন আওরঙজেব। তাই ময়ুর-সিংহাসনে বসে কিছুক্ষণের জন্যে আমীর ওমরাহদের আনন্দোচ্ছ্বাসে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো দিল্লীতে দূত মুখে যে সংবাদ এসে পৌঁছাল তাতে তিনি শুধু বিচলিতই হলেন না মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।
শিবাজী মরে নি। মরেছে সেনাপতি আজম খাঁ। সম্মুখযুদ্ধে বাদশাহী সৈন্য আক্রমণ করে বহু সৈন্য ধ্বংস করেছে শিবাজী।

হিসাবের ভুল বুঝতে পারেন আওরঙজেব। শিবাজীর কয়েক সহস্র অশিক্ষিত মারাঠা অনুচরের শক্তিকে তিনি তুচ্ছ মনে করেছিলেন তাই মাঝে মাঝে শিবাজীর উৎপাত সত্বেও তিনি বিশেষ চিন্তিত হন নি। শাহাজাদীকে হরণ করবার পর শিবাজীকে দমন করার জন্যে সেনাপতি আজম খাঁকে পাঠিয়েছিলেন। মহারাজ জয়সিংহকে পাঠিয়েছিলেন বিজাপুর আক্রমণ করবার জন্যে। আজম খাঁ যদি কৃতকার্য না হতে পারে মহারাজ জয়সিংহ যেন সাহায্য করেন এইটুকুই নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আজম খাঁ শাহাজাদীকে উদ্ধার করে শিবাজীর মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়েছিল। বিশ্বাস করেছিলেন আওরঙজেব। ভেবেছিলেন পাপ বুঝি কাটলো।

কিন্তু যে সংবাদ দূত নিয়ে এল তা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন আওরঙজেব। বিশ্বাস করতে পারলেন না দূতের সংবাদের সত্যতা। কিন্তু বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। মিথ্যা নয় দূতের সংবাদ।

বুঝলেন শিবাজীর চাতুরী। মৃত্যু সংবাদ যখন বাদশাহী সৈন্যদের মাঝে কর্তব্য সম্বন্ধে শিথিলতা এনেছে সেই সুযোগে চতুর শিবাজী বাদশাহী সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শিকারী হয়েও মূর্খের দল শিকার হয়েছে শিকারের হাতে।

চিন্তা করতে পারেন না আওরঙজেব। লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মন। শিবাজীর এই দুঃসাহসে স্থির থাকতে পারেন না।

এই কৌন হ্যায়। তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন আওরঙজেব। কেউ সাড়া দেয় না সে ডাকে। কেউ আসে না।

গোসলখানার নির্জন কক্ষে অস্থির পদচারণা করেন আওরঙজেব। কারো সাড়া না পেয়ে দ্বিগুণ হয়ে ওঠে মনের আক্রোশ।

কোন্ হ্যায়? আবার চিৎকার করে ওঠেন আওরঙজেব। সে ডাক গোসলখানার নিভৃত কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে।

তবু কেউ আসে না। আশ্চর্য হন বাদশাহ আলমগীর। ক্ষুব্ধ হন। হুজুর।

কক্ষে এসে প্রবেশ করেন গোলাম খাঁ।

কোথায় ছিলে ? আক্রোশে ফেটে পড়েন বাদশাহ।

আজ্ঞে…!

ছিলে কোথায় ?

পালঙ্কে হুজুর।

গোলাম খাঁ। গর্জে ওঠেন বাদশাহ।

সত্য জাঁহাপনা। দিবা স্বপ্ন দেখতে দেখতে নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলুম।

দিবা স্বপ্ন !

হ্যাঁ হুজুর। শিবাজীর আত্মার সদ্‌গতির জন্যে যেন আল্লার কাছে…

গোলাম খাঁর কথা শেষ হয় না অট্টহাসিতে ভেঙে পড়েন আওরঙজেব। বাদশাহকে হাসতে দেখে বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন গোলাম খাঁ। ভেবেছিলেন তার কথা শুনে বাদশাহ তাঁকে বুদ্ধু বলে তিরস্কার করবেন। পরিবর্তে বাদশাহকে অট্টহাসি হাসতে দেখে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ।

এক সময় হাসি থামে আওরঙজেবের। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোলাম খাঁর মুখের দিকে তাকান।

গোলাম খাঁ।

হুজুর।

শিবাজীর মৃত্যুতে তুমি খুশি না ?

হুজুর।

বল ?

হ্যাঁ। বড় ঝামেলা করছিল।

কিন্তু তুমি জান না বোধহয় তোমার সুখের মুখে ছাই দিয়েছে সে

আজ্ঞে…

শিবাজী মরে নি।

কিন্তু…

শুধু তাই নয় সম্মুখযুদ্ধে বাদশাহী সৈন্যদের পরাস্ত করেছে সে। মৃত্যু হয়েছে সেনাপতি আজম খাঁর।

কথা বলেন না গোলাম খাঁ। আওরঙজেবও চুপ করে থাকেন।
জাঁহাপনা। এক সময় মৃদু কণ্ঠে ডাকেন গোলাম খাঁ।
গোলাম খাঁর মুখের দিকে তাকান বাদশাহ।
গোসলখানার ম্লান অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে দু'জনার ছায়া দীর্ঘ হয়।
কি করবেন হুজুর ?
শিবাজীর নাম আমি মুছে দেব পৃথিবী থেকে।
হুজুর···
যত ধূর্ত যত চতুরই হোক, সে জানে না যে আগুনে সে হাত দিয়েছে সে আগুন কত ভয়ঙ্কর। মারাঠার জীবন তছনচ করে দেব আমি।
কিন্তু ··
কি ?
একা শিবাজীর অপরাধের শাস্তি সমগ্র জাতির ওপর চাপিয়ে দেবেন হুজুর ?
হ্যাঁ তাই দেব। মারাঠার নাম আমি মুছে দেব চিরদিনের মতো।
ধক্ ধক্ করে জ্বলে ওঠে আওরঙজেবের দুই চোখে শাণিত দৃষ্টি।
ভয় পায় গোলাম খাঁ। এই দৃষ্টির অর্থের সঙ্গে পরিচিত যেন।
আওরঙজেবের চোখের এ দৃষ্টি বড় সর্বনাশা দৃষ্টি

শিবাজী মরে নি মৃত্যু হয়েছে সেনাপতি আজম খাঁর। এ সংবাদ পেয়েছিলেন মহারাজ জয়সিংহ। কিন্তু এবার তিনি কি করবেন ? কি তাঁর কর্তব্য। চিন্তা করছিলেন মহারাজ জয়সিংহ।
পত্র আসে বাদশাহের কাছ থেকে। বিজাপুর আক্রমণ স্থগিত রেখে শিবাজীকে দমন করবার নির্দেশ জানিয়েছেন বাদশাহ তাঁর পত্রে।
মহাসমস্যায় পড়েন মহারাজ জয়সিংহ। শিবাজীর জন্যে তাঁর মনে যত দুর্বলতাই থাক কর্তব্য পালন তাঁকে করতেই হবে। কিন্তু মাতৃভূমির মুক্তিকামী বীরের জীবনের আশা আকাঙ্খা তাঁর মন কঠিন অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন করে দিতে চায় না। বাদশাহের বেতনভোগী ভৃত্য তিনি। তাঁর আদেশ পালন না করার উপায় তাঁর নেই।

রাজপুতানার স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনিও দেখেছিলেন কিন্তু সে স্বপ্নকে সার্থক করে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে মোগলের গোলামী করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি।

কিন্তু জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে মহারাজ জয়সিংহের মনে আজ প্রশ্ন জাগে, অত্যাচারী মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে শিবাজী আজ যে সংগ্রামে অবতীর্ণ, তা তিনি কেমন করে শেষ করে দেবেন। মারাঠার জীবনের শেষ আলোটুকু কি করে নিভিয়ে দেবেন?

না-মুক্তি নেই। মন চায় না এই হীন জঘন্য কাজে সাড়া দিতে। তবু তাই করতে হবে তাঁকে। তাঁর রাজপুত সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সেই মুক্তি যোদ্ধার ওপর। হিন্দু হয়ে হিন্দুর সর্বনাশ করতে হবে। যুদ্ধে সবার আগে ডাক পড়ে তাঁর। চতুর বাদশাহ হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়সিংহের হিন্দু রাজপুত সৈন্য ক্ষয় করেন। সে সময় মুসলমান সেনারা পরম আরামে নিদ্রা যায়।

এ ছাড়া পার্বত্য যুদ্ধে তাঁকেই এগিয়ে যেতে হয়। কঠিন কঠোর যুদ্ধে সৈন্য ক্ষয়ের অন্ত থাকে না। একবার পার্বত্য যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের কুশলী করবার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। তাঁর সেই প্রস্তাবে বিরক্ত হয়েছিলেন বাদশাহ। বুঝেছিলেন কুটিল বাদশাহ যে কোন উপায়ে রাজপুতের শেষ চান।

ভেবেছিলেন বিদ্রোহ করবেন। পরিণতির কথা চিন্তা করে সাহস করেন নি। ফলে শুধু তাঁরই ক্ষতি হ'তনা ক্ষতি হ'ত হিন্দু জাতির। তারপর আওরঙজেবের মসনদে বসবার কালে যশোবন্ত সিংহের ওপর অনেক আশা করেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন মহারাজ যশোবন্ত সিংহ বুঝি রাজপুতের হারান গৌরব উদ্ধার করবেন। কিন্তু মহারাজ যশোবন্ত সিংহ বুঝলেন না আওরঙজেবের চাতুরী। নিজের জালে জড়িয়ে পড়লেন। নাম লেখালেন মোগলের দাসত্বের খাতায়। রাজপুতের শেষ আশা ভরসার সমাধি হ'ল।

ভুল ভাঙতেও বিলম্ব হয় নি। শিবাজীকে দমন করতে এসে শিবাজীর

কাজে সহায়তা করার অপরাধে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আজ আওরঙজেবের হাতে ক্রীড়াপুত্তলীতে পরিণত হয়েছেন। আহার নিদ্রা ব্যতীত কোন কাজ নেই আজ তাঁর। অরণ্যের সেই শৌর্য বীর্যের সলিল সমাধি ঘটেছে আজ মহারাজ যশোবন্ত সিংহের।
প্রতিদিন দুরন্ত এক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি। কত বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে। আশার আলো কোথাও দেখতে পান নি। কি করবেন কিছুই স্থির করে উঠতে পারেন নি। নীরবে নতশিরে পালন করেছেন আওরঙজেবের প্রতিটি আদেশ।
কর্তব্যের যুপকাষ্ঠে নিজের সমস্ত সত্বাকে বলি দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। রণক্ষেত্রে নির্মম ভাবে হত্যা করেছেন হিন্দুকে। কিন্তু যাঁর জন্যে হিন্দুর বুকে ছুরি বসাতে দ্বিধা করেন নি সেই স্বার্থপর কুটিলমনা বাদশাহ আওরঙজেবের মন থেকে তাঁর প্রতি নিদারুণ সন্দেহের ছায়াটিকে এতটুকু ম্লান করতে পারেন নি। তিনি জানেন তাঁকে আওরঙজেব জীবনের কণ্টক বলে মনে করেন। কামনা করেন তাঁর মৃত্যু।
সব বোঝেন তিনি। বোঝেন এতটুকু হিসাবের ভুল হলে তাঁর জীবনেও নেমে আসতে দ্বিধা করবে না বাদশাহের নির্মম আদেশ। তবু কিছু করার উপায় নেই। বাদশাহ আওরঙজেবের হাতে গোলামীর শৃঙ্খলে বাঁধা তিনি। এর থেকে মুক্তি নেই।
হিন্দুরা তাঁকে বিশ্বাসঘাতক ভাবেন। ঘৃণা করে। না, দুঃখ তাঁর নেই। শুধু মাঝে মাঝে ভাবেন কেউ তাঁর প্রকৃত অবস্থা বুঝল না। তিনি যে কত অসহায় সে খবর রাখল না কেউ।
বাদশাহের পত্র পেয়ে মহারাষ্ট্রের পথে যাত্রা করেছিলেন। শিবির স্থাপন করেছিলেন একদিন। গোপনে শিবাজীর সংবাদ জানবার জন্যে চর পাঠিয়েছিলেন। শিবাজীর সন্ধান তার চাই। বাদশাহের আদেশ পালন করে মহারাষ্ট্রের বুক থেকে আওরঙজেবের জীবনের এক অশুভ গ্রহকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।
এ ছাড়া কোন উপায় তাঁর নেই। যদি সম্ভব হয় তাহলে শিবাজীর

সঙ্গে বাদশাহের সন্ধিস্থাপনের মৃদু আশা তাঁর মনে আছে। শিবাজীর ক্ষতি তিনি চান না।

নিজ শিবিরে চুপ করে একাকী বসেছিলেন মহারাজ জয়সিংহ। আকাশে দিন শেষের ম্লান আলোটা দূর দিকচক্রবালে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। অস্পষ্ট একটা ধূসরতা আস্তে আস্তে আকাশের গা বেয়ে নেমে আসছে পৃথিবীতে।

শিবাজীর কথাই চিন্তা করেছিলেন মহারাজ জয়সিংহ। সেনাপতি আজম খাঁকে নিহত করবার পর শিবাজী আরো কয়েকটি বাদশাহী দুর্গ অধিকার করেছেন। মহারাষ্ট্রে অবস্থানকারী বাদশাহী সৈন্যদের মাঝে করেছেন আতঙ্ক সঞ্চার।

মহারাজ।

রক্ষী এসে অভিবাদন করে দাঁড়ায়।

রক্ষীর দিকে তাকান মহারাজ জয়সিংহ।

একজন ব্রাহ্মণ আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

আশ্চর্য হন মহারাজ। কে এলো হঠাৎ সাক্ষাৎ করতে।

কে তিনি ?

কিছু বলছেন না।

তবে ?

আপনার সাক্ষাৎ চান তিনি।

তাঁকে নিয়ে এসো।

আদেশ পেয়ে রক্ষী একজন ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসে। ব্রাহ্মণের দিকে একটু ক্ষীণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মহারাজ জয়সিংহ। ব্রাহ্মণের অদ্ভুত বলিষ্ঠ মূর্তি জয়সিংহের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

মহারাজ। মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মহারাজকে আহ্বান করেন ব্রাহ্মণ। চকিত হয়ে ওঠেন মহারাজ জয়সিংহ। একটু লজ্জিত হন। বলেন, আসন গ্রহণ করুন দ্বিজ।

বসেন ব্রাহ্মণ। সহাস্য মুখে শিবিরের চতুর্দিক একবার নিরীক্ষণ করে জয়সিংহের মুখের পরে দৃষ্টি স্থির করেন।

ব্রাহ্মণ।
বলুন মহারাজ।
আপনার পরিচয় কিন্তু…
আমি মহারাজ শিবাজীর অনুচর। মহারাজ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।
হেতু?
আপনার সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যে।
পরামর্শ!
হ্যাঁ মহারাজ। আপনি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা তুলনা হীন। মহারাজ মনে করেন আপনার পরামর্শ গ্রহণ করলে তাঁর অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হবে।
কি জানতে চান তিনি?
তিনি জানতে চান মহারাজ জয়সিংহ মহারাষ্ট্রে এসেছেন কেন?
শিবাজী জানেন না কেন আমি এসেছি?
জানেন।
তবে?
আপনি হিন্দু হয়ে হিন্দুর এই যে বিরুদ্ধতাচারণ করেছেন, আপনার রাজপুত সৈন্যদের অপ্রতিহত আক্রমণে যদি শেষ হয়ে যায় মারাঠার স্বাধীনতার স্বপ্ন তাতে কি লাভ আপনার? আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন রাজনীতি থেকে যদি দূরে সরে যান তাহলে কি এমন ক্ষতি হবে আপনার? মোগলের নাগপাশ ছিন্ন করে মহারাষ্ট্র যদি নতুন স্বপ্নে জেগে ওঠে আজ তাকি আপনার কাম্য নয়?
এই কথা জানতে চেয়েছেন শিবাজী?
হ্যাঁ মহারাজ।
তাঁকে জানাবেন মহারাজ জয়সিংহও মহারাষ্ট্রের মুক্তি চান। তাঁর জীবনের আদর্শকেও আমি সমর্থন করি কিন্তু তা সত্বেও দূরে সরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
কেন মহারাজ?

কর্তব্যের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ আমি।

এই শৃঙ্খল মোচন কি আপনার সাধ্যাতীত?

না।

তবে আপনি আসুন না শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিন। রাজপুত আর মারাঠা সৈন্যের অসির আঘাতে শেষ করে দিন বাদশাহের মসনদের স্বপ্নকে!

তা সম্ভব নয় ব্রাহ্মণ।

কেন সম্ভব নয় মহারাজ?

বিশ্বাসঘাতকতা করতে আমি পারবো না।

কিন্তু মহারাজ, ঘাতক আওরঙজেবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা কি এতই মহাপাপ। নির্মম ভাবে যে বাদশাহ হিন্দুর ধর্ম কলঙ্কিত করেছে, কত দেব মন্দির করেছে চূর্ণ বিচূর্ণ তার কাছে আপনার এই অটল বিশ্বাসের মর্যাদা কোথায়? আপনি আওরঙজেবকে যতই সহায়তা করুন মনে রাখবেন আপনিও হিন্দু। যে বাদশাহ হিন্দুকে দিনের পর দিন কঠিন কঠোর অবিচারে আবদ্ধ করেছে একদিন দেখবেন সেই বাদশাহ তার প্রয়োজন ফুরালে আপনাকে দূরে নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করবে না। তাই বলছি মহারাজ, আপনি আসুন শিবাজীর সঙ্গে মিলিত শক্তিতে শেষ করে দিন আওরঙজেবের হিন্দুর প্রতি সব অন্যায় অত্যাচারের স্বপ্নকে।

ব্রাহ্মণ!

মহারাজ।

যে কথা বলেছেন সে কথা আর উচ্চারণ করবেন না যদি করেন তাহলে শিবাজীর অনুচর বলে ক্ষমা করব না।

তা যদি করেন তাহলে জানবেন বাদশাহের পদলেহনকারীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার থেকে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করব।

ব্রাহ্মণ। বজ্রকণ্ঠে ডাকলেন জয়সিংহ।

ক্ষমা করবেন মহারাজ। কটূ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। সমস্ত হিন্দুস্থানের হিন্দুরা জানে আপনি বিশ্বাসঘাতক আওরঙজেবের

ক্রীতদাস। কিন্তু এতদিন বিশ্বাস করি নি সে কথা, আজ আপনার মুখে শুনে এতদিনের অবিশ্বাস বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। অভিযোগ নয় মহারাজ, এইটুকু দুঃখ নিয়ে যাচ্ছি জয়পুরের বীর মহারাজ জয়সিংহ তাঁর মনুষ্যত্ব বলি দিয়ে বাদশাহের ক্রীড়া পুত্তলীতে পরিণত হয়েছেন।

কে আপনি? চিৎকার করে ওঠেন মহারাজ জয়সিংহ।

পরিচয়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে মহারাজ। কি হবে মিছে পরিচয়ে?

তবু আমি জানতে চাই কে আপনি?

আমি শিবাজী।

শিবাজী!...!...!

শিবাজীর মুখের দিকে বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে থাকেন মহারাজ জয়সিংহ। ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না ব্রাহ্মণই শিবাজী। মনে হয় তিনি বুঝি স্বপ্ন দেখছেন। শিবাজীর এই অভূতপূর্ব সাহসে চমৎকৃত হন তিনি। একাকী নিরস্ত্র শিবাজী শত্রু শিবিরে আসবার সাহস পেলেন কি করে ভেবে পান না।

সব পারেন তিনি। বিনা আয়াসে তিনি শিবাজীকে হাতের মুঠোয় পেয়েছেন। বন্দী করে পাঠিয়ে দিতে পারেন দিল্লীতে বাদশাহ আলমগীরের কাছে। পরিবর্তে জগতের অনেক কিছুই পুরস্কার স্বরূপ পেতে পারেন! কিন্তু...

মহারাজ?

এঁ্যা।

কি ভাবছেন?

ভাবছি এত বিশ্বাস করেন আপনি হিন্দুকে?

করি মহারাজ।

এ বিশ্বাস আপনার এলো কোথা থেকে?

এই বিশ্বাসের জোরেই আমি বড় হয়েছি যে।

হিন্দু কোন আঘাত দেয় নি আপনাকে?

দিয়েছে মহারাজ।

তাহলে কোন্ সাহসে একাকী আমার শিবিরে এলেন?

সাহস নয় মহারাজ এসেছি আপনার প্রতি আমার বিশ্বাসের জোরে।
শিবাজীকে ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরেন মহারাজ জয়সিংহ।
নানান বিষয়ে আলোচনা চলে উভয়ের। বাদশাহের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব একসময় তোলেন জয়সিংহ। সন্ধির প্রস্তাব শুনে চুপ করে যান শিবাজী। জয়সিংহ সন্ধির কারণ দর্শান। সন্ধির ফলে লাভ শিবাজীর কম হবে না। বাদশাহের সঙ্গে সন্ধির অবকাশে শিবাজী তাঁর অনুচরদের যুদ্ধে পারদর্শি করে তুলতে পারবেন। বৃদ্ধ হয়েছেন জয়সিংহ। অবসর নিতে পারবেন তিনি। সেই সুযোগে শিবাজী আবার নিজমূর্তি ধরবেন। সেদিন তাঁকে দমন করতে জয়সিংহ আর আসবেন না।
মহারাজ জয়সিংহের পরামর্শ মেনে নেন শিবাজী। সন্ধির সর্ত ঠিক হয়। বাদশাহের সমস্ত দুর্গ শিবাজী যা অধিকার করেছেন সব ফিরিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া বিজাপুর আক্রমণে সহায়তা করতে হবে জয়সিংহকে।
সম্মত হন শিবাজী। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। সত্যই যদি জয়সিংহ অসি হাতে শিবাজীর বিরুদ্ধে তার রাজপুত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে নামেন তাহলে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতার স্বপ্ন চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে। এ ছাড়া ছোট ছোট আক্রমণে অনুচররাও দিন দিন হীনবল হয়ে পড়েছে।
সব দিক বিবেচনা করে মহারাজ জয়সিংহের পরামর্শে বাদশাহের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী হন শিবাজী।
একসময় বিদায় নেন শিবাজী।
শূন্য শিবিরে একাকী বসে থাকেন মহারাজ জয়সিংহ।

উতলা বসন্ত রাত্রি।

রুণাবাঈ নৃত্যের ছন্দে ছন্দে বারবার কাঁপিয়ে তোলে হাজার বাতির রোশনাইকে। মুগ্ধ হন শাহজাদা আকবর।

দুরন্ত এক ইচ্ছা বারবার বুকের মাঝে উঁকি মারে। ইচ্ছা করে রুণাবাঈয়ের যৌবনভরা দেহটাকে বুকের মাঝে চেপে ধরে দলে পিষে উপভোগ করে যৌবনের স্বাদ।

কিন্তু নিরুপায় শাহজাদা আকবর।

রুণাবাঈয়ের হরিণ কালো আঁখির কটাক্ষে আমন্ত্রণের সাড়া আজও দেখতে পায় নি শাহজাদা আকবর। শুধু জাগিয়ে তুলেছে ক্ষুধা। দুরন্ত দাহে জ্বলে পুড়ে যায় বুকটা। সুরার নেশা কেটে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে জেগে ওঠে আক্রোশ। পিতার ওপর। বাদশাহ আওরঙজেবের ওপর।

কঠোর আদেশ জানিয়ে দিয়েছেন পিতা। কোন নর্তকীর পদার্পণ যেন না ঘটে শাহজাদার প্রাসাদে।

না হলে…। হ্যাঁ, রুণাবাঈকে জোর করে লুঠে নিয়ে যেত শাহজাদা আকবর। নটীর সব অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিত। এমন ভাবে দীন ভিখারীর মতো শাহজাদা সব লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করে আসতো না নটীর ঘরে।

এমন ঘটনা বুঝি শাহজাদাদের ইতিহাসে এই প্রথম। বুঝি শেষ। সামান্য এক রূপসী নটীর এত গর্ব এত অহঙ্কার অসহ্য মনে হয় আকবরের। ভাবে, আর আসবে না এমন ভাবে মাথা নিচু করে। কিন্তু পারে না। সব প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাবার পরই চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। স্থির থাকতে পারে না শাহাজাদা আকবর। রুণাবাঈয়ের তীক্ষ্ণ তীব্র যৌবনের উন্মাদনায় ছুটে আসে। উৎসাহ দেয় কাদেরবক্স।

বলে, কি ভাবছেন হুজুর ? চলুন।

না কাদের।

কেন হুজুর ?

নিজেকে বড় হীন মনে হয়।

মধু যদি পান করতে চান তাহলে ওটুকু স্বার্থত্যাগ করতে হবে হুজুর।

কিন্তু ভাগ্যে মধু পান জুটবে কি না তার নিশ্চয়তা কি ?

জুটবে হুজুর।

তবে ?

ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

কি ব্যবস্থা করবে তুমি, অর্থে ?

অর্থের মোহ দেখি না হুজুর।

তবে আশা নেই।

আশা ছাড়া অন্য পথও দেখি না। ধৈর্য ধরুন সুদিন নিশ্চই আসবে।

সেই আশায় তুমি থাক। বিরক্ত হয় শাহজাদা আকবর। কাদেরবক্সকে মনে হয় নিরেট মূর্খ।

কথা বলে না কাদেরবক্স। চুপ করে থাকে।

শাহজাদা।

সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙে শাহজাদা আকবরের। রুণাবাঈয়ের মুখের পানে তাকায়।

কি ভাবছেন ?

ভাবছি···

কি ?

ভাবছি তৃষিত চাতকের মতো আর কতদিন জলের আশায় দিন কাটাবো ?

প্রাসাদে কি জলকষ্ট নিদারুণ ?

হ্যাঁ পিয়ারী।

বড় কষ্ট তাহলে তো। কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুণাবাঈ।

তাইতো ছুটে আসি···

দাসীর সৌভাগ্য শাহাজাদা। তীক্ষ্ণ কটাক্ষে শাহজাদার মুখের পানে তাকায় রুণাবাঈ। অধরে সর্বনাশা মৃদু হাসির রেখা খেলে যায়।

দুরন্ত লোভে চিক্ চিক্ করে ওঠে আকবরের দুই চোখের তারা।

পিয়ারী। রুণাবাঈয়ের দিকে হাত বাড়ায় শাহজাদা আকবর।

হঠাৎ বাধা সৃষ্টি করে বাতাসী। সাহিরাকে ডাকে।

কি হয়েছে বাতাসী?

মা কেমন করছে।

কেমন করছে?

বোধহয়…। বলতে পারে না বাতাসী।

কেঁপে ওঠে সাহিরার বুক। আকবরের কাছে বিদায় নিয়ে দ্রুত চলে যায়।

চুপ করে বসে থাকে শাহজাদা আকবর। পাখী আজ নাগালের মধ্যে এসেও ফস্কে গেল। একসময় কাদেরবক্সের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আকবর।

সূর্যপ্রসাদ নীরবে বিদায় জানায়।

মা—মা। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে সাহিরা।

চোখ মেলে সাহিরার মুখের পানে তাকায় মণিবাঈ। মৃদু হাসির ক্ষীণ একটা রেখা খেলে যায় মণিবাঈয়ের পাণ্ডু-মুখে।

মা।

বেটী।

মা।

নিজের পথ চিনে চলিস বেটী। এ জীবন বড় দুঃখের। পদে পদে এর বিপদ। আর…

কি মা।

আমার বেটীকে একটু সন্ধান করিস। ঠিক তোর মতই দেখতে হবে। শুনেছি তার বাঁ দিকের বুকে একটা…

কি একটা?

জরুল আছে।

মা—মা আমি আমিই…। কেউ শোনে না। গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে মণিবাঈ। এ ঘুম আর ভাঙবে না কোনদিন।
মণিবাঈয়ের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে সাহিরা কাঁদে আর কাঁদে।

॥ আটাশ ॥

বাদশাহ আওরঙজেবের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন হয় শিবাজীর।
সন্ধির সর্ত অনুযায়ী মহারাজ জয়সিংহকে বিজাপুর আক্রমণে সহায়তা করেন শিবাজী।
মারাঠা আর রাজপুতের মিলিত শক্তিতে অল্পদিনের মধ্যেই বিজাপুরের অনেক দুর্গ বাদশাহ আওরঙজেবের নামে অধিকার করে নেন মহারাজ জয়সিংহ। মোগলের জয়ধ্বনিতে মুখর হয় বিজাপুরের আকাশ বাতাস।
শিবাজীকে মূল্যও বড় কম দিতে হয় না। নিতাইজীকে চিরদিনের মতো হারান শিবাজী। নিতাইজীর শোকে ভেঙে পড়েন শিবাজী।
মনের মাঝে হাহাকার জাগে। এ তিনি কি করলেন।
সান্ত্বনা দেন মহারাজ জয়সিংহ।
বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু অগৌরবের নয় ভাই।
কিন্তু নিতাইজী পরের গোলামীর জন্য প্রাণ দিলেন মহারাজ।
সে তো মাতৃভূমির স্বার্থেই।
কিন্তু…
এতে কিন্তুর কিছু নেই ভাই। যুদ্ধক্ষেত্রে বীর বীরধর্মই পালন করেন। তখন স্বার্থের কথা মনে আসে না তাঁর।
উত্তর দেন না শিবাজী। মহারাজ জয়সিংহের সান্ত্বনা বাক্যে শান্ত হয় না মন। দুঃসহ এক ব্যথায় ভরে থাকে সারা অন্তর।
পত্র আসে বাদশাহ আওরঙজেবের কাছ থেকে। শিবাজীকে তিনি দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
শিবাজীকে সে কথা জানান মহারাজ জয়সিংহ।

মহারাজ।

শিবাজীর মুখের দিকে তাকান জয়সিংহ।

বাদশাহের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা কি উচিত হবে?

কে?

আমাকে হাতে পেয়ে যদি তিনি আমার অনিষ্ট করেন?

সে সাহস বাদশাহের হবে না। কারণ তিনি বেশ ভাল ভাবেই জানেন তাহলে মহারাজ জয়সিংহ তাঁর ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তাছাড়া আমার পুত্র রামসিংহ দিল্লীতে আছে। আপনি নির্ভয় হতে পারেন।

শিবাজী দিল্লী যাত্রার আয়োজন করেন। যাত্রার দিন এগিয়ে আসে। এমন সময় সংবাদ আসে জীজাবাঈ মৃত্যু শয্যায়।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটে যান শিবাজী কিন্তু জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। মাকে হারিয়ে অসহায় শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েন শিবাজী। মালশ্রী সান্ত্বনা দেয়। তবু স্থির হতে পারেন না শিবাজী।

নীরা এসে কাছে দাঁড়ায়।

ম্লানমুখী নীরব ব্যথা ভরা মুখের দিকে অশ্রু সজল চোখ তুলে তাকান শিবাজী।

শম্ভুকে স্থির রাখতে পারছি না প্রভু। সারাদিন কেবল কাঁদে। পুত্রকে কাছে ডাকেন শিবাজী। বালক এসে পিতার বুকে মুখ ঢাকে। মাতৃহারা শিশু পুত্রের দুঃখ শিবাজীর অন্তরে হাহাকার তোলে।

আসে বিদায়ের দিন।

শম্ভুকে তুমি কাছে রাখো নীরা।

দিল্লী না গেলেই কি নয় প্রভু?

এ প্রশ্ন কেন নীরা?

কেন ঠিক জানি না। আমায় বলছে যদি কোন···

না বোন। মহারাজ জয়সিংহকে আমি কথা দিয়েছি। দিল্লী আমাকে যেতেই হবে।

তবু যদি···

সে হয় না বোন। তাহলে শিবাজীর নামে কলঙ্ক রটবে। সারা হিন্দুস্থান জানবে শিবাজী ভীরু কাপুরুষ। সে অপবাদ আমি সহ্য করিতে পারবো না।

তবে আর বাধা দেব না আপনাকে।

তুমি ভেব না, আমি দিল্লী থেকে শীঘ্রই ফিরে আসবো। তুমি শম্ভুকে দেখো।

দেখবো প্রভু।

কিন্তু বিদায়ের সময় বালক কিছুতেই ছাড়ে না পিতাকে। পুত্রকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হন শিবাজী।

প্রভু...

বল নীরা।

কি করবেন ?

শম্ভু সঙ্গেই চলুক।

কথা বলে না নীরা। নীরব থাকে।

শুধু অশ্রুতে ভরে ওঠে তার দুই আঁখি। দেখেন শিবাজী।

বোঝেন নীরার দুঃখ। কিন্তু তিনি নিরূপায়। নীরার আঁখির এ অশ্রু তিনি কি করে রোধ করবেন।

দিল্লীর পথে এগিয়ে চলেন শিবাজী। সঙ্গে কয়েক শত মাওলী অনুচর। বালক শম্ভুজীও চলেছে সঙ্গে।

মনের সন্দেহ তবু যায় না শিবাজীর। বারবার মনে পড়ে নীরার কথা। আওরঙজেবের এই আমন্ত্রণে সন্দেহ জাগে মনে। তবু ফেরবার কোন উপায়ই নেই। মহারাজ জয়সিংহকে তিনি কথা দিয়েছেন। মালশ্রীকে রেখে যেতে চেয়েছিলেন শিবাজী। রাজী হয় নি মালশ্রী। তাই মালশ্রীও চলেছে সঙ্গে। যশজী, বাজী সঙ্গে যাচ্ছে না।

চলেছে মল্ল। নিতাইজীর মৃত্যুর পর কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে মল্ল। মাওলী সেনার দল কিন্তু নির্বিকার। শিবাজীর সঙ্গে বহুবার তারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ভয় কাকে বলে তারা জানে না। শিবাজীর জন্যে হাসিমুখে যারা যমের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারে। সব পারে তারা।

মহারাষ্ট্রের পথের ধুলোয় ঝড় ওঠে। সগর্বে এগিয়ে চলে মাওলী সেনার দল।
রামদাস স্বামী বাদশাহী সৈন্যর সঙ্গে যুদ্ধের পর আবার তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছেন। কবে যে আবার ফিরবেন তিনিও বুঝি জানেন না। তিনি থাকলে বাদশাহের এই আমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মতি দিতেন কিনা কে জানে। হয়তো নীরার মতই নিষেধ করতেন।
বারবার তাই নীরার কথা মনে পড়ে শিবাজীর।

॥ উনত্রিশ ॥

অশ্রুমুখী মেহেরুন্নিসার দিন কাটে এক পঙ্গু অথর্ব জীবন যন্ত্রণাকাতর বৃদ্ধকে ঘিরে। সমব্যথী দুটি হৃদয় পরস্পর পরস্পরের নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়।
নিজের অশ্রান্ত হৃদয়ের ব্যথা ভুলে দুঃখী মেয়েটার দুঃখে কাতর হন সাজাহান। তাই বারবার কাছে টেনে নেন। সান্ত্বনা দেন। ধৈর্য ধরতে বলেন। ক্ষুব্ধকণ্ঠে পুত্রের অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান আল্লার কাছে।
পিতামহের দুঃখে বুক ফাটে মেহেরুন্নিসার। যন্ত্রণা কাতর বৃদ্ধের জীর্ণ বক্ষে মাথা দিয়ে হৃদয়ের ব্যথা উপলব্ধি করে।
ভারত সম্রাট সাজাহান আজ একজন নগণ্য বন্দীর মতো জীবন যাপন করছেন। তেত্রিশকোটি হিন্দু মুসলমানের ভাগ্যবিধাতা আজ পুত্রের অবিচারের দণ্ডে দণ্ডিত। ভাবতে পারে না মেহেরুন্নিসা।
সহ্য করতে পারে না বৃদ্ধ পিতামহের আজকের এই পরিণাম। হতাশার আত্মদাহে পিতামহ আজ মৃতপ্রায়।
কেন? কি অপরাধ করেছিল পিতামহ? কি প্রয়োজন ছিল শিশুর থেকে অসহায় এই অথর্ব বৃদ্ধকে বন্দী করবার। এই অথর্ব পঙ্গু মানুষটাকে বাইরের মুক্ত আলো বাতাসের মাঝে বাস করতে দিলে কি এমন ক্ষতি হ'ত পিতার!

মেহেরুন্নিসার কথা শুনে হাসেন বৃদ্ধ। কাছে টেনে নেন অবুঝ মেয়েটাকে।

বলেন, বৃদ্ধ পঙ্গু সাজাহানকে মুক্ত করে রাখলে কত সর্বনাশা বিপদ যে আওরঙজেবের হতে পারে তা তুই বুঝবি না দিদি। চতুর পুত্র তাই আমাকে বন্দী করে রেখেছে। রাজভোগ না দিয়ে দিচ্ছে সাধারণ মানুষের খাদ্য। যাতে পিতা তার অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু এমনই কঠিন প্রাণ আমার শত দগ্ধানীতেও শেষ হচ্ছে না। আর কতদিন এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তা আল্লাই জানেন। কিন্তু দিদি আর আমি পারছি না ; আর সহ্য হচ্ছে না এ যন্ত্রণা। মুক্তি চাই, মুক্তি চাই আমি।

পিতামহ। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকে মেহেরুন্নিসা।

হ্যাঁ দিদি, তুই-তোর জন্যেই পারছিস্ না। তুই কিন্তু আমাকে কঠিন বাঁধনে বেঁধে ফেলেছিস। যে পুত্রকে ঘৃণা করি তার কন্যা তুই কিন্তু তবু তোকে আমি ভালবাসি। একটু চুপ করেন বৃদ্ধ। বলেন, জানিস কেন ভালবাসি তোকে ? তোর এই সুন্দর নিষ্পাপ মুখটির জন্যে।

পিতামহ···

কি দিদি ?

জীবনে আমি তো অনেক পাপ করেছি।

জানি। কিন্তু দিদি, তোর সব পাপ ধুয়ে মুছে গেছে অনুশোচনার অশ্রুতে। যে পাপ তুই করেছিস সে পাপ তোর দেহকে স্পর্শ করলেও মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাই তো তুই মহাপাপী আমাকেও এমন ভাবে কাছে টানতে পেরেছিস দিদি।

পিতামহ।

সত্যি দিদি। শাহজাদা খুরুম জীবনে বহু ঘৃণ্য অন্যায় অপরাধ করেছে। স্নেহময় পিতার বিশ্বাসের সুযোগে মসনদের লোভে বিশ্বাস হন্তা হ'তে একটুও বাধে নি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। তাইতো শেষ জীবনে পুত্রের হাতে এই নিদারুণ লাঞ্ছনা।

চুপ করুন পিতামহ।

চুপ করবো। একদিন একবারে চুপ করবো। সেদিন আল্লার বিচারের সব দণ্ড মাথা পেতে নেব। বলবো, আল্লা জীবনে বহু অন্যায় করেছি এর জন্য সবাই ক্ষমা করলেও তুমি আমাকে ক্ষমা করো না। আমাকে দণ্ড দাও তুমি!

চুপ করেন সাজাহান। আঁখির অশ্রুতে বুক ভাসে।

পিতামহের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে মেহেরুন্নিসা। পিতামহের এই দুঃখ সহ্য করতে পারে না সে। কিন্তু কোন উপায়ই নেই কিছু করবার। নিরুপায় মেহেরুন্নিসা শুধু অশ্রান্ত হৃদয়ে সহস্র নীরব প্রশ্ন ভরা চেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকে। আল্লা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? তা যদি না থাকবেন তাহলে এত অন্যায়, পাপ, দুঃখ যন্ত্রণা কেন? কেন এই স্নেহের মাঝে অবিশ্বাসের সন্ধান খোঁজা। বিশ্বাসের সুযোগে সর্বনাশা খেলা?

শিবাজী মরে নি জীবিত আছে, হারান দুর্গ উদ্ধার করে সম্মুখ সংগ্রামে পরাস্ত করেছে বাদশাহী সৈন্য; মৃত্যু হয়েছে সেনাপতি আজম খাঁর এ সংবাদ একদিন পৌঁছেছিল আগ্রা দুর্গে বন্দিনী মেহেরুন্নিসার কাছে। সেদিন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল মেহেরুন্নিসা। চঞ্চলা কিশোরীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পিতামহের বুকে। বুকে মুখ ঢেকে দুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসটাকে সংযত করতে চেয়েছিল মেহেরুন্নিসা।

কি হ'ল রে? বিস্ময়ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন সাজাহান।

কিছু না।

তবে?

এমনি।

বলবি না?

কিছু হয় নি, কিচ্ছু হয় নি।

ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল মেহেরুন্নিসা।

হেসেছিলেন সাজাহান। দুঃখীনি মেয়েটার মনের খবর তিনি জানেন। শুনেছেন শিবাজীর সমস্ত সংবাদ। বুঝেছিলেন মেয়েটার উচ্ছ্বসিত আনন্দের অর্থ।

হ্যাঁ, সেদিন আসমানের রঙ পাল্‌টে গিয়েছিল মেহেরুন্নিসার চোখে। বাগীচার ফুলকে ঘিরে সেদিন প্রজাপতির মতো মনও নেচে উঠতে চেয়েছিল। অজস্র সেলাম জানিয়েছিল আল্লার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আজ একি শুনছে মেহেরুন্নিসা!

শিবাজী আসছেন দিল্লীতে। পিতার সঙ্গে সন্ধি হয়েছে শিবাজীর। বিজাপুর আক্রমণে বাদশাহের পক্ষে মহারাজ জয়সিংহকে করেছেন নানাভাবে সাহায্য। বাদশাহ আলমগীর খুশী হয়েছেন। শিবাজীর সব অন্যায় অপরাধ ভুলে শিবাজীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উপযুক্ত মর্যাদা দান করবার জন্যে।

তাই দিল্লী আসছেন শিবাজী। দিল্লীর অগণিত জনগণ মারাঠা বীরকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল প্রতীক্ষা রত।

মেহেরুন্নিসার অন্তরের অন্তঃস্থলেও জেগে উঠেছে মৃদু মধুর সুরলহরী। শিবাজী দর্শনের ব্যাকুলতা আজ তারও মনে।

তবু বুকটা এক অজানিত আশঙ্কায় বারবার কেঁপে ওঠে কেন? কেন অমঙ্গল চিন্তায় আচ্ছন্ন হয় মন?

না—পিতাকে বিশ্বাস করতে পারে না সে। পিতার এই আমন্ত্রণকে ভয় করে মেহেরুন্নিসা। কূটবুদ্ধি আলমগীরের চক্রান্ত বড় মর্মান্তিক! যদি সত্যই কোন চক্রান্ত করে থাকেন পিতা, যদি শিবাজীকে হাতে পেয়ে···। না, ভাবতে পারে না মেহেরুন্নিসা। কেঁপে ওঠে বুক। অসহ্য আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে মেহেরুন্নিসা।

পিতামহ।

বল মা।

পিতা যদি তাঁকে···।

সম্ভব।

তবে? স্থির হয় মেহেরুন্নিসার চোখের তারা। আতঙ্কে।

কি?

কি হবে তাহলে?

আল্লা তাঁকে রক্ষা করবেন না।

কিন্তু…

ভেবে মন খারাপ করে করবি কি বল? এমনও তো হতে পারে, আমাদের এই আশঙ্কা অহেতুক। আওরঙজেবের আমন্ত্রণে কোন কপটতা নেই।

কেমন করে তা সম্ভব পিতামহ?

সম্ভব নয় কেন বল?

জীবনে জগৎ সংসারকে অবিশ্বাস করা ছাড়া যিনি আর কিছুই জানেন না। যার ক্রূরতা, আর কপটতার কোন সীমা পরিসীমা নেই, কেমন করে তাঁর পক্ষে অসাধ্য বিশ্বাস সম্ভব পিতামহ?

এ তুই কি বলছিস দিদি।

সত্যিই বলছি পিতামহ। বাইরের লোক জানে আপনার নাতনী জাঁহানারা আপনার সেবা করবার জন্যে স্বেচ্ছায় আগ্রার দুর্গে বাস করছেন। কিন্তু সত্যই কি তাই? বন্দী হলেও আপনার পুত্র আপনার কোন অভাব রাখেন নি কিন্তু যে খাদ্য আপনাকে আহার করতে দেওয়া হয় তা কি মানুষের আহারের উপযুক্ত। যে পাদুকা আপনি ব্যবহার করছেন ভারত সম্রাট সাজাহান কি কোন দিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন এমন পাদুকাও মানুষে ব্যবহার করে? সেই আপনি বলছেন পরিবর্তন এসেছে আপনার পুত্রের!

ছিঃ দিদি, ও কথা বলিস নি। চরিত্রের পরিবর্তন অসম্ভব নয়। সত্যই হয়তো আওরঙজেবের চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে। আয় দিদি, আমরা আল্লার কাছে প্রার্থনা করি সত্যই যেন তার চরিত্রে পরিবর্তন আসে। পুত্র আমার যেন এবার থেকে সৎ পথে চলে।

পিতামহের সান্ত্বনা বাক্যে সায় দিতে পারে না মেহেরুন্নিসা। আশঙ্কার কালো ছায়াটা বুকের মাঝে চেপে বসে। কঠিন পাষাণের মতো মনে হয়।

তবু পিতামহের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। বসতে হয় প্রার্থনায়। পঙ্গু অথর্ব ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখবার এছাড়া আজ অন্য পথ যে নেই।

॥ তিরিশ ॥

মণিবাঈ নেই।

মৃত্যু এসে মণিবাঈয়ের ব্যাধি জর্জরিত জীর্ণ দেহ থেকে প্রাণটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। দিয়ে গেছে এ বাড়িটার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে মৃত্যুর বিভীষিকা। একটা ভয় ভয় আতঙ্কের কাঁপা কাঁপা ছায়া এ বাড়িটায় সন্ধ্যা নামলেই ঘুরে বেড়াতে স্থুরু করে।

মনে হয় কে যেন নিঃশব্দে ঘুরছে ফিরছে। ভয় করে সাহিরার।

মাঝে মাঝে অন্ধকার রাত্রে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে যায় সাহিরা। পারে না। কে যেন কণ্ঠনালী চেপে ধরে। জেগে ওঠে সাহিরা। স্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন দেখে সাহিরা। ভয়ে সারা শরীর থর থর করে কাঁপে।

বাতাসীকে জাগায় সাহিরা। ওঠে বুড়ি। সব শুনে চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবে।

বাতাসী।

এ্যাঁ। যেন চমকে ওঠে বুড়ি।

কি হ'ল ?

কিছু না।

তবে যে চমকে উঠলি ?

একটু চুপ করে থাকে বুড়ি। সাহিরাকে একটু দেখে।

বলে, অমন হয়।

হয় !

হ্যাঁ। ভুলতে পারে না সে।

যদি আমাকে কোনদিন···। কথাটা শেষ করতে পারে না সাহিরা। আতঙ্কে স্থির হয়ে যায় দুই চোখ।

না রে, সে ভয় নেই। সন্তানের ক্ষতি কোন মা করতে পারে না।

মা !

না। মণিবাঈ জেনে যেতে পারে নি সাহিরাই সেই হারানো মেয়ে।

মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার আগেই।

বুড়ো খুদা মিয়া যে কোথায় আছে কি নেই কে জানে; কবে যে এ বাড়ি আসা বন্ধ করেছে লক্ষ্য করে নি সাহিরা। নতুন জীবনের মাঝে সে খবর জানার অবসর ছিল না তার।

বুড়ি বাতাসী খুদা মিয়া সম্বন্ধে নীরব।

দিন কাটে সাহিরার। কেমন যেন এক পরিবর্তনের স্রোত এসেছে তার জীবনে। নাচ ঘরে বাতি জ্বলে না। বাজে না সাহিরার পায়ের ঘুঙুর।

সূর্যপ্রসাদ ঘুরে বেড়ায় ঠিক যেন ছায়ার মতো। একা একা, চুপচাপ। বড় শান্ত বড় বোকা ছেলেটা। বয়স হলেও জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ওর জন্যে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে করুণা বোধ করে সাহিরা। রাগ হয়। দুরন্ত হিংসা জেগে ওঠে মনের মধ্যে। ভেবে পায় না সাহিরা ওর ওপর কেন এই রাগ? ও তো কিছুই করে নি তার। তবে?

সাহিরা অনেক ভেবেছে। কিনারা মেলে নি। তবু সাহিরা ওর ওপর খুশী হতে পারে না। কেন?···কেন?···কেন?

উত্তর পায় নি সাহিরা। মনে হয় ওই দোষী। দোষ ওর সাহিরার মাঝে নৃত্যের নেশা জাগিয়ে তোলা।

সাহিরা ভুলে যায়। সব ভুলে যায় সাহিরা। ভুলে যায় মনের মাঝে জ্বলন্ত প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞাটাকে। নৃত্যের জোয়ারে কোথায় কত দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সাহিরাকে।

শাহজাদা আকবর তাই ফিয়ে যায় প্রাসাদে।

তাই। তাই ওর ওপর দুরন্ত হিংসা জাগে সাহিরার। সাহিরার প্রতিজ্ঞা পূরোণে ওই অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মাঝে মাঝে তাই অস্থির হয়ে উঠেছে সাহিরা। আত্মদাহে হয়েছে ক্ষত বিক্ষত। কিন্তু আর নয়। এবার আর সাহিরা কোন বাধা মানবে না। শয়তানের বুকের রক্তে নেভাবে তার মনের আগুন। শাহজাদা আকবরের নিস্তার নেই আর।

কিন্তু শাহজাদা আসে না কেন? দিনের পর দিন পার হচ্ছে!

কোন সংবাদ নেই শাহজাদার। তবে কি আর আসবে না?
ভাবে সাহিরা। অস্থির হয়ে ওঠে দিনে দিনে।
একদিন সংবাদ পায় শিবাজী দিল্লী আসছেন বাদশাহ্ আওরঙজেবের আমন্ত্রণে। কয়েক দিনের মধ্যেই দিল্লী এসে পৌঁছবেন শিবাজী।
সাহিরার বুকটাও কেঁপে ওঠে এ সংবাদে। আশঙ্কা জাগে মনে।
ডাকে সূর্যপ্রসাদকে। এই প্রথম।
সূর্যপ্রসাদ।
কি?
একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।
কি কাজ?
মহারাজ শিবাজী দিল্লী আসছেন জানো?
হ্যাঁ।
তাঁর সংবাদ নিয়ে আসতে হবে।
কি সংবাদ?
যে সংবাদ পাবে।
কেন?
প্রয়োজন আছে।
কি প্রয়োজন?
তা তোমার না জানলে চলবে। যা বলছি তাই করবে।
ওঃ। আর কথা বলে না সূর্য। নীরব থাকে।
পারবে তো?
পারবো কি না জানি না চেষ্টা করবো।
তাই কোর। আর কথা বলে না সাহিরা। আর দাঁড়ায় না।
চলে যায়।
চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সূর্যপ্রসাদ।

॥ একত্রিশ ॥

দেওয়ানী খাস।

সম্রাট সাজাহান নির্মিত ময়ুর-সিংহাসনে বসে আছেন বাদশাহ আলমগীর। আমীর ওমরাহ মনসবদার ও ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা সেনাপতি নীরবে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন আলমগীরের বিপুল ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ।

মসনদে বসে নিজের মনেই চিন্তা করছিলেন আওরঙজেব। ভাবছিলেন শিবাজীর কথা। একটু পরেই নির্বোধ শিবাজী সিংহের বিবরে প্রবেশ করবে। সারা জীবনেও মুক্তি পাবে না। যে অপমান শিবাজী তাঁকে করেছে তার ফল ভোগ তাকে করতেই হবে।

হ্যাঁ, এর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে কিছুদিন।

আহমদ নগরে মহারাজ জয়সিংহ। জয়সিংহকে সরাতে হবে আগে। না হলে জয়সিংহের রোষের আগুনে দগ্ধ হতে পারে আলমগীরের ময়ূরসিংহাসন।

কৌশলে বন্দী করতে হবে শিবাজীকে।

শিবাজী পুত্র শম্ভুজী আর তন্নজী মালশ্রীর সঙ্গে এগিয়ে চলেন আম-খাসের দিকে। সঙ্গে চলেছেন মহারাজ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ। যমুনার কোল থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত অগণিত জনতার ভীড়। উৎসুক নেত্রে সকলেই শিবাজীকে দেখছে। এতদিন শিবাজীর নাম শুনে এসেছে। শুনেছে মহারাষ্ট্রের দুর্দান্ত দস্যু শিরাজী আসছে আওরঙ-জেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সন্ধি হয়েছে আওরঙজেবের সঙ্গে।

শিবাজীকে দেখে আশ্চর্য সবাই। এ কেমন দস্যু! এত সুন্দর স্বাস্থ্যবান পুরুষ কেমন করে দস্যু হতে পারে। এ বাদশাহী অপপ্রচার ছাড়া কিছু নয়।

অশ্বারোহনে নীরবে পথ অতিক্রম করেন শিবজী। চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বারবার আশঙ্কায় কাঁপন তোলে।

মহারাজ।

আমখাসে প্রবেশের পূর্বে কাছে এগিয়ে আসেন রামসিংহ।

রামসিংহের মুখের দিকে তাকান শিবাজী।

আপনাকে খুব চিন্তিত দেখছি।

ও কিছু না। মৃদু হাসেন শিবাজী।

প্রভু। ডাকে মালশ্রী।

এঁ্যা।

এবার তাহলে বিদায় দিন।

এঁ্যা-হ্যাঁ।

আপনার সংবাদ তাহলে কি ভাবে পাবো?

রামসিংহের দিকে তাকান শিবাজী।

আপনি এক কাজ করুন তন্নজী। বলেন রামসিংহ।

বলুন।

শিবিরে ফিরে না গিয়ে আমার প্রাসাদে বিশ্রাম করুন। আমি ফিরে মহারাজের সংবাদ দেবো।

সেইমতো ব্যবস্থা হয়। রামসিংহের একজন অনুচরের সঙ্গে মালশ্রী আর মল্ল শিবাজীর কাছে বিদায় নিয়ে রামসিংহের প্রাসাদে যায়।

শিবাজীকে নিয়ে আমখাসে প্রবেশ করেন রামসিংহ। সঙ্গে বালক শম্ভুজী। তারপর···

শিবাজীর ভাগ্যবিধাতা বুঝি ক্ষণিকের বিদ্রূপ হাসি হাসেন।

আওরঙজেবের কৌশলে কিছুদিনের মতো বাদশাহী আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য হন শিবাজী। গোসলখানার শূন্য কক্ষে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়েন বাদশাহ আলমগীর। বহুদিনের ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়েছে। নিজের ভুলে সর্বনাশ ডেকে এনেছে শিবাজী। এবার বুঝবে সে বাদশাহী আতিথেয়তার স্বরূপ। কিন্তু তার পূর্বে রামসিংহকে দিল্লী ছাড়া করতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে জয়সিংহের। একে একে চারিদিক বেঁধে এগুতে হবে। এতটুকু হিসেবের ভুল হলে চলবে না। এই কোন্ হ্যায়। চিৎকার করে ওঠেন আওরঙজেব।

প্রহরা এসে কুনিশ করে দাঁড়ায়।

গোলাম খাঁ কো বোলাও।

গোলাম হাজির জাঁহাপনা। এগিয়ে আসেন গোলাম খাঁ।

তুমি কি যাদু জানো গোলাম খাঁ ?

একথা কেন জাঁহাপনা ?

না ডাকতেই হাজির হচ্ছ তাই ?

জানি জাঁহাপনা।

আমাকে শেখাবে ?

আপনাকে ?

হ্যাঁ।

না জাঁহাপনা।

কেন আমি শিখতে পারবো না ?

আপনাকে শেখাবার মতো আমার বিদ্যে নেই জাঁহাপনা।

এ তোমার বিনয়।

না জাঁহাপনা। এ সত্য। আপনি বিনা যাদুতে যা পারেন আমার যাদু তা কোনদিনই পারবে না।

তুমি কি সরাব খেয়েছ না কি ?

আমার কথা শুনে তাই মনে হচ্ছে কি আপনার ?

তাই তো মনে হচ্ছে।

না জাঁহাপনা। যে সরাবের নেশায় এতদিন বুঁদ হয়েছিলুম আপনার বিনা যাদুর খেলায় সে নেশা টুটে গেছে।

তোমার এ কথার অর্থ ?

অর্থ ! হাসেন গোলাম খাঁ। অর্থ জাঁহাপনার অজানা নয়।

গোলাম খাঁ !

সত্য জাঁহাপনা।

মনে রেখ তোমার দুঃসাহস দিন দিন তোমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

গোলামের বেয়াদফি মাপ করবেন। ভেবেছিলুম চুপ করেই থাকবো

কিন্তু চুপ করে থাকতে পারছি না। তাই ভাবছি...।
চুপ করে যদি না থাকতে পারো কোথাও চলে যাও।
আর দাঁড়ান না আওরঙজেব। কক্ষ ছেড়ে চলে যান।
চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে গোলাম খাঁ।

সন্ধ্যার সময় নিজ প্রাসাদে ফিরে আসেন রামসিংহ।
কি সংবাদ কুমার, প্রভু ভাল আছেন তো? জিজ্ঞাসা করে মালশ্রী।
আছেন। ক্লান্ত রামসিংহ বসে পড়েন।
বাদশাহ তাকে...
বন্দী করেছেন।
প্রভু বন্দী!
হ্যাঁ, তন্নজী। আমার ভুলের জন্যেই তিনি বন্দী হলেন। পিতা আমাকে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু আমি পিতার এমনই অযোগ্য সন্তান তাঁকে রক্ষা করতে পারলাম না।
ভেঙে পড়েন রামসিংহ।
কুমার।
তন্নজী।
কি হয়েছে বলুন আপনি।
সমস্ত ঘটনা শোনে মালশ্রী। বোঝে শয়তান আওরঙজেবের চাতুরী।
কুমার।
এঁ্যা।
এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। প্রভু স্বইচ্ছায় বাদশাহের আতিথ্য গ্রহণ করছেন এতে কি করতে পারতেন আপনি। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে আমাদের ধারণা সত্য নয়।
কিন্তু...।
মালশ্রী আর কথা বলে না। নীরব মল্ল। বিমূঢ়ের মতো বসে থাকেন রামসিংহ। বাইরে অন্ধকারটা ঘন হয়। দিল্লী নগরী আলোক মালায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বিদায় নেয় মালশ্রী আর মল্ল। থাকবার জন্যে অনুরোধ করেন রামসিংহ। কিন্তু সাহস করে না মালশ্রী। তাদের ওপরেও যে আওরঙজেবের আঘাত পড়বে না কে বলতে পারে। অশ্ব দুটি রাম সিংহের আস্তাবলে থাকে।

মালশ্রী আর মল্ল নীরবে পথ চলে। দুজনের মনই চিন্তাচ্ছন্ন।

অনেক পরে মালশ্রীর খেয়াল হয় পথ ভুল করেছে তারা। কখন যে ভুল পথে এসে পড়েছে দুজনের কেউই খেয়াল করে নি। দিল্লীর প্রাসাদ চূড়া এখান থেকে দেখা যায় কিন্তু নিস্তব্ধ এই গলিপথে আলোর ইসারা খুবই কম।

মল্ল। ডাকে মালশ্রী।

উঁ।

পথ ভুল করেছি আমরা।

মালশ্রীর মুখের দিকে তাকায় মল্ল। কথা বলে না।

চল ফেরা যাক।

চলুন।

ফেরে দুজনে। যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে চলে।

বেশি দূর এগুতে হয় না। মালশ্রীর মনে হয় যেন তাদের অনুসরণ করছে।

মল্ল।

কি ?

কে যেন আমাদের পিছু নিয়েছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

এসো। মল্লকে নিয়ে পাশের গলিপথে আত্মগোপন করে মালশ্রী।

অনুসরণকারীর পথ রোধ করে দাঁড়ায় মল্ল। কঠিন দৃষ্টিতে যুবকটির দিকে তাকায় মালশ্রী। কে তুমি ?

সূর্যপ্রসাদ।

আমাদের অনুসরণ করছ কেন ?

চুপ করে থাকে সূর্য।

বল নাহলে প্রাণ দিতে হবে। তরবারি কোষমুক্ত করে মালশ্রী।
প্রয়োজন আছে।
কি প্রয়োজন ?
জানি না।
কার আদেশে আমাদের অনুসরণ করছ ; বাদশাহের ?
না।
তবে ?
আমি বাদশাহের লোক নই।
তবে কে পাঠিয়েছে ?
রুণাবাঈ।
সে কে ?
আসুন।
কোথায় ?
রুণাবাঈয়ের কাছে।
কেন ?
তিনি নিয়ে যেতে বলেছেন।
আশ্চর্য হয় মালশ্রী। কে এই রুণাবাঈ। তার কাছে কি প্রয়োজন তাদের। মনে মনে কৌতূহল অনুভব করে মালশ্রী। সন্দেহ জাগে। যুবকটি সত্যি কথা বলছে তো।
আচ্ছা…
বলুন।
বাদশাহ তোমাকে…
আমি বাদশাহের লোক নই।
তবে ?
আগেই বলেছি কার লোক। যদি আমার সঙ্গে যেতে চান চলুন। তাতে আপনাদের মঙ্গল হবে।
কি করে বুঝবো ?
গেলেই বুঝতে পারবেন

মল্লর মুখের দিকে তাকায় মালশ্রী। নির্বিকার মল্ল। ভাবে মালশ্রী। যাবে কি যাবে না। একবার মনে হয় কি দরকার ফাঁদে পা দেবার। আবার ভাবে সে যা ভাবছে তা নাও হতে পারে।

কিন্তু কে এই রুণাবাঈ। তার কাছে কি প্রয়োজন তাদের। জীবনে রুণাবাঈ বলে কাউকে চেনেও না। তবে? মনে কৌতূহল জাগে মালশ্রীর।

যাবেন? জিজ্ঞাসা করে যুবকটি।

যদি না যাই?

যুবকটির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় মালশ্রী।

সেই কথাই গিয়ে জানাবো তাহলে।

নিরাশ হয় মালশ্রী। বিশ্বাস আসে যুবকটির ওপর।

বলে, চলো।

আসুন।

এগিয়ে চলে যুবকটি। যুবকটিকে অনুসরণ করে মালশ্রী আর মল্ল। অনেকগুলি পথ পার হয়ে একটি জীর্ণ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় যুবকটি। দ্বারের কড়া নাড়ে।

দ্বার খুলে যায়। প্রদীপ হাতে এগিয়ে আসে একটি তরুণী।

সাহিরা, বহিন! বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠতে যায় মালশ্রী।

চুপ।

কিন্তু…।

ভিতরে আসুন। বাদশাহী চর চারিদিকে।

ভিতরে প্রবেশ করে সকলে। দ্বার বন্ধ হয়ে যায়।

আচ্ছা…।

কথা বলে মালশ্রী।

বলুন।

রুণাবাঈ কে?

আমি।

তুমি?

হ্যাঁ।

আর ওই যুবকটি যে আমাদের নিয়ে এলো ?

সূর্যপ্রসাদের দিকে ফেরে মালশ্রী। কিন্তু কেউ নেই। সকলের অজান্তে সূর্যপ্রসাদ যে কখন সরে গেছে জানতে পারে নি। আশ্চর্য হয় মালশ্রী।

আসুন তন্নজী। ডাকে সাহিরা।

চলো।

তখন মধ্য রাত্রি।

॥ বত্রিশ ॥

মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠেন শিবাজী।

নিজের ভুল বুঝতে পারেন। মহাভুল করেছেন তিনি। মহারাজ জয়সিংহের কথায় বিশ্বাস করে দিল্লীতে এসে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছেন তিনি।

না দোষ হয়তো মহারাজ জয়সিংহের নয়। চতুর বাদশাহ যে এমন ভাবে চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছেন তিনি জানবেন কেমন করে। তাছাড়া তাঁর নিজের দোষও কম নয়। পাঁচ হাজারী মনসবদারের সম্মান তিনি সহ্য করতে পারেন নি। প্রকাশ্য সভার মাঝেই বাদশাহ আলমগীরকে তিনি কটূক্তি করেছিলেন। সেই সুযোগে বাদশাহ তাঁকে কিছু দিনের মতো আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য করিয়েছেন। কিন্তু তিনি এখানে বন্দী হয়ে থাকার সুযোগে আওরঙজেব যদি তাঁর অনুচরদের ক্ষতি করেন। সম্ভব ! আওরঙজেবের অসাধ্য কিছু নেই। রামসিংহের সঙ্গে সেই পরামর্শ করেন শিবাজী। বিনীত ভাবে অনুচরদের দেশে ফিরে যাবার আদেশ প্রার্থনা করেন। সম্মত হন আওরঙজেব। একদিন স্বদেশে ফিরে যায় শিবাজীর অনুচরেরা। বালক শম্ভূজী আর শিবাজী শুধু থাকেন দিল্লীতে। তাঁরা কোনদিন দেশে ফিরতে পারবেন কি না একমাত্র আওরঙজেবই জানেন।

একদিন সবিস্ময়ে শিবাজী লক্ষ্য করেন কদিন রামসিংহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন না। কারণ অনুসন্ধান করেন কিন্তু কিছুই জানতে পারেন না চিন্তিত হন। বুঝতে কিছুই বাকী থাকে না, বাদশাহ নিশ্চই সাক্ষাৎ বন্ধ করবার আদেশ জানিয়েছেন তাই নিরুপায় রামসিংহ বাধ্য হয়েছেন সাক্ষাৎ বন্ধ করতে।

কি যে করবেন কিছুই স্থির করতে পারেন না শিবাজী। পিতার চিন্তিত মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে বালক শম্ভুজী। পিতার এই অসহায় অবস্থা বালকের মনে রেখাপাত করে। গম্ভীর বালক তাই সারাদিন একা একা প্রাসাদে ঘোরে। ভয় পান শিবাজী। কাছ ছাড়া করে না পুত্রকে।

এমনিভাবে পক্ষকাল গত হয়। পুত্রকে নিয়ে একাকী দিন কাটে শিবাজীর। দিনরাত্রি চুপ করে বসে মুক্তির উপায় চিন্তা করেন।

সেদিন রাত্রে বাতায়নের পাশে একাকী চুপ করে বসেছিলেন শিবাজী। পুত্র শয্যায় গভীর ঘুমে অচেতন।

নিদ্রাহীন চোখে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের অদৃষ্টের কথাই চিন্তা করছিলেন শিবাজী। সুপ্ত দিল্লী নগরী। শিবাজীর প্রহরারত প্রহরীরাও বুঝি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। অনেকক্ষণ হ'ল তাদের সদম্ভ পদচারণা থেমে গেছে।

এক সময় বাইরে বাতায়নের পাশে মৃদু খস্ খস্ শব্দ শোনা যায়। তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শিবাজীর শ্রবণেন্দ্রিয়। বাইরে অন্ধকারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। উঠে বাতায়নের পাশে যান, থেমে যায় সেই শব্দ। না কেউ না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শুধু জমাট বেঁধে আছে। মনের ভুল ভেবে নিদ্রিত পুত্রের পাশে এসে বসেন।

রাত্রি গভীর হয়।একসময় শোনা যায় আবার সেই শব্দ। কোন সাড়া নেই। শব্দ থেমে গেছে।

মহারাজ। মৃদু স্বরে কে যেন ডাকে।

কে ? চিৎকার করে উঠতে যান শিবাজী।

চুপ।

অন্ধকারে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে   শিবাজীর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

মহারাজ।

কে তুমি ?

আপনার বন্ধু।

বন্ধু !

হ্যাঁ মহারাজ।

কিন্তু···।

আমাকে আপনি চিনবেন না; আপনার অনুচররাই আমাকে পাঠিয়েছেন।

আমার অনুচর।

হ্যাঁ মহারাজ। শুনুন আপনার মুক্তির উপায় আমরা স্থির করেছি। যে কোন উপায়েই আপনাকে মুক্ত করা হবে। তার জন্যে আপনাকে···।

বাতায়নের পাশ থেকে অনেক কথাই ভেসে আসে। স্বপ্নাবিষ্টের মতো শোনেন শিবাজী। মনে হয় তিনি যেন জেগে স্বপ্ন দেখছেন।

মহারাজ। একসময় কণ্ঠস্বর থামে।

এ্যাঁ।

এবার আমি যাই। যা বলে গেলুম তাই করবেন।

আপনি আর···

প্রয়োজন মতো আমি আসবো। আগামী অমাবস্যার রাত্রে জেগে থাকবেন।

কিন্তু···

চুপ।

প্রহরীর সাড়া পাওয়া যায়। সে এই ধারেই এগিয়ে আসছে।

কেঁপে ওঠে শিবাজীর বুক। আর বুঝি রক্ষা নেই।

শুনছেন।

কোন সাড়া নেই।

সাবধান প্রহরী আসছে।

এবারও কোন সাড়া নেই। আগন্তুকের কালো ছায়াটা কখন বাতায়নের পাশ থেকে মিলিয়ে গেছে।

॥ তেত্রিশ ॥

দুরন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে মেহেরুন্নিসা।

আল্লা একি করলে তুমি? একি হ'ল। একদিন যা ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। সন্ধির সুযোগে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধল না বাদশাহ আলমগীরের। ভাবতে পারে না মেহেরুন্নিসা। আকাশ মাটি, আলো অন্ধকার সব একাকার হয়ে যায়। দুরন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে মেহেরুন্নিসা।

বৃদ্ধ সাজাহান বুকের মাঝে টেনে নেন সর্বহারা রিক্ত মেয়েটাকে। সান্ত্বনা দিতে পারেন না। কি করে মেয়েটার চোখের অশ্রু বন্ধ করবেন ভেবে পান না। বৃদ্ধের চোখ দুটিও তাই ব্যথার অশ্রুতে ভরে ওঠে।

পিতামহ। রুদ্ধ কণ্ঠে একসময় ডাকে মেহেরুন্নিসা।

এঁ্যা।

একি হ'ল পিতামহ?

আমিও তাই ভাবছি। একি করল পুত্র। একবারের জন্যেও চিন্তা করে দেখল না কি কলঙ্কের কালিমা লিপ্ত করতে যাচ্ছে তার নামের সঙ্গে। সত্যি এর থেকে লজ্জার আর কিছু নেই। আওরঙজেবকে নিজের পুত্র বলে ভাবতে আজ আমার ঘৃণা হচ্ছে।

তাহলে…

আমি কিছু ভাবতে পারছি না, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিস নি। আমি বুঝি পাগল হয়ে যাবো। আল্লাকে ডাক। চুপ করেন সাজাহান। দূরে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে বেদনার অশ্রু ফেলেন।

একসময় উঠে নিজের কক্ষে চলে আসে মেহেরুন্নিসা। বসে থাকে চুপ করে। একাকিনী দিন কাটে।

গত হয় মাস। সংবাদ আসে শিবাজী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ব্যাকুল হয়ে ওঠে মেহেরুন্নিসা। ইচ্ছে হয় এই মুহূর্তে ছুটে যায় তাঁর পাশে। নিজের হাতে অনেকদিন আগের একদিনের মতো আবার সেবা করে। কিন্তু আজ মেহেরুন্নিসার সে সাধ্য নেই। মেহেরুন্নিসা আজ বন্দিনী।

মেহেরুন্নিসা আজ তাই কাঁদে। রাত্রির অন্ধকারে একাকিনী শয্যায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কেউ দেখে না। কেউ রাখে না সে সংবাদ। মেহেরুন্নিসার নীরব কান্না রাত্রির অন্ধকারে গোপনই থাকে।

সেইদিন। তখন গোধূলী। আকাশের গা বেয়ে সোনা ঝরা রৌদ্রটা অলক্তরাগে রাঙা হয়ে নেমে এসেছে মাটির পৃথিবীতে। কুলায় ফেরা পাখীদের কাকলিধ্বনিতে বাতাস মুখর। সন্ধ্যার স্বপ্ন বুকে নিয়ে থর থর করে কাঁপছে যমুনার শান্ত জল।

আগ্রা দুর্গপ্রাসাদের পশ্চিম দ্বারে এসে দাঁড়ায় একটি হাবসী তরুণী। স্বাস্থ্যবতী। অনাবৃত কালো মুখে সুন্দর একজোড়া পদ্মকলির মতো চোখ।

প্রহরারত প্রহরী সবেমাত্র ভাঙ্‌ খেয়ে নিদ্রার উপক্রম করছিল, সজাগ হয়ে ওঠে সে।

তরুণী দ্বারের দিকে এগিয়ে আসে।

এই ঠ্যারো। দাঁড়াতে বলে প্রহরী। দাঁড়ায় তরুণী।

যাবে কোথা ?

দেখতে পাচ্ছ না।

তা তো পাচ্ছি।

তবে ?

হাসে তরুণী। মুগ্ধ হয় প্রহরী। দুই চোখ তার চিক চিক করে ওঠে।

ওই কালো কালো মুখে এতো সুন্দর হাসি। হাসি তো নয় যেন মুক্ত ঝরে পড়ল।
এই সুযোগে তরুণীটি দ্বার পার হয়ে ভেতরে ঢোকে।
এই—এই শোন। তরুণীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় প্রহরী।
কি বলবে বল। দেরী করিয়ে দিলে মুস্কিলে পড়বে।
কেন ?
পরে বুঝবে।
কি করে ?
বাদশাহ বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সত্য কথাই বলবো।
কি যা তা বকছ! বাদশাহ কে ?
কেন বাদশাহ আলমগীরের নাম শোন নি ?
শুনবো না কেন।
দেখনি তাঁকে ?
দূর থেকে দেখছি।
আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আশনাই করলে কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য ঘটতে দেরী হবে না।
তুমি তাহলে···
এতক্ষণে বুঝেছ দেখছি।

আবার কি হ'ল ?
বিনা অনুমতিতে কেমন করে প্রবেশ করবে ?
যেমন করে করছি।

ভাবলে কিছু হবে না। কাজ সেরে এখুনি দিল্লীতে বাদশাহের কাছে ছুটতে হবে।
কি কাজ ?
বলতে নিষেধ আছে। চলি কেমন ?
আর অপেক্ষা করে না তরুণী। মিষ্টি হেসে ভিতরে প্রবেশ করে।

অবাক হয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরীটি। ভাবে, খবরটা জানায় আর সকলকে। কিন্তু কি দরকার মিছিমিছি ঝামেলা বাড়িয়ে। খামাকা নেশাটা মাটি করে লাভ কি। বিচিত্র চরিত্র বাদশাহের এ হয়তো কোন শয়তানী খেলা খেলতে এসেছে। মরুকগে।
নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ে প্রহরীটি।
ভেতরে প্রবেশ করে বিপদে পড়ে তরুণী। গোপন পথে প্রবেশ করলেও ভেতরে পাহারার কমতি নেই। বাদশাহ আলমগীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগ্রা দুর্গ প্রাসাদের চারিধারে পাহারা বসিয়েছেন। এর কারণও অবশ্য আছে। বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহানকে মুক্ত করবার চেষ্টা হয়েছে বার কয়েক; তাই এই ব্যবস্থা। আজ সে ভয় নেই। বাদশাহ আলমগীরের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো দিল্লী, আগ্রাতে আজ আর কেউ নেই।
অনেক কষ্টে, অনেক কৌশলে একসময় নিজের লক্ষ্যে পৌঁছায় তরুণী। তখন ঘন কালো অন্ধকারে ভরে গেছে দশদিক।
মেহেরুন্নিসা নিজের কক্ষে বসেছিল চুপ করে। বসে বসে ভাবছিল তার অদৃষ্টের কথা। ইচ্ছে করলে কি না সম্ভব ছিল একদিন তার পক্ষে কিন্তু আজ, না আজ শুধু সে আছে আর আগামী দিনের অন্ধকার নিষ্ঠুর ভবিষ্যৎ।
স্বইচ্ছায় মুক্তি তাকে পিতা কোনদিনই দেবেন না। যদি পিতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে কোনদিন মুক্তি প্রার্থনা করে তাহলে হয়তো জীবনে মুক্তির আলো দেখতে পাবে কিন্তু তা কোনদিন পারবে না মেহেরুন্নিসা। পিতার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করে সব কিছু নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারবে না সে। এর জন্যে পিতা যদি তাকে সারাজীবন বন্দিনী করে রাখে তাই সে থাকবে।
পাশে মৃদু শব্দে চিন্তাজাল ছিন্ন হয় মেহেরুন্নিসার। দণ্ডায়মান হাবসী তরুণীটির দিকে চেয়ে অবাক হয়।
কে তুমি?
আমাকে চিনতে পারছেন না?

তরুণীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে মেহেরুন্নিসা। চেনা চেনা মনে হয়। তবু চিনতে পারে না।

চিনতে পারলেন না ?

না।

তরুণী একটুক্ষণ মেহেরুন্নিসাকে দেখে। তারপর বক্ষ বন্ধনীর ভিতর থেকে একখানি লিপি বার করে হাতে দেয়।

এটা কি ? জিজ্ঞাসা করে মেহেরুন্নিসা।

অবসর সময়ে পড়ে দেখবেন। আমি চলি।

কিন্তু তুমি কে কেনই বা···

সব জানতে পারবেন ওটি পাঠ করলে। বাধা দিয়ে বলে তরুণী। আর আমার পরিচয়—কখনো যদি দিন আসে তখন জানবেন।

আমি এবার চিনেছি তুমি—তুমি···

হ্যাঁ শাহাজাদী আমিই সেই। চলি। আদাব।

আর দাঁড়ায় না তরুণী। দ্রুত অথচ নিঃশব্দে চলে আসে মেহেরুন্নিসাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে।

প্রহরীটি জিজ্ঞাসা করে, কাজ মিটল বিবি ?

মিটল আর কই।

কেন, কেন ?

বাদশাহের মর্জি হলে আবার আসতে হবে। তা খাঁ সাহেব আমার কথা কাউকে বল নি তো।

না।

বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ। কাউকে জানালে বিপদে পড়বে।

কি বিপদ ?

তা বাদশাহ জানেন। আর আজকের তোমার কাজের পুরস্কার এই নাও।

এ যে মোহর !

হ্যাঁ বাদশাহ আমাকে ছুটো দিয়েছেন। এবার থেকে ভাগাভাগি ···বুঝলে তো ?

আমি রাজি।

বেশ, বেশ। আদাব খাঁ সাহেব।

আর দাঁড়ায় না তরুণী, কালো অন্ধকারে তার কালো বোরখা ঢাকা দেহটি অদৃশ্য হয়।

মোহর হাতে দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরীটি।

ভাবে, আবার কবে আসবে বলে গেল না তো বিবি।

॥ চৌত্রিশ ॥

আজ কেউ নেই।

যে ছিল সে চলে গেছে। বুঝি দুরন্ত ঘৃণায় ভরিয়ে গেছে তার সেই সুন্দর সরল মনটাকে।

আজ দুঃখ হয়। ভাবেন, কি এমন প্রয়োজন ছিল অমন রূঢ় আঘাত হানবার। অন্যায়! হ্যাঁ অন্যায় করেছেন তিনি। নিজের সার্থসিদ্ধির জন্যে মসনদে বসবার আগে থেকে সারাজীবনে যে পাপ তিনি করেছেন তার বহুগুণ অপরাধ তিনি করেছেন। একটি সরল নিষ্পাপ হৃদয়ে স্পষ্ট করে এঁকে দিয়েছেন শয়তানী মূর্তিটা। তীক্ষ্ন ঘৃণায় মনটা ভরিয়ে নিয়ে বহু দুঃখে আজ তাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। ভাবেন আওরঙজেব। সারা হিন্দুস্থানের মালিক বাদশাহ আলমগীর নন—দীন রিক্ত সর্বহারা আওরঙজেব।

গোসলখানার শূন্য কক্ষে অস্থির পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াবার সামর্থ টুকুও তিনি যেন আজ হারিয়ে ফেলেছেন। হারিয়ে ফেলেছেন তীক্ষ্ন তীব্র আক্রোশে প্রতিশোধ নেবার শক্তি। রিক্ততার হাহাকারে বুক ভরে ওঠে আজ তাই। বারবার মনে পড়ে সরল বৃদ্ধ গোলাম খাঁকে।

গোলাম খাঁ আজ কোথায়—কতদূরে কে জানে। কদিন আগে রাতের আঁধারে কাউকে না জানিয়ে নিঃশব্দে সেই যে চলে গেছে আর ফেরে নি। যারা যেতে দেখেছে তারা বলে নিঃসম্বল গোলাম

খাঁ একাকী যমুনা পার হয়ে পথে নেমেছে।

না অনুসন্ধানের কোন ব্যবস্থাই তিনি করেন নি। যে গেছে যাক। যে যাবার তাকে শত চেষ্টাতেও তিনি বাঁধতে পারবেন না। তাঁর জীবন-ভরই তিনি দেখে আসছেন। কেউ থাকবে না কেউ থাকছে না। যারা তাঁর আপন ছিল ; প্রিয় ছিল তারাও দূরে সরে যাচ্ছে দিনে দিনে। অবিশ্বাস! হয়তো তাই। সবাই তাই বলে। মুখে প্রকাশ না করলেও অন্তরে ভাবে সকলে। অবিশ্বাসী মন তাঁর—জগতের কিছুই তিনি বিশ্বাস করেন না।

ধর্ম।

হ্যাঁ জগতে একমাত্র বিশ্বাসের বস্তু ধর্ম। একমাত্র ধর্মকেই তিনি বিশ্বাস করেন। তাঁর নিজের ধর্মই তাঁকে বারবার রক্ষা করে এসেছে। ধর্মই বিশ্বাস এনেছে, অবিশ্বাসও এনেছে। পিতাকে বন্দী করেছেন, ভাইয়েদের করেছেন হত্যা। ভগ্নী জাহানারাকে কৌশলে সরিয়ে দিয়েছেন দূরে। সকলে জানে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী পিতার শুশ্রূষা করছেন। আর···

সচ্চরিত্র উপযুক্ত পুত্র মহম্মদকে বন্দী করেছেন। তাঁর ধর্ম বলেছে পুত্রের একমাত্র দোষ তার হৃদয়। সে হৃদয় অপরের ব্যথা বেদনায় ব্যথিত হয়। ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনে হয় উন্মুখ কিন্তু কর্তব্য পালনে সে কঠিন কঠোর। অহেতুক লোভ তার নেই কিন্তু হিংসাকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে।

এক কন্যাকে রেখেছেন দূরে সরিয়ে। আর এক কন্যাকে করেছেন বন্দিনী। কিন্তু সকলে জানে শারীরিক কারণে কন্যা তাঁর দূরে আছে। দূরে না রাখলে উপায় ছিল না। হিসাবের ভুলে অনেক ক্ষতি হ'তে পারতো। কন্যা তাঁর মর্মে মর্মে বুঝুক পিতা তার যত স্নেহ করেন অবাধ্যতায় ততই কঠোর হয়ে শাসনও করতে পারেন।

আর এক পুত্রকে এবার কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করাবেন। পাঠাবেন জয়সিংহ নিধনে। তাঁর আদেশ তিনি জানিয়েছেন। গোপনে কার্য সিদ্ধির জন্যে দুই একদিনের মধ্যেই বিজাপুর যাত্রা করবে সে।

তারপর…

না জীবনে সুযোগ তিনি দেবেন না। তাহলেই পুত্ররা সুযোগ পেয়ে গলা টিপে ধরবে। বুদ্ধির খেলায় যে জয়ী হতে পারবে সেই বসবে মসনদে। সুযোগ দিলেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

সব বিশ্বাসঘাতক। সব বেইমান। সব ঝুটা। সাচ্চা কেউ নেই। কেউ নেই জগতে। গোলাম খাঁও ঝুটা ছিল।

বুড়ো বুদ্ধু ভেবেছিল সহজে কিস্তিমাৎ করবে। না পেরে পালিয়ে গেল। বেশ করেছে। পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছে বুড়ো। না হলে নিজের অজান্তে কোন্ দিন মরণ ফাঁদে পা দিত যা থেকে নিস্তার পেত না কোনদিন।

কেউ নিস্তার পায় নি। কেউ পাবে না। শিবাজীও।

নীরাও তাই ভাবে।

বুঝি শিবাজী মুক্তি পাবেন না জীবনে। নিষ্ঠুর আওরঙজেবের শয়তানীর সাজা বুকে নিয়ে চিরতরে জগতের আলো বাতাসের বুক থেকে মুছে যাবেন তিনি।

কিন্তু বালক শম্ভুজী? বাদশাহ আওরঙজেবের কাছে কি অপরাধ করেছে সেই অবোধ শিশু? কি জানে সে সংসারের? যাকে বন্দী করে রাখতে এতটুকু বাধে নি আওরঙজেবের। ভাবে নীরাবাঈ। স্বদেশ প্রত্যাগত শিবাজীর অনুচরদের কাছে সংবাদ শুনে এই কথা ই প্রথম মনে হয়েছিল নীরার।

কাঁদে নি নীরা। কাঁদতে পারে নি। অস্থির হয়ে উঠেছিল মনে মনে। কি স্থির করলেন আপনারা? প্রশ্ন করেছিল নীরাবাঈ।

সকলেই নতমুখে নীরব ছিল।

এ অন্যায়। এই শয়তানীর যোগ্য উত্তর দিতে হবে? গর্জে উঠেছিল মারাঠা তরুণী। চোখে ঝরেছিল আগুনের ফুলকি।

কেমন করে?

তরবারির মুখে। অত্যাচারী আওরঙজেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে

শিবাজীকে বন্দী করে রাখলেও মহারাষ্ট্র বীরশূন্য নয়।
চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সমবেত অনুচর। হ্যাঁ, অন্যায়ের যোগ্য উত্তর দানের এই একমাত্র পথ।
দিল্লী চলো—চলো দিল্লী।
গোপনে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সংবাদ। অসির ঝন্ ঝনায় ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠেছিল মহারাষ্ট্রের বাতাস। মারাঠা ক্ষেপেছে। প্রস্তুতি চলছে দিল্লী যাত্রার। নেত্রী মারাঠা তরুণী নীরাবাঈ।

অসুস্থ মহারাজ জয়সিংহ এই সংবাদ পেয়েছেন একদিন। আশায় আনন্দে অশ্রু সজল হয়ে উঠেছিল বৃদ্ধের দুই চোখ।
আর ভয় নেই। আর কেউ পারবে না মারাঠার গতি রোধ করতে। দিন আগত ঐ। মারাঠার সৌভাগ্য সূর্য উদয়ের পথে।
মেহেরুন্নিসাও তাই ভাবে। অমানিশার কালো অন্ধকার বুঝি তার জীবনের পট হতে এবার সরে যাবে।
সে মরেছে বলে জেনেছিল আজ এই দুঃখের দিনে সে-ই নিয়ে এলো আশার আলো—আনন্দের বারতা। প্রিয় মিলনের লগ্ন সমাগত।
সাহিরা!
সে মরে নি। সে আছে। দিয়ে গেছে মেহেরুন্নিসার মনে নতুন প্রেরণা।
বহুদিন পরে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় নিদ্রা যায় মেহেরুন্নিসা।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

সূর্যপ্রসাদ আর মালশ্রী নেই।
ভোরের আলো ফোটবার আগেই তারা বেরিয়ে গেছে। কখন যে ফিরবে তা বুঝি তারাও জানে না। মল্ল চলেছে মহারাষ্ট্রের পথে।
শিবাজী আরোগ্য লাভ করেছেন। নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের গৃহে তিনি মিষ্টান্ন পাঠাচ্ছেন।

বাদশাহ এ ব্যাপারে কোন বাধা দেন নি। ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মৃত্যুপথযাত্রীর ইচ্ছা পূরণের। তাছাড়া মাত্র কদিন পরেই বাদশাহের জন্মদিনের উৎসব। আনন্দোৎসব তিনি অপছন্দ করলেও বাধ্য হন যোগ দিতে।

ক্রমে দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা হয়। রাত্রি নামে এক সময়।

মালশ্রী আর সূর্যপ্রসাদ ফেরে না।

বসে থাকে সাহিরা। ভাবে তার অদৃষ্টের কথা।

আল্লার কি অবিচার। জন্ম থেকে এতদিন জীবনের এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছে। জীবনে শান্তি কি বস্তু জানল না। মাতৃহারা সাহিরা মা বলে ডাকবার সুযোগটুকুও পেল না জীবনে। নিষ্ঠুর নিয়তি সব কেড়ে নিল তার। আর···

না তার বুঝি সুযোগ মিলবে না। প্রতিহিংসার যে আগুন তার বুকে দিবানিশি জ্বলছে তা বুঝি চিরকালই জ্বলবে। যে ঝড়ের সূচনা দেখা দিয়েছে তার পরিণতি আল্লাই জানেন। সেই নিষ্ঠুর শয়তান আর আসবে কি না কে জানে। যদি কোনদিন আসে···

বেটী। বাতাসী এসে কাছে দাঁড়ায়।

কি?

শাহজাদা এসেছেন।

কে এসেছে? নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না সাহিরা তাই আবার প্রশ্ন করে।

শাহজাদা এসেছেন? একা।

একা!

হ্যাঁ।

তুই চল, যাচ্ছি।

চঞ্চল হয়ে ওঠে সাহিরা। শাহজাদা আকবর এসেছে। নিষ্ঠুর শয়তান। আর বিলম্ব করে না সাহিরা। নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে শাহজাদা যে কক্ষে অপেক্ষা করছিল সেখানে প্রবেশ করে।

বন্দেগী শাহজাদা, কসুর মাপ করবেন।

কসুর ?

হাসি মুখে রুণাবাঈয়ের মুখের দিকে তাকায় আকবর। মুগ্ধ হয়। এত সুন্দর রুণাবাঈ! এত রূপ তো এতদিন নজরে পড়ে নি। যাবার বেলায় একি মূর্তি ধরে রুণাবাঈ এগিয়ে এল!

শাহজাদা। ডাকে সাহিরা।

এ্যাঁ।

দিল্ কি ভাল নেই ?

না পিয়ারী।

তবে ?

গম্ভীর হয় আকবর। চিন্তিত হয়।

শাহজাদা। পাশে বসে পড়ে সাহিরা।

আমি চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

বিজাপুর।

কেন ?

পিতা পাঠাচ্ছেন।

কি এমন প্রয়োজন। না শাহজাদা আপনি থাকুন। আপনি গেলে আমার নাচ ঘর শূন্য হয়ে যাবে।

তা হয় না পিয়ারী।

কেন হয় না ?

পিতার আদেশ অমান্য করার সাধ্য আমার নেই। তার থেকে এক কাজ কর না পিয়ারী।

কি ?

আমার প্রাসাদে তুমি গেলে না, যদি অনুমতি কর তা হলে…

সঙ্গে যাবার কথা বলছেন ?

হ্যাঁ। যাবে ?

কিন্তু…

কোন কিন্তু নয় পিয়ারী। তুমি চল আমার সঙ্গে। আমার পাশে পাশে, আমার কাছে কাছে আমার বুকের মাঝে থাকবে তুমি। বৃদ্ধ পিতা দুদিন পরেই চোখ বুজবেন। আমি, হ্যাঁ আমিই হবো সারা হিন্দুস্থানের বাদশা। তুমি হবে আমার প্রধানা বেগম। নূরজাহান, মমতাজের থেকেও আমি তোমাকে বেশি পেয়ার করবো। তোমাকে আমি আমার বুকের মাঝে রেখে দেব।

উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে আকবর। বুকের মাঝে টেনে নিতে যায় সাহিরাকে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে সাহিরা। শাহজাদা।

এ্যাঁ। একটু যেন চমকে ওঠে আকবর।

বড় ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন শাহজাদা।

কেন পিয়ারী। আমি…

থামো। বড় বোকা তুমি।

বোকা!

হ্যাঁ তাই। তাই তুমি এমন ভাবে অন্ধের মতো এগিয়ে এসেছো। মূর্খ শয়তান।

কসবী। সোজা হয়ে ওঠে আকবর।

লাফালে কোন কাজ হবে না শাহজাদা, আমাকে চিনতে পারলে না?

কে তুমি!

ভাল করে দেখ তো চিনতে পার কি না?

চিনতে পারে না শাহজাদা। এখনও শাহজাদার চোখে রুণাবাঈকে বড় সুন্দর মনে হয়।

কি পারলে না?

না।

এই দেখ; চিনতে পারছো। তোমার নখরাঘাতের চিহ্ন এখনও এখানে আঁকা আছে। পশুর মতো একদিন তুমিই একটি অনাগত যৌবনা কিশোরীর বক্ষস্থল তোমার কামনা চরিতার্থ করার জন্যে ক্ষত বিক্ষত

করে দিয়েছিলে। যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করেছিল সে। তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল। কিন্তু তুমি সেদিন এতটুকু করুণা কর নি। মনে পড়ে সেদিনের কথা?

বলতে বলতে নিজের বক্ষস্থল অনাবৃত করে সাহিরা। সারা বক্ষে অজস্র ক্ষত চিহ্ন।

তুমি—তুমিই…

হ্যাঁ, আমিই সেই। আজ ক'বছর তোমার সন্ধানে ফিরছি। কেন জান?

কেন?

সেদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব বলে। আল্লার নাম স্মরণ কর শাহজাদা আকবর।

উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে আকবরের দিকে এগিয়ে যায় সাহিরা।

আত্মরক্ষার জন্যে নিজের তরবারি খোঁজে আকবর। পায় না। কখন যে সাহিরা সরিয়ে নিয়েছে জানতে পারে নি।

আত্মরক্ষার বুঝি আর কোন উপায়ই নেই। তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে কাছে এগিয়ে আসছে এক উন্মাদিনী। ভয়ে চোখ বোজে আকবর।

পিছন থেকে বজ্রমুষ্টিতে কে যেন চেপে ধরে সাহিরার হাত। ঘুরে দাঁড়ায় সাহিরা। তবলচি সূর্যপ্রসাদ। চোখে তার আগুন ঝরে।

ছেড়ে দাও। তীক্ষ্ণ হয় সাহিরার কণ্ঠ।

না।

কণ্ঠস্বরে কেঁপে ওঠে সাহিরা। হাতের মুঠি শিথিল হয়। কঠিন কঠোর এক পুরুষ মূর্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় সাহিরা।

শাহজাদা। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকে সূর্য।

এ্যাঁ। যেন পুনর্জন্মলাভ করে জেগে ওঠে আকবর।

যান।

দ্বারের দিকে হাত দেখায় সূর্য। নীরবে নত শিরে দ্বারের দিকে এগিয়ে যায় বাদশাহ আলমগীর পুত্র শাহজাদা আকবর। পা টলে। নেশায় না পরাজয়ের গ্লানিতে বুঝতে পারে না।

শুনুন। ডাকে সূর্যপ্রসাদ। দাঁড়িয়ে পড়ে আকবর। কেঁপে ওঠে বুক। কাছে এগিয়ে যায় সূর্যপ্রসাদ। বলে, আমি না হলে আজ আপনাকে কেউ রক্ষা করতে পারতো না। আশা করি এই কথা স্মরণ রেখে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন না। আর…

নীরবে সূর্যের মুখের দিকে তাকায় আকবর।

বাদশাহ আলমগীরের মসনদের আপনিই ভবিষ্যৎ অধিকারী। আপনিই একদিন সারা হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হবেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করি শাহজাদা এই কি ভাবী বাদশাহের পরিচয়? মোগল বংশের রক্তধারার এতটুকু ব্যতিক্রম কি আপনার কাছে আশা করা অন্যায়? নীরব শাহজাদা আকবর।

আমি একজন সামান্য তবলচি। বাদশাহ আলমগীর পুত্র শাহজাদা আকবরকে উপদেশ দেওয়ার অধিকার আমার নেই তবু আপনার কাছে একটি অনুরোধ করছি সৎ হোন, সৎ পথে চলুন; শাহজাদার গৌরবময় জীবনকে এমন ঘৃণ্যভাবে কলঙ্কিত করবেন না।

স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে আকবর। কথা বলে না। বাহিরে রাত্রি বাড়ে।

চলুন শাহজাদা।

শাহজাদা আকবরকে বিদায় দেয় সূর্য। নীরবে শিবিকায় আরোহন করে আকবর।

আবার ফিরে আসে সূর্য। দেখে সাহিরা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সাহিরা। কাছে এসে ডাকে সূর্য। সূর্যের মুখের দিকে তাকায় সাহিরা।

ক্লান্ত তুমি বিশ্রাম কর গে যাও। এ সময় এমন ছেলেমানুষী করা তোমার উচিৎ হয় নি।

কেন?

শিবাজী এখনও বন্দী হয়ে আছেন। এ সময় শাহজাদাকে হত্যা করলে তাকে মুক্ত করার সমস্ত আয়োজনই আমাদের ব্যর্থ হ'ত।

তুমি জানো কেন আমি শাহজাদাকে হত্যা করতে গিয়েছিলুম?

না।

তবে ?

আমি কিছুই জানতে চাই না। শাহাজাদীর দ্বারা যত বড় ক্ষতিই তোমার জীবনে হোক না কেন তবু বলছি তুমি যা করতে গিয়েছিলে নারীর তা শোভা পায় না।

তুমি জান না সূর্যও আমার কত ক্ষতি করেছে। আমার এ জীবনের মূলে ও। ওই আমার জীবনকে বিষের জ্বালায় ভরিয়ে দিয়েছে। আমাকে...

কথা শেষ করতে পারে না সাহিরা। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

তবু বলছি তুমি নারী ও মনোবৃত্তি তোমার সাজে না। তোমার যা ভবিতব্য ছিল তাই ঘটেছে; শাহজাদা উপলক্ষ মাত্র। তাই বলে তুমি নারী হয়ে তোমার কোমল অন্তর হিংসায় ভরিয়ে তুলো না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার মনের সমস্ত ব্যথা বেদনার গ্লানি ধুয়ে মুছে শান্তির অমৃত ধারায় ভরিয়ে দিন।

আর দাঁড়ায় না সূর্য কক্ষ ছেড়ে বাইরে রাস্তায় নামে। অন্ধকার পথ ধরে এগিয়ে চলে। মালশ্রী তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও। সূর্য চলে যাবার পরও সাহিরা কাঁদে। আকুল কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে তার সারা শরীর। বুঝি অশ্রু ধারায় তার মনের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়।

॥ ছত্রিশ ॥

বাদশাহ আওরঙজেবের জন্মদিন।

সমস্ত নগরী নব সজ্জায় সেজেছে। আনন্দ কোলাহলে বাতাস মুখর। হারেমে বসেছে মেলা। সম্ভ্রান্ত নাগরিক আমীর ও ওমরাহদের স্ত্রী-কন্যারা নিজ নিজ পণ্য সাজিয়ে বসেছেন। ক্রেতা বাদশাহ আলমগীর ও হারেমের নারীরা। বাদশাহ ব্যতীত অন্য পুরুষের বেলায় প্রবেশ নিষেধ।

সুন্দরী পসারিণীরা বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে নিজ নিজ পণ্য বিক্রি করবেন বাদশাহকে রঙ তামাসার ছলে। কঠিন কঠোর স্বার্থপর বাদশাহ এই একটি দিনের কিছু সময়ের জন্যে হয়ে উঠবেন রঙ্গপ্রিয়। পসারিণীদের সঙ্গে নানা কৌতুকে তিনিও মেতে উঠবেন।

সাজাহান নিজ রাজত্বকালে জন্মদিন উপলক্ষে এই মেলার সূচনা করেন। আওরঙজেব মসনদে বসে এই প্রহসন বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বেগমদের অনুরোধে তা করা সম্ভব হয় নি তার পক্ষে। তাই বাধ্য হয়ে মাত্র একদিন এই উৎসবে যোগ দেন।

তখন সন্ধ্যা হতে সামান্য দেরী আছে। আওরঙজেব মেলায় ঘুরছিলেন। সুন্দরী পসারিণীরা নিজ নিজ পণ্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলেন কিন্তু চিন্তাজালে আচ্ছন্ন বাদশাহের মন। অস্থির চিত্ত তিনি কোন দিকেই দৃষ্টি দিতে পারছিলেন না।

শাহজাদা আকবর বিজাপুর যাত্রা করেছে। অযোগ্য পুত্র চতুর জয়সিংহকে বিনাশ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। অসুস্থ শিবাজী সুস্থ হয়ে উঠে মিষ্টান্ন ভেট পাঠাচ্ছে নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের; কি উদ্দেশ্য যে এর মাঝে নিহিত আছে কে জানে! তব তিনি নিষেধ করতে পারেন নি। দুদিন বাদে যার অস্তিত্ব থাকবে না মনের ইচ্ছা পূরণ করে নিক সে।

এক দল সুন্দরী এসে বাদশাহকে ধরে।

নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন বাদশাহ। পারেন না।

বাহকরা মিষ্টান্নের ঝুড়ি নিয়ে শিবাজীর প্রাসাদ পথে বেরিয়ে আসে।

দ্বার রক্ষী বাধা দেয় দ্বারে।

কি আছে এতে?

লাড্ডু। উত্তর দেয় বাহকদের একজন।

দেখবো।

ঝুড়ির মুখ খোলা হয়। মিষ্টান্নের রূপ দেখে রক্ষীর দুই চোখ উজ্জ্বল

হয়ে ওঠে।

আচ্ছা ভাই।

বলুন খাঁ সাহেব ?

কোথায় যাবে এ লাড্ডু ?

বাহক প্রাপকের নাম বলে।

সব যাবে ?

সেই রকমই তো নির্দেশ আছে।

ওঃ। ম্লান হয় রক্ষীর মুখ।

খাঁ সাহেব।

উঁ।

যদি কিছু মনে না করেন তো কিছু...!

কিন্তু...

শিবাজী কিছু জানতে পারবেন না। তাছাড়া সামান্য কিছু কমলে কি আর এমন বোঝা যাবে ?

বাহক কিছু লাড্ডু রক্ষীর হাতে দেয়।

এত দিলে!

আপনারা সকলেই তো খাবেন।

রক্ষীরা নিজেদের মাঝে লাড্ডু ভাগাভাগি করে নেয়। বাহকরা মিষ্টান্নের ঝুড়ি নিয়ে পথে নামে।

লাড্ডু খাবার পর রক্ষীদের চোখে ঘুম আসে। গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে সকলে।

অনেক পথ পার হয়ে এক স্থানে এসে বাহকরা দাঁড়ায়।

একটি ঝোড়ার মুখ খুলে বাহকটি ডাকে, মহারাজ।

উঁ।

বেরিয়ে আসুন।

শিবাজী ঝোড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন। অন্য একটির ভিতর থেকে শম্ভুজীও।

বাহকটি দুই মুসলমানী পোষাক শিবাজীকে ও শম্ভুজীকে দেয়।

পোষাক পরিবর্তন করে নেন পিতা পুত্র।
মহারাজ।
বলুন।
আসুন আমার সঙ্গে।
মালশ্রী কোথা ?
তাঁর কাছেই নিয়ে যাবো।
অন্য বাহকদের নির্দেশ দিয়ে শিবাজী ও শম্ভুজীকে নিয়ে একটি অপরিসর গলিপথে অদৃশ্য হয়ে যেতে।
বাহক অদৃশ্য হয়।

আচ্ছা পিতামহ !
বৃদ্ধ সাজাহান দুঃখিনী মেয়েটার মুখের দিকে তাকান।
আমি কি করবো পিতামহ ?
কি আবার করবি ?
আমি কি···
তিনি যখন তোকে গ্রহণ করবেন বলেছেন তখন তুই নিশ্চয়ই যাবি।
এতে যদি তাঁর অমঙ্গল হয় ?
অমঙ্গল !
পিতার হাত থেকে মুক্ত হয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে গেলে এ অপমান পিতা হয়তো সহ্য করতে পারবেন কিন্তু যার জন্যে তিনি আজ বন্দী হয়ে আছেন সেই আমি যদি তাঁর সহগামিনী হই তাতে যে কলঙ্ক রটবে তার ফলে পিতা হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে নির্মমহাতে নবীন মারাঠার জীবনের সব আশা আকাঙ্খা আনন্দের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে পৈশাচিক ভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবেন।
শেষ পর্যন্ত তাই হয়তো হবে। তবু তুই···
কিন্তু পিতামহ ?
তবু তুই যা দিদি।

কেন পিতামহ ?

তিনি যে তোকে ডেকেছেন।

জীবনে নিজের সুখ স্বার্থটাই কি বড় পিতামহ ?

হয়তো তা নয় কিন্তু আমরা আমাদের নিজের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখি। একদিন নিজের সুখটাকে বড় করে দেখেছিলুম বলেই তোর পিতামহীকে চিরদিনের মতো বিদায় নিতে হয়েছিল পৃথিবী থেকে, কিন্তু ওরে পাগলী তুই অমঙ্গলের দিকটাই অত ভাবছিস কেন ?

আমি যে আমার পিতাকে চিনি।

তুই বলছিস তোর পিতার মনে স্নেহ মায়া মমতা কিছুই নেই ?

রেগে ওঠেন বৃদ্ধ সাজাহান।

আছে! কিন্তু তাঁর কাছে সব থেকে বড় তাঁর স্বার্থ। নিজের স্বার্থের জন্যে কি করেন নি তিনি ? আপনি বৃদ্ধ পঙ্গু অথর্ব শিশুর চেয়েও দুর্বল আপনাকে করেছেন বন্দী। নির্মম ভাবে ভাইয়েদের করেছেন হত্যা। পিসিমা জাহানারাকে এই দুর্গেই করে রেখেছেন বন্দিনী। মানুষ জানে তিনি আপনার সেবা করার জন্যে স্বইচ্ছায় আপনার কাছে কাছে আছেন। আজ পর্যন্ত একবারও আপনার কন্যার সাক্ষাৎ পেয়েছেন ? পান নি। জীবিত অবস্থায় কোনদিন পাবেনও না। আপনার মৃত্যুর পর মুক্তি পাবেন তিনি। জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে পিতা আমার বহু অনুরোধ করে নিয়ে যাবেন হারেমে। কেন জানেন, জগতের কাছে তাঁর মহানুভবতা প্রচার করবার জন্যে।

মেহের!

হ্যাঁ তাই করবেন তিনি। পুত্রকে বন্দী করেছেন। আর আমার কথা কেউ কোনদিন জানবে না।

জানবে না!

না। কেন জানেন তাতে তাঁর কলঙ্ক বাড়বে। সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। সারা হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বাদশাহ আলমগীর সামান্য এক মারাঠার কাছে যে ছোট হয়ে যাবেন।

অস্থির হয়ে ওঠেন মেহেরুন্নিসা। ধীরে ধীরে উঠে দূরে চলে যায়।

বৃদ্ধ সাজাহান বসে থাকেন চুপ করে।

ঝড় ওঠে। চিন্তার সমুদ্রে দিশাহারা হয়ে ওঠে মেহেরুন্নিসা। কি করবে সে? কি করা কর্তব্য তার? কিছুই স্থির করতে পারে না। চুপ করে বসে থাকে মেহেরুন্নিসা। তাকিয়ে থাকে অসীম শূন্যে আকাশের দিকে।

শাহাজাদী।

চমকে ফিরে চায় মেহেরুন্নিসা। সাহিরাকে দেখে। সর্বাঙ্গ কালো বোরখা আবৃতা সাহিরা কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে জানতে পারে নি মেহেরুন্নিসা।

সাহিরা।

চলুন শাহাজাদী।

কোথায়? এক আশ্চর্য প্রশ্ন নির্গত হয় মেহেরুন্নিসার মুখ থেকে।

মহারাজ আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন।

কিন্তু…

বিলম্বে সর্বনাশ হতে পারে শাহাজাদী।

সাহিরা।

শাহাজাদী।

আমার যাওয়া হবে না রে।

সে কি?

হ্যাঁ রে। আমি গেলে তাঁর বিপদ শত গুণ বাড়বে। তাঁকে তুই বলিস সাহিরা তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

বলতে বলতে মেহেরুন্নিসার দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়। দুরন্ত একটা কান্নার কুণ্ডলী বুকের মাঝে গুমরে ওঠে। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে মেহেরুন্নিসা।

দিদি! বৃদ্ধ সাজাহানের আহ্বানে কেঁপে ওঠে মেহেরুন্নিসা।

পিতামহ!

তুই এ কি করছিস। নিজেকে সেধে কেন সর্বহারা করবি বল?

এ ছাড়া অন্য পথ আজ আমার জানা নেই পিতামহ। আমার জন্যে

একটা সমগ্র জাতির জীবনে অত্যাচারের তাণ্ডব বহে যাক তা আমি চাই না পিতামহ। বন্দিনী থেকে সারাজীবনের নরক যন্ত্রণা আমি হাসি মুখে সইতে পারবো। মহারাজকে তুই বলিস সাহিরা।

বলবো শাহাজাদী।

আর···

শাহাজাদী···

তাঁকে বলিস তাঁর অভাগিনী মেহের জীবনের সুখ স্বপ্নের থেকে তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্নকেই বড় করে দেখে তিনি যেন তা সফল করেন।

সাহিরার চোখ ছুটিও ব্যথার অশ্রুতে ভরে ওঠে। অশ্রু রোধ করতে পারে না সাহিরা।

ছুটি দুঃখ জর্জরিতা অভাগিনী অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

স্থবির বৃদ্ধ শুধু মুগ্ধ হৃদয়ে অসহায় দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য দেখেন। চোখ ছুটিও তাঁর বেদনার অশ্রুজলে ভরে ওঠে।

যমুনার সেতুর ওপরে শাহাজাদীর অপেক্ষায় থাকে সকলে। সাহিরা তাঁকে নিয়ে আসবে।

অশ্রান্ত হৃদয় শিবাজী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বন্দী থাকা কালে এত সংবাদ জানতেন না। মুক্ত হয়ে সব শুনেছেন তিনি। শুনেছেন সাহিরা তাঁকে আনতে গেছে। মনে হয়েছিল তিনি বুঝি স্বপ্ন ঘোরে আছেন কিন্তু এই রাত্রি, মালশ্রী, সূর্যপ্রসাদ এরা তো স্বপ্ন নয়।

সূর্যপ্রসাদ। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে এক সময় ডাকেন শিবাজী।

বলুন মহারাজ।

ভাই তোমার ঋণ জীবনে ভুলবো না। শিবাজী চিরকাল তোমাকে মনে রাখবে। । তবু···

ও কথা বলবেন না মহারাজ, মানুষের কর্তব্যটুকুই আমি পালন করেছি। ভাই বলে ডেকে যে স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তা

আমিও চিরদিন মনে রাখবো মহারাজ।

সূর্য!

মহারাজ।

মহারাজ নয়, ভাই বল সূর্য। শিবাজী তোমার ভাই।

সূর্যপ্রসাদকে বুকের মাঝে টেনে নেন শিবাজী।

ভাই···

সূর্য···

ভাই···

এই অভূতপূর্ব মিলনে সকলের চোখই আনন্দাশ্রুতে ভরে ওঠে।

একসময় একাকিনী ফিরে আসে সাহিরা।

সাহিরা, বহিন। ডাকে শিবাজী।

মহারাজ।

শাহাজাদী কোথা?

তিনি আসেন নি।

আসেন নি! তুমি···

আমি সব কথাই তাঁকে জানিয়েছিলাম মহারাজ। কিন্তু মহারাজ তাঁর জীবনের তুচ্ছ সুখের জন্যে মহারাজের জীবনের ব্রত ভঙ্গ করতে চান না। জীবনে ভালবাসার থেকেও তিনি বড় করে দেখেন মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা। তাই তিনি···

তুমি এ কি বলছ সাহিরা?

সত্য কথাই বলছি মহারাজ। আপনি মুক্ত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন এ সংবাদ যখন বাদশাহের কানে যাবে আপনাকে দমন করবার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন তিনি কিন্তু পর্বতসঙ্কুল মহারাষ্ট্র থেকে চতুর শিবাজীকে বন্দী করা সহজ হবে না। ব্যর্থতার দুঃখে ভেঙে পড়বেন তিনি। কিন্তু যদি শোনেন তাঁর বন্দিনী কন্যাও আপনার সহগামিনী হয়েছেন তাহলে কলঙ্কের কালিমা ঢাকতে সমগ্র মহারাষ্ট্রের বুকে জ্বালিয়ে তুলবেন অত্যাচারের প্রলয় অনল। মারাঠার শান্তির জীবনকে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবেন। সেই কথা চিন্তা করে শাহাজাদী

আপনার অনুগামিনী হতে পারলেন না।

মুগ্ধ হন শিবাজী। মুগ্ধ হয় সকলে। মোগল হারেমের বিলাসিনী নারীর এ কি নতুন পরিচয়। শ্রদ্ধায় ভরে যায় অন্তর।

রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়। বিপদ আশঙ্কায় পরস্পর পরস্পরের কাছে বিদায় নেয়। সাহিরা আর সূর্যপ্রসাদকে সঙ্গে যাবার অনুরোধ করেন শিবাজী, মালশ্রী। রাজী হয় না দুজনেই। জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রি দ্বিপ্রহরে শিবাজী আর মালশ্রীর অশ্ব উল্কা বেগে ছুটে চলে নবীন মহারাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে।

সাহিরা আর সূর্য দাঁড়িয়ে থাকে পাশাপাশি।

সাহিরা। একসময় মৃদু স্বরে ডাকে সূর্য।

বল ? সূর্যের মুখের পানে তাকায় সাহিরা।

চল।

'কোথায় ?

বাড়ি।

না।

তবে ?

সেখানে আর যাব না।

কি করবে তবে ?

যেদিকে দু চোখ যায় সেদিকেই চলে যাব। সেদিন তুমিই আমাকে মরতে দাও নি ; মরতে আর হয়তো পারবো না ; তাই নিরুদ্দেশেই যাত্রা আমার।

ওঃ। সাহিরার কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় সূর্য।

তুমি ফিরে যাও সূর্য। বাতাসীকে দেখো। পার তো সব অন্যায় ক্ষমা কোর।

সাহিরা।

বল ?

সাহিরা তুমি তোমার পথের সাথী করবে আমাকে ?

তোমাকে !

হ্যাঁ।

আমার নিজের পথ আমি নিজেই চিনি না তোমাকে সঙ্গে নেব কোন্ সাহসে?

নেবে না?

তা হয় না সূর্য।

কেন হয় না?

তুমি জান না আমি কি। যদি আমার সব পরিচয় জানতে তাহলে ঘৃণায় দূরে সরে যেতে। তাছাড়া আমি ম্লেচ্ছ তুমি হিন্দু।

সাহিরা আমি জানি তুমি কি?

কি জান তুমি?

আমি জানি তুমি নারী। অতীতে কি ছিলে তা নিয়ে চিন্তা আমি করি না। বর্তমানকেই আমি জানি। বর্তমানের মাঝেই আমি তোমাকে দেখেছি, জেনেছি বর্তমানের মাঝেই তোমাকে আমি পেতে চাই। তাছাড়া জাতির কথা বলছ; বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন মানুষ সৃষ্টি করেছে জাতি। হিন্দু মুসলমান, উচ্চ নীচ। বাঁধিয়েছে বিভেদ কিন্তু রঙের রঙ তো পাল্টাতে পারে নি?

সূর্য।

হ্যাঁ, সাহিরা তাই। আমি তোমাকে···

না-না সূর্য তা হয় না।

কেন হয় না সাহিরা?

আমি নটী আমি পণ্যা। আমার রক্তের মাঝে মিশে গেছে বহু বিষ। ভুল সাহিরা ভুল। তুমি নারী। কোন বিষই তোমার রক্তের মাঝে মেশে নি সব তোমার মনের ভুল।

সূর্য।

আমি তোমায় ভালবাসি সাহিরা। আমি তোমায় একান্ত আপন করে পেতে চাই। আমার রাজ্য নেই ঐশ্বর্য নেই সমাজ নেই সংসার নেই, আছে শুধু বুক ভরা ভালবাসা, মনে সাহস, দেহে শক্তি—এরই বিনিময়ে তোমাকে নিয়ে নতুন জগৎ রচনা করতে চাই সাহিরা। তুমি

এসো সাহিরা আমরা দুজনে আমাদের মিলিত চেষ্টায় এই স্বপ্নকে সফল করি।

এ সত্য নয় সূর্য। এ সত্য হতে পারে না।

এই সত্য সাহিরা। এ সত্যকে অস্বীকার কোর না তাতে শান্তি পাবে না।

এই সত্য!

হ্যাঁ সাহিরা এই সত্য। তুমি নারী আমি পুরুষ।

কিন্তু…

আজ আর কোন কিন্তু নয় সাহিরা।

সাহিরাকে কাছে টেনে নেয় সূর্য। মুখখানি তুলে ধরে মুখের কাছে। অধরে স্পর্শ করে অধর। অনাস্বাদিত এক পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সাহিরার সমস্ত দেহমন; গভীর বাঁধনে আঁকড়ে ধরে সূর্যকে।

সাহিরা।

উঁ।

নাও চল।

কোথা?

জানি না।

চল।

একবার ফিরে যাবে?

কোথা?

বাড়িতে।

কেন?

নতুন সংসারের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষ নিয়ে আসতে?

না।

তবে?

তুমি তো রয়েছ।

সাহিরাকে আবার কাছে টেনে নেয় সূর্য। সোহাগ চিহ্ন এঁকে দেয় চোখ মুখে। তারপর পাশাপাশি এগিয়ে চলে দুজনে। কোথায়

যাবে তা তারা জানে না। শুধু এইটুকু জানে তারা যাবে।
রাত্রি শেষের ইসারা দেয় আকাশ।

প্রাসাদ অলিন্দে পাশাপাশি দুটি মূর্তি স্থির পাষাণের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সাজাহান আর মেহেরুন্নিসা। কারো মুখে কথা নেই। দুজনে বাক্য হারা।
একসময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। আলোর ইসারা জাগে আকাশের পূর্ব প্রান্তে। ফিকে হয়ে আসে রাতের আঁধার।
দিদি! চুপি চুপি ডাকেন সাজাহান।
এঁ্যা!
কি ভাবছিস?
ভাবছি তিনি এখন কতদূরে। পিতা জেনেছেন তিনি মুক্ত হয়েছেন। তাই...
তুই কিছু ভাবিস নি। আওরঙেজেবের সাধ্য নেই আর তাঁকে ধরে!
তাই যেন হয় পিতামহ। আল্লা যেন তাঁকে রক্ষা করেন।
নিশ্চই করবেন রে নিশ্চই করবেন। তুই কিছু ভাবিস নি দিদি।
না পিতামহ আমি আর ভাববো না। আমি আর ভাবতে পারছি না। আমার সমস্ত চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমার মনের সমস্ত ভাবনা চিন্তাগুলো অবশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। নিজের কাছে আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি। জতেও আমি হেরে গেছি পিতামহ।
দিদি!
হ্যাঁ পিতামহ আমি হেরে গেছি। আমার নিজের কাছে হেরে গছি আমি। আমার মনের কাছে হেরে গেছি আমি। তাই আমি...
আর বলতে পারে না মেহেরুন্নিসা, পিতামহের বুকে মুখ ঢেকে দুরন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে। মেহেরুন্নিসা কাঁদে। আজও দিল্লীর আকাশে বাতাসে তার কান্নার সুর ভেসে বেড়ায়।
বুঝি সারাজীবন এমনিই কাঁদবে সে। যেদিন বৃদ্ধ পিতামহ থাকবেন না সেদিন আগ্রা দুর্গের শূন্য প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে বুক ভরা অশ্রু

নিয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াবে। কেউ দেখবে না, কেউ ডাকবে না, কেউ জানবে না এই কান্নার ইতিহাস।

যদি কেউ কোনদিন অসতর্ক মুহূর্তে দেখে ; ভাববে,—ও কান্না মোগল হারেমের অভিশপ্তা চিরকুমারীর বুকের ব্যর্থ যৌবন জ্বালার কান্না। ও কান্না নয় ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

যে যাই ভাবুক, যে যাই বলুক, ইতিহাস না জানুক সত্য ঘটনা তবু শেষ হবে না মেহেরুন্নিসার এই কান্না।

মেহেরুন্নিসা যে ইতিহাস উপেক্ষিতা বাদশাহ আলমগীরের অশ্রুমুখী চিরবঞ্চিতা কন্যা। যে শৈশবে হারিয়েছে মাকে—যৌবনে পিতৃস্নেহ তার স্থান তো ইতিহাসের বাইরে।

কিছু নেই তার ; চির রিক্তা সে, অশ্রু তার জীবনের শেষ সম্বল।